জীবমণ্ডল ও রাজনীতি

জীবমণ্ডল ও রাজনীতি

লেখক :
জি. খোজিন

কলিকাতা

Bengali translation of :

The Biosphere and Politics

—by G. Khozin

(Progress Publishers, Moscow, 1979)

অনুবাদক :

দিলীপ বসু

প্রকাশক :

মণি সান্যাল

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

সিদ্ধার্থ মিত্র

বোধি প্রেস

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন

কলিকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ৩·০০ (তিন টাকা)

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমাদের সভ্যতা এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যখন দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাতে প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিকাশের সম্ভাবনা এতো বেশি আছে যে, উৎপাদনের ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে এবং জীবনযাত্রাতে এমন পরিবর্তন আনা যেতে পারে যাতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ সাফল্যকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুনিয়াতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি প্রধান ঝোঁক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্ত্র সীমিতকরণ ও নিরস্ত্রিকরণের দিকে প্রাথমিক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পরিশেষগুলোর দূরীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এই বছরগুলোতেই—ইতিহাসে সেভাবেই লেখা থাকবে। আর এই কালপর্বেই মানুষের সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কজনিত প্রধান যে সমস্যাগুলো রয়েছে তারই যথার্থ মূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছে।

সমাজের ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিবৃদ্ধির ফলেই এই সকল সমস্যার প্রতি অবহিত হবার এবং তাদের দিকে নিবিড় মনোযোগ দেওয়া দরকার। প্রতিটি দলকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির ভূমিকা বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে।

তবে রাষ্ট্রগুলোর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি যখন যথেষ্ট হবে তখন সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে বহু রকমের জটিলতা দেখা দেবে। অতএব এই সকল সমস্যাগুলোকে যুক্তিসম্মতভাবেই সমকালীন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়।

আজকের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব এমনই একটা ঘটনা যার বহু দিক ও নানারকমের তাৎপর্য রয়েছে, সেই বিপ্লব উৎপাদনের প্রযুক্তিবিদ্যাগত ভিত্তিতে একটা আমূল পরিবর্তন আনতে পারে। এটার প্রভাব সমাজজীবনের বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং প্রকৃতি ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভাগে মৌলিক প্রায়োগিক জ্ঞানের ভাণ্ডারকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক, সামাজিক-আর্থনীতিক, আঞ্চলিকভাবে জনসংখ্যাগত, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার দিক থেকে; এটা ব্যক্তিমানুষের ব্যবহারিক দিক ও রাষ্ট্রগুলোর সামগ্রিক বিকাশের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে।

আধুনিকতম যে সমস্যাটিকে সমগ্র মানবজাতি সমাধান করতে আগ্রহী, সেটি হল প্রকৃতিকে রক্ষা করা, আমাদের গ্রহের সম্পদসমূহকে যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে ব্যবহার করা এবং উৎপাদনের ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংগঠিত করা যাতে আমাদের পরিবেশ[১] কোনো অলঙ্ঘনীয় পরিবর্তনের মধ্যে গিয়ে না পড়ে।[২]

অতীতের ঐশ্বর্যময় সম্পদকে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করে এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ও সমাজের বিকাশে যে ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাকে যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ ও সাধারণীকরণ করে ভবিষ্যতে এমন একটা অগ্রগামী আন্দোলন

---

১. পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাস নিয়ে যে সমগ্র পরিবেশ (বা environment) রয়েছে, যেখানে প্রকৃতির নিয়মে কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চক্র (circuit) তৈরি হয়েছে। যেমন আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে দূষিত কারবন ডাই-অকসাইড নিকাশন করি তাকে গাছপালা বা উদ্ভিদরা গ্রহণ করে সালোক সংশ্লেষের (photo-synthesis) প্রক্রিয়াতে আবার অক্সিজেন রূপে ফেরত দেয়।

একে বলা হয় 'বাস্তব্য-চক্র' বা ecological circuit—অনুবাদক

২. অর্থাৎ, মানুষের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি ক্রিয়ার ফলে এই ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ 'বাস্তব্য-চক্র' এমনভাবে বদলে গেল, যাতে সেটা নষ্ট হয়ে যাবার অবস্থা সৃষ্টি হল।—অনুবাদক।

গড়ে তোলা সম্ভব যেটা প্রকৃতির সম্পদকে খুঁটিয়ে বিচার করে (যে সম্পদ আগের মতো আজকাল আর অনন্ত বলে মনে হয় না) কয়েক ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ব্যবহার করবে এবং তার পুনরুৎপাদন করবে (অর্থাৎ, ব্যবহারের দ্বারা সেই সম্পদ যাতে একেবারে নষ্ট না হয়ে যায় —অনুবাদক)।

এর দ্বারা আজকের ও ভবিষ্যতের পুরুষের সেই মানুষ এবং তার নতুন নীতিজ্ঞান সৃষ্টি হবে যে প্রকৃতির বলেই তার ক্ষমতা দখল করেছে এবং সেই সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যথার্থ সৌসাম্য বজায় রেখে (বা মানিয়ে) চলে।

আর এরই সঙ্গে সারা দুনিয়া জুড়ে পরিমণ্ডলকে (environment-কে) রক্ষা করার সমস্যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতিকে অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়ার একটা উপাদান হিসেবে দাঁড়ায়। উৎপাদিকা শক্তির অন্যতম একটা অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ বিজ্ঞান ; এতে নতুন ধরনের যে সকল টেকনোলজি বা প্রযুক্তি দেখা যাচ্ছে সেটা আর্থনীতিক পরিবর্তন আনছে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াতে এই সকল পরিবর্তন থেকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ক্রমশই নিকটতর হচ্ছে। কূটনীতির ক্ষেত্রে আলাদা নতুন বিভাগ দ্রুত খুলতে হচ্ছে, যেটা নতুন প্রযুক্তির বিকাশ, উৎপাদন ও প্রায়োগিক ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক যৌথ কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। স্ট্র্যাটাজিক অস্ত্র সীমিতকরণ মহাকাশে আরও পর্যটন ও সেটাকে কাজে লাগানো, সারা পৃথিবীর মহাসমুদ্রদের সম্পদ আরও অনুসন্ধান ও অনুধাবন করা, তাকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করা এবং শক্তির (এনার্জি'র) উৎপাদনকে আরও সামগ্রিক প্রচেষ্টায় বিকাশ সাধন করা—এইগুলো হচ্ছে প্রযুক্তিবিদ্যার, নতুন সমস্যাবলী যার সমাধান করতে হবে বিভিন্ন দেশের যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা। বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির দিক থেকে যোগাযোগ ব্যাপকতর ও সংবদ্ধ হচ্ছে এবং এর ফল ভালো হচ্ছে।

তবে দুই বিপরীত সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লব প্রধান একটা সংগ্রামের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে আর সেটাই হচ্ছে আমাদের যুগের প্রধান বিতর্কিত বিষয়-বস্তু। যখনই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির উন্নতি একটা বিশেষ উচ্চ স্তরে পৌঁছায় তখনই প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে অর্থনীতিকভাবে বেশি উন্নত ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলো তাদের এই উন্নততর অবস্থা থেকে পাওয়া জ্ঞানকে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ-বিরোধী রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও মতাদর্শগত লক্ষ্যের জন্য কাজে লাগাতে নিযুক্ত করে।

প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানভাবের মধ্যেই ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রভেদ চোখে পড়ে। ১৯৭৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫ কংগ্রেসের রিপোর্টে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড লিওনিড্ ব্রেজনেভ এই পয়েন্ট সম্পর্কে বলছেন:

"যাই হোক, প্রকৃতিকে ব্যবহার করার বিভিন্ন পন্থা আছে। কেউ ইচ্ছা করলে তাদের কাজের ফলে মরুভূমি সদৃশ নিষ্প্রাণ বিরাট এলাকা তৈরি করতে পারে যেটা মানুষের জীবনধারণের পরিপন্থী—মানুষের ইতিহাসে এরকমের অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু···প্রকৃতিকে উন্নত করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয়; তাকে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে তার প্রধান শক্তি-গুলোকে পূর্ণতরভাবে বিকশিত করা যায়। একটা সাধারণ কথা চালু আছে, 'পুষ্পিত অঞ্চল' যেটা সবাই জানে। সেই ভূমিকে এই নামে ডাকা হয় যেখানে জনসাধারণের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা যত্নসহকারেই সোনা ফলিয়েছে। সেটাই আমাদের সমাজতান্ত্রিক পথে চলার কায়দা।' (সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৫ কংগ্রেসের দলিল ও প্রস্তাবাদি, মস্কো, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪)।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিমণ্ডল[৩] রক্ষা করার সমস্যাটিকে

---

৩. environment অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে—এক কথায় পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডল

প্রধান একটি সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রশ্ন হিসেবে দেখে, যেটার সমাধান দুনিয়ার সবদেশের মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বস্তুর উৎপাদনের সাধারণ ভিত্তি এবং সোভিয়েত নাগরিকদের জীবন, কাজ করার ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাকে উন্নত করার অপরিহার্য অংগ রূপে দেখা হয় এই সমস্যাকে। শেষ বিচারে জনসাধারণের মঙ্গলকে উন্নত করার জন্য পরিমণ্ডল রক্ষা করা অন্যতম একটি প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীসভার কাউনসিলের চেয়ারম্যান এন. কে. বৈবাকভ তাঁর রিপোর্টে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েতের অন্টম কনভোকেশন সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭৫ সালের অর্থনীতিগত প্ল্যানে একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে "প্রকৃতিকে রক্ষা করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করা।" এই ধারাতে জলের সম্পদকে, বায়ুমণ্ডলকে, বনসম্পদকে, মাছের উৎপাদনকে বাড়িয়ে তোলা এবং খনিজ সম্পদকে রক্ষা করা ও যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করার জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা ধার্য করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার ব্যবস্থাকে উন্নত করা, যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হচ্ছে সেটা যাতে কাজে পরিণত তাকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা এবং পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট অর্থকে সুপরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। (প্রাভদা, ১৯ ডিসেম্বর,১৯৭৪)। সোভিয়েতের আর্থনীতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য বাৎসরিক প্ল্যানের এই ধারাগুলো এখন নিয়মিত সংযোজিত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭৮ সালের প্ল্যানে বলা হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীবর্গের এবং অন্যান্য গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্টের ও বিভিন্ন রিপাবলিকদের মন্ত্রীমণ্ডলীর কাউন্সিলে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য

নিয়ে সমগ্র যে পরিমণ্ডল। এই পরিমণ্ডলেই জৈবসম্পূর্ণ 'বাস্তুতন্ত্র' গড়ে উঠেছে, যার কথা আমরা আগেই বলেছি—১ নং ফুটনোট দ্রষ্টব্য—অনুবাদক।

ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে আরও যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করতে হবে। সারা দেশের অর্থনীতির প্রকল্পে এই সকল কাজের জন্য ২০০ কোটি রুবল (সোভিয়েত ইউনিয়নের টাকা—অনুবাদক) ধার্য করা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যা কিছুই করা হয়—সেটা শিল্পে—নির্মাণকার্যই হোক অথবা সড়ক ও রেলপথ তৈরি বা পাইপলাইন বসানোই হোক অথবা নতুন জনপদ স্থাপন করাই হোক—তার শেষ উদ্দেশ্য হল জনগণের মঙ্গলকে আরও সম্প্রসারিত করা, তাদের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত করা, তাদের কাজের ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা এবং এই সকল কাজের জন্যেই পরিমণ্ডলকে রক্ষা করা দরকার।

আশ্চর্যের কথা কিছু নয় যে, সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর পরিমণ্ডল রক্ষা করার যে উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছে এবং সেদিকে যতোটুকু ফললাভ হয়েছে সেটার তুলনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, গাস্ হল্* সিদ্ধান্ত করছেন: "দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাসোপযোগী পরিমণ্ডল সৃষ্টির সংগ্রামে জয়ী হওয়া যাচ্ছে।"

পরিমণ্ডলের গুণগত অবস্থা কি হবে সেটা এখনও অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর গভর্নমেণ্টের প্রধান ভাবনা নয়। এর প্রধান কারণ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি সবসময়েই হচ্ছে মুনাফার তাগিদ, যেটা আর সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে এমন কি পরিমণ্ডল রক্ষার সমস্যাকেও পেছনে ফেলে দেয়। অথচ শেষ বিচারে পরিমণ্ডলকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করার ওপরেই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার শিরোমণিদের সব কাজের পেছনেই মুনাফা লোটবার তাগিদই যে সর্বপ্রধান

* ("বাজার ব্যবস্থা: আমরা কি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাঁচাতে পারি?"—গাস্ হল্, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৮৫)।

ব্যাপার, মার্কসবাদের এই সিদ্ধান্তের সত্যতা আর একবার প্রমাণিত হল। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, টি. জে. ডানিং-এর এই কথাগুলো মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' বইয়েতে উদ্ধৃত করেছেন :

"গোলমাল বা কোনো ঝগড়াঝাঁটি থাকলে মূলধন (ক্যাপিটাল) থমকে দাঁড়ায় এটা সত্য। কিন্তু এটাতেই সব ব্যাপারকে পরিস্কার বলা হল না। কোনো মুনাফাকেই এমন কি সামান্য মুনাফাকেও মূলধন এড়িয়ে চলে না, যেমন বায়ুশূন্য অবস্থাকে প্রকৃতি সহ্য করতে পারে না বলে বলা হতো। যথেষ্ট মুনাফা হলে মূলধন খুবই তেজী ভাব দেখায়। সামান্য শতকরা ১০ ভাগ মুনাফার ব্যবস্থা থাকলেই মূলধনের প্রয়োগ হবে। শতকরা ২০ ভাগ মুনাফার ব্যবস্থা থাকলে মূলধন যথেষ্ট আগ্রহ দেখাবে; শতকরা ৫০ ভাগ হলে তো রীতিমতো ঔদ্ধত্যের ব্যাপার; শতকরা ১০০ ভাগে সব রকমের মানুষের আইনকে লংঘন করতে কোনো বাধা থাকবে না; আর শতকরা ৩০০ ভাগ, তাহলে এমন কোনো দুষ্কর্ম নেই যা করতে তার (মূলধন বিনিয়োগকারী ধনিকদের—অনুবাদক) মর্মপীড়া দেখা দেবে, কোনো ঝুকি ঘাড়ে নিতেই পেছপা হবে না, এমন কি তার জন্য যদি মালিককে ফাঁসিকাঠে ঝুলতেও হয়। যদি গোলমাল বা ঝগড়াঝাঁটি করেও মুনাফা আদায় করা সম্ভব হয় তাহলে দুটোই করার উস্কানি দেওয়া হবে ভালো করেই। এখানে যা বলা হল স্মাগলিং আর দাস ব্যবসাতে তা ভালো করেই দেখা গেছে। (ক্যাপিটাল, মার্কস, মস্কো, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৭১২, ফুটনোট, বঙ্গানুবাদ—অনুবাদকের)।

১৯৬০ দশকের শেষ এবং সত্তর দশকের গোড়ার দিকে নতুন তথ্য পাওয়া গেল যাতে দেখা গেল ধনতন্ত্রের আওতায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব কেবলমাত্র ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকেই বাড়িয়ে তোলে না, যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকারী, মুদ্রাস্ফীতি, ক্রমাগত চড়া দাম ও ট্যাক্স এবং অন্যান্য বিপর্যয় দেখা দেয়, পরন্তু গুণগত নতুন ধরনের অভূতপূর্ব

সংকটের চেহারা নেয় : যেমন, "শক্তির সংকট" যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোকে আচ্ছন্ন করে এবং "খাদ্য-ব্যবস্থা জনিত সংকট,"[৪] যাতে প্রধান প্রধান একচেটিয়া পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠানগুলো শিল্প উৎপাদনের ব্যাপারে সাধারণ যে সকল সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কে এমন অবজ্ঞা প্রকাশ করে যাতে আবহমণ্ডল ও দেশের মধ্যের জলপথ (অর্থাৎ, নদীনালা, সমুদ্র নয়—অনুবাদক) দূষিত হয়ে যায় এবং কয়েকটি দেশকে তাদের শিল্প উৎপাদন থেকে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট[৫] দিয়ে অন্য দেশের পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলে।

অনেক দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নেতারা, বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানীরা এবং সারা দুনিয়া জুড়ে গণ-আন্দোলনের প্রতিনিধিরা জানেন যে, পরিমণ্ডলকে রক্ষা করা এবং সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা বেশি প্রয়োজনীয়। ধনতান্ত্রিক জগতের সর্বাপেক্ষা নেতৃস্থানীয় দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এর সমস্যা সর্বাপেক্ষা বেশি ; এই দেশ কয়েক দশক ধরে প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে ব্যবহার করার এবং অর্থনীতি ও পরিমণ্ডলের মধ্যে যথাযোগ্য ভারসাম্য তৈরি করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই বোঝেনি।

প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে এই ধরনের ভোগসর্বস্ব মনোভাব কয়েকটি বুর্জোয়া অর্থনীতিক থিওরি ও অতীতের শিক্ষা থেকেও পাওয়া যায়। এদের প্রণেতারা ভাবতেন যে প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত। এদের মতে প্রকৃতির সম্পদকে কি ভাবে আহরণ ও ব্যবহার করতে হবে এবং কতোখানি সেটা করা

৪. এক নম্বর ও তিন নম্বর ফুটনোট দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক সমাজে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের তাগিদে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে "খাদ্য চক্র" তথা পৃথিবীর 'পরিবেশ' নষ্ট হয়ে গিয়ে বিরাট সংকটের সৃষ্টি করে—অনুবাদক।

৫. অর্থাৎ এক বড়ো দেশের শিল্প থেকে বা বিশেষ করে এ্যাটমীয় নানারকমের প্ল্যান্ট থেকে যে দূষিত পদার্থ নির্গত করা হল তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল এবং সেটা অন্য দেশের জলের সম্পদকে (যেমন মাছকে) নষ্ট করে ফেললো।—অনুবাদক।

যায় সে সম্পর্কে কোনো চিন্তা না করেই সেটা করা যেতে পারে। সত্য বটে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ইতিহাসে দেখা যায় যে, তাদের কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতারা প্রকৃতি সম্পর্কে এই ধরনের মনোভাব পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, থিয়োডোর রুজভেল্টের 'রাষ্ট্রের প্রতি বাণী' শীর্ষক বক্তৃতা এর একটা উদাহরণ। তাতে প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন : "যদি আমরা পুরনো কায়দায় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে বেহিসেবী খরচ করে যাই তাহলে সেটা একদিন শেষ হয়ে যাবার ভয় আছে।...কিন্তু সময় হয়েছে যখন আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, যখন আমাদের বনসম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে, যখন কয়লা, লোহা, তেল ও গ্যাস ফুরিয়ে যাবে, যখন আমাদের জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেটা নদীতে ধুয়ে চলে যাবে, যাতে নদীর জলও দূষিত হয়ে যাবে, মাঠ মরুভূমি হয়ে যাবে এবং জলপথের নাব্যতা ব্যাহত হবে।" নিশ্চয়ই এই ধরনের বিবৃতির পেছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল এবং একে কাজে পরিণত করার কোনো প্রচেষ্টা হয় নি। এমন কি এই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে পরিমণ্ডলের ক্ষয় যাতে আরও না বাড়ে তার জন্য আইনত তাকে লিপিবদ্ধ করে যে দলিলগুলো জারি করা হয়েছিল সেগুলোও ছিল ঘোষণামূলক এবং প্রকৃতিকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যের দিকে কোনো প্রায়োগিক পরিবর্তন করা হয় নি।

পরিমণ্ডল রক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনাতে বহু দেশের বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক নেতা ও জনগণের প্রতিনিধিরা লক্ষ্য করেছেন যে এই সমস্যাটিকে দেখতে হবে সারা দুনিয়ার পটভূমিতে, আমাদের গ্রহ-পৃথিবী বাসকারী সকল দেশ ও তার মানুষদের নিয়ে। বাস্তব্য সমস্যার সমাধান করতে হলে সারা পৃথিবী জুড়ে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হয়, এটা এমন একটা সমস্যা যার প্রধান কথা হল পৃথিবীতে জীবন রক্ষা করা যাবে কি ভাবে —এই ধারণা থেকেই পশ্চিমী দেশগুলোতে "পৃথিবী একটা মহাকাশযান" এই

ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ইউনেস্কোর ৩১ অধিবেশনে ইউনাইটেড্ নেশনসের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এডলাই স্টিভেনসন তাঁর বক্তৃতাতে বলেছিলেন : "আমরা একটি ছোট মহাকাশযানে সকলেই সহযাত্রী এবং এই মহাকাশযানের (অর্থাৎ পৃথিবীর—অনুবাদক) বায়ু ও ভূমির ওপরে নির্ভর করে বেঁচে আছি। আমরা নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল এবং সকলে মিলে যে কাজ আমরা করে থাকি এবং আমি বলবো যে ভালোবাসা ও যত্ন আমরা আমাদের ভঙ্গুর মহাকাশযানকে দেবো সেটাই আমাদের ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে।"

কিন্তু, আজকের দুনিয়ার সামাজিক কাঠামো বিচার করে আমাদের মহাকাশযান রূপী পৃথিবীতে যে অনেক ধরনের যাত্রী আছে সেই কথাই বলতে হয়। একদিকে যেমন এক ধরনের "যাত্রী"—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো—আমাদের যা সম্পদ আছে তাকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করে এবং তাকে পুনরুৎপাদন করে তাদের অন্তর্ভুক্ত মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে; কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর "যাত্রীদের" মধ্যে সামান্য কিছু লোক (যারা নিশ্চয়ই তাদের সমগ্র জনসংখ্যার সংখ্যালঘু মুষ্টিমেয় মাত্র,—অর্থাৎ ধনিকরা—অনুবাদক) যা কিছু সম্পদ আছে তাকে কব্জা করে নিজেদের সামরিক ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার কাজে ব্যবহার করে (অর্থাৎ মুনাফা লোটবার কাজে ব্যবহার করে —অনুবাদক) ঐ দেশগুলির যাত্রীদের অধিকাংশের যা প্রয়োজন তার প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। তৃতীয় দেশগুলোর, তথা উন্নয়নশীল দেশগুলোর "যাত্রীরা" অন্য দুই অংশের যাত্রীদের কার্যকলাপ ও অভিজ্ঞতা ভালো করে অনুধাবন করছে যাতে তারা নিজেরা যখন তাদের সম্পদকে আরও নিবিড়ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে তখন এটা তাদের কাজে লাগে।

পরিমণ্ডল রক্ষা করার সমস্যাটির বিশিষ্টতা হচ্ছে যে, তার যথাযথ সমাধান করতে হলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, যার মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোকে ধরতে হবে। নানা রকমের সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

এটা জোর দিয়ে বলতে হবে যে, আমাদের কালে অত্যন্ত সাধারণ ভাবেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমগ্র ব্যবস্থাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপরে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের কি প্রভাব পড়ছে, তার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হলে দুটি সামাজিক ব্যবস্থার—সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক—জটিল ঘাতপ্রতিঘাতের সমগ্র পরিস্থিতিটা বিবেচনার মধ্যে নিতে হবে।

পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার বিশিষ্ট প্রোগ্রাম (বা পরিকল্পনা) রূপায়ণ ও কাজে পরিণত করতে হলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দুনিয়া জুড়ে জাতীয়, আর্থনীতিক ও সামাজিক স্বার্থকে যুক্তিসম্মতভাবে বিচার করে জোট ঠিক করতে হবে; এই স্বার্থগুলোর চেহারাটাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক ধরনের এবং এর জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের, এলাকার মধ্যে এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়েই নতুন ধরনের শিল্পগত ও আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ চালু করতে হবে। এটা করা হলে সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য-পূর্ণ-লেনদেন বজায় থাকবে।

পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য ইউনাইটেড নেশন্‌স ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো নিঃসন্দেহে বড়ো অবদান রাখতে পারে এবং তাদের কাজে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে যোগ দিতে পারে।

ইউনাইটেড নেশনসের কাজকর্মে পরিমণ্ডল রক্ষার সমস্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে স্থান পাচ্ছে। নিশ্চয়ই সেটা অন্যান্য আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যার সংগেই করা হচ্ছে। তবে এই সমস্যা আমাদের সময়ের অন্যান্য অনেক সমস্যার মতোই একসংগে আলোচিত হচ্ছে, সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যাপারে অন্যতম প্রধান মার্কিন বিশেষজ্ঞ লিণ্টন কল্‌ডওয়েল আমাদের কালের এই আন্দোলনকে—যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সমাজের সংগে প্রকৃতির আদানপ্রদানকে যুক্তিসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা—মার্ক্‌সবাদের সংগে তুলনা করেছেন, যে মার্কসবাদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কল্‌ডওয়েলের মতে মার্ক্‌সবাদের মতোই এটা এমন একটা দর্শন যেটা "কাজে পরিণত করতে

হয়।...বিজ্ঞানের জন্য এটা গড়ে উঠেছে বলে এ দাবি করে; মানুষের সঙ্গে ইতিহাসের ও পারিপার্শ্বিক জগতের সম্পর্ক দিয়ে এর কয়েকটি সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়েছে এবং এ থেকে বিশেষ কর্ম-প্রণালী নির্ধারিত হয়।" (ইম্‌ডিকশন অব আর্থ, ব্লুমিংটন, ১৯৭২; পৃষ্ঠা ৪)।

জুন ১৯৭২ সালে স্টকহোলমে মানুষের পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য যে বিশ্ব-কনফারেন্স হয় সেটি একটি প্রধান আন্তর্জাতিক ঘটনা, এই কনফারেন্সে ১১৪টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেয়; তাতে দেখা যায় যে, সকল দেশের প্রতিনিধিরাই একজোটে পরিবেশ রক্ষার্থে কাজ করতে আগ্রহী ও সম্মত। তবে কনফারেন্সে কয়েকটি বিশিষ্ট ভিন্ন মতামত প্রকাশিত হয়; এই কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক মতাদর্শগত এমন কি দার্শনিক-ধর্মীয় মতভেদ ও পার্থক্য রয়েছে।

পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে আরও ব্যাপক করে আন্তর্জাতিক সংহতির জন্য ডিসেম্বর ১৯৭২ সালের ইউনাইটেড নেশন্‌স জেনারেল এসেমব্লি ৫-ই-জুন তারিখটিকে বিশ্ব-পরিমণ্ডল রক্ষার দিন বলে ঘোষণা করে এবং "প্রতি বছর ঐদিন বিভিন্ন সংস্থাকে সারা দুনিয়া জুড়ে এমন কাজ করতে বলে যাতে পরিমণ্ডল রক্ষা করা এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করার কাজটা ঘোষিত হয়।"

আগামী দশকগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির আরও বেশি কার্যকল্যাণের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নাগরিকদের যে ক্ষতি* (ইচ্ছাকৃত বা আকস্মিক ভাবে) ঘটতে পারে তা থেকে নানা রকমের ঝগড়া-ঝাঁটি হতে পারে। এই কারণে পরিবেশ রক্ষার জন্য আরও ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন করতে হবে। ইউনাইটেড নেশন্‌সের পরিমণ্ডল রক্ষার প্রোগ্রামের পূর্বতন প্রধান মরিস স্ট্রং ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, "আগামী ১০ থেকে

---

* উদাহরণ স্বরূপ এক রাষ্ট্র এ্যাটম বোমার পরীক্ষা করলে তার তেজঃক্রিয় পদার্থ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের ও অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে পারে—অনুবাদক।

১৫, বস্তুতে পরিবেশ নিয়ে আগ্রাসন[৭] একটা বড়ো রকমের রাজনৈতিক বিবাদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াতে পারে।" "পরিমণ্ডল নিয়ে আগ্রাসন" বলতে স্টুংগ প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের পরিমণ্ডলকে ক্ষতি করার ব্যাপার বলে ব্যবহার করেছেন।

পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা যেতে পারে এবং সেটা শিল্পে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দুই দেশ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির দিক থেকেও করা হচ্ছে। এই দুই দেশের যে সকল প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আছে, তার প্রকৃষ্ট ব্যবহার করার জন্য এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া দরকার; বিশেষ করে মহাকাশ সংক্রান্ত যতো কিছু প্রযুক্তি আছে তাতে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হবে কারণ জাতীয় পরিস্থিতিতে অথচ দুনিয়ার ও আঞ্চলিক-ভৌগোলিক প্রোগ্রামের ভিত্তিতে মহাকাশ সংক্রান্ত প্রযুক্তি সরাসরি কাজে লাগে।

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত সমস্যার সামগ্রিকভাবে সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো যুক্তভাবে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেগুলোর কাঠামোও কতো বড়ো হবে তাতে প্রভেদ থাকতে পারে। যেখানে আর্থনীতিক দিক থেকে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দেশগুলো একেবারে জটিল ও নতুন এবং অনেক সময়ে একেবারে অনন্য প্রযুক্তির উন্নতির জন্য মোটা টাকা খরচ করতে পারে, উন্নয়নশীল ও কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশ সেই ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নতির ফল লাভ করতে পারে দ্বিপাক্ষিক অথবা আঞ্চলিক চুক্তির ভিত্তিতে অথবা ইউনাইটেড নেশন্‌স ও বৃহৎ বিশিষ্ট ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠনের মারফত।

একটা বিষয় কিন্তু পরিষ্কার: প্রাকৃতিক সম্পদকে পুরো সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করা, তার যুক্তিসম্মত ব্যবহার করা, তাকে রক্ষা ও পুনরুৎপাদন

---

৭. অর্থাৎ, এক রাষ্ট্র এমন কাজ করলো যাতে অন্য রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যকর পরিমণ্ডল দূষিত হয়ে গেল। যেমন হয়তো এক দেশের পারমাণবিক শক্তি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার থেকে নির্গত দূষিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ—সেই দেশের নদীর জল বয়ে অন্য দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেই একই নদীকে দূষিত করলো—অনুবাদক।

করা এবং দুনিয়া জুড়ে পরিমণ্ডল রক্ষায় ব্যবস্থা করার ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবেই রাড়ছে।

এই দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ১৯৭৫ সালে ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা শীর্ষক কনফারেন্সে নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা নেবার জন্য চূড়ান্ত আইন (ফাইনাল এক্ট) যেটা গৃহীত হয়েছে সেটা সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতিফলন, যে পরিবর্তন আনিবার জন্য বহু রাষ্ট্রের শান্তির পক্ষে সংগ্রামকারী শক্তিগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে ক্রমাগত চেষ্টা করে এসেছে। যে দলিলকে দুনিয়ার প্রেস যথার্থই "আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সনদ" বলে ঘোষণা করেছে, সেই দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে ইউরোপীয় ৩৩টি দেশের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নেতারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফলকে চূড়ান্ত রূপ দিলেন এবং একবাক্যে পারস্পরিক শক্তির ভিত্তিতে পাঞ্জা লড়ার পলিসির ভ্রান্তি ও অসারতা স্বীকার করে নিলেন, যে পলিসি বহু বছর ধরে দুনিয়ার বহু রাষ্ট্রের ও ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে একটা কালো ছায়া এনে দিয়েছিল।

হেলসিংকি কনফারেন্সের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কারণ এতে ইউরোপীয় মহাদেশকে সুস্থিত শান্তির জন্য ও পারস্পরিক সুবিধাজনক ফলপ্রসূ সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রধান নীতি ও কার্যক্রমের নির্দেশ ছকে দেওয়া হয়েছে; প্রসংগত এই ইউরোপীয় মহাদেশই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে দুই মহাযুদ্ধের ক্ষতিতে ভীষণভাবে ভারাক্রান্ত হয়েছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 'পরিমণ্ডল ও আর্থনীতিক' কার্যক্রমের অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে পারলে ইউরোপ ও সারা দুনিয়াতে শান্তি জোরদারভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে—কনফারেনসে যোগদানকারী রাষ্ট্ররা এ সম্পর্কে তাদের আস্থা আছে বলে ঘোষণা করেন।

চূড়ান্ত আইন (ফাইনাল এক্ট)-এর একটি বিশেষ অনুচ্ছেদে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য সহযোগিতার প্রোগ্রামের রূপরেখা বেশ ভালো করে দেওয়া আছে।

"পরিমণ্ডল রক্ষার এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বজায় রেখে আর্থনীতিক বিকাশ ও প্রযুক্তির উন্নতি"-র জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

প্রতিটি রাষ্ট্রই তাদের দায়িত্ব স্বীকার করে নেন যে, "আন্তর্জাতিক আইনের নীতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে তাদের এলাকাতে এমন কাজকর্ম করা যেতে পারে যাতে অন্য রাষ্ট্রের পরিমণ্ডলের ক্ষতি না হয়।"

এই প্রোগ্রামে সহযোগিতার জন্য নিম্নলিখিত প্রধান পয়েন্টগুলো লিপিবদ্ধ আছে: "পরিমণ্ডল সংক্রান্ত এমন সমস্যাগুলো অনুধাবন করতে হবে যাদের মাত্রা রয়েছে বহুধা, পারস্পরিক এবং পুরো এলাকা বা এলাকার খানিকটা নিয়ে···পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রয়োজনমতো তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করার পন্থাগুলোকে যেমন যেমন পারা যাবে, সেইভাবে মিলিয়ে সাজাতে হবে। পরিমণ্ডল দূষিত করার ব্যাপারটাকে জানতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নিতে হবে···পরিমণ্ডল সংক্রান্ত পলিসিগুলোকে আরও কাছাকাছি আনবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে···পরিমণ্ডলকে খুটিয়ে বিচার করে তাকে রক্ষা ও বাড়াবার ব্যবস্থার জন্য যন্ত্রপাতির আরও বিকাশ, উৎপাদন ও উন্নতিসাধন করতে হবে।"

ইউরোপের সব রাষ্ট্রেরই প্রগতিশীল জনতা এই ধরনের গঠনমূলক সহযোগিতার প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল। এটাকে সফলভাবে কাজে পরিণত করতে পারলে সমাজ, প্রযুক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে আজকের ও ভবিষ্যৎ পুরুষের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। বেলগ্রেডে এর পরে যে মিটিং হল (যাতে হেলসিংকি কনফারেন্সের কাজকর্মের খতিয়ান করে দেখা হবে), তাতে আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ব্যাপারে এবং পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য সোভিয়েতের প্রস্তাব—পরিমণ্ডলের, যান-বাহনের ও শক্তির সমস্যা নিয়ে ইউরোপীয় কনফারেন্স ডাকা হোক—সেটা যে

বিশেষভাবে সঙ্কীর্ণ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো বোঝাবা ক্রমকর্মে সোভিয়েতের এই প্রকার হেলসিংকির চুক্তিতে কাজে পরিণত করতে সাহায্য করবে। সারা ইউরোপের পরিমণ্ডল রক্ষার ও বাড়াবার জন্য এই ধরনের সহযোগিতা থেকে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

পরিমণ্ডল সংক্রান্ত অনেক রকমের দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার প্রোগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজ করে যাচ্ছে। জীবমণ্ডল রক্ষার জন্য সহযোগিতাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুবিধাজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজের একটা অপরিহার্য অংগ বলে মনে করে। কোনো না কোনো আকারে প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করা ও তার যুক্তিসম্মত ব্যবহার করার কাজের হিসেব সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে অনেক পাওয়া যাবে।

১৯৭০ সালের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য অনেক সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশের (গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্র, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড ও আরোও অনেক) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ভিত্তিতে যৌথভাবে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত কাজ করার পরিধি বাড়িয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪-শ কংগ্রেসের রিপোর্টে বিশ্বশান্তির জন্য যে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে তাতে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত সমস্যার সমস্যাগুলোর প্রধান দিকগুলো সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে। ২৫-শ কংগ্রেসে তাকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

এই প্রোগ্রামে, আমাদের কালের সারা দুনিয়া জুড়ে যে সকল সমস্যা ব্যেপে আছে তার মধ্যে পরিমণ্ডল রক্ষার সমস্যা অন্যতম একটি এবং তাকে একমাত্র ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমাধান করা সম্ভব। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ২৫-শ কংগ্রেসের রিপোর্টে বলা হয়েছে: "দুনিয়া জুড়ে যে সকল সমস্যা, যেমন মৌলিক পদার্থ ও শক্তি আহরণের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও ছড়িয়ে-পড়া ব্যাধিদের দূর

করার, পরিমণ্ডল রক্ষা করায়, মহাকাশ পর্যটন করার এবং বিশ্বসমুদ্রের সম্পদের ব্যবহার করার সমস্যাবলী ইতিমধ্যেই যথেষ্ট গুরু ও জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে এরা প্রতিটি জাতির জীবনে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্টত প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করবে। সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থকে প্রভাবিত করে যে সকল সমস্যাবলী, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মতোই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাদের সমাধান করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না।"

অন্য সকল রাষ্ট্রগুলোর, এমন কি যাদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-আর্থ-নীতিক গঠন আছে তাদের সংগে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক জগতের অন্তর্ভুক্ত অন্য রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতার ব্যবস্থা করে এবং তাকে আরও ব্যাপক করার উদ্যোগ নিয়ে শান্তি সুরক্ষিত করার যথার্থ জমিন্ তৈরি করছে, আর একই সংগে সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে যুক্তিসম্মত লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

১ম পরিচ্ছেদ

পরিবেশ ও আজকের সমাজ

"আধুনিক মানুষের সামনে ক্রমাগতই নিজেকে অবলুপ্ত করে দেবার সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়াটাই যেন তার অভিশাপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার নিয়ে সে এমনভাবে বেরিয়ে এলো যাতে সব রকমের মানবিক জীবন লুপ্ত করে দেবার ক্ষমতা তার হাতে এলো।...আর এখন তার সামনে মানুষেরই সৃষ্টি নতুন বিপদ দেখা দিয়েছে যেটা হল সে তার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকে দূষিত করে দিতে পারে।" আমেরিকার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউজ উইক'-এর ২৬-শে জানুয়ারি ১৯৭০-এ এইভাবেই দুঃখপ্রকাশ করে পরিমণ্ডলের ক্ষতি করার ফলে আমেরিকার সমস্যা আর্থনৈতিক বিপদের সঙ্গে মিলিয়ে এক নতুন পর্যায়ে যে দেখা দিয়েছে, সে দিকে জনসাধারণের নজর টানার চেষ্টা হয়েছে।

জনগণের কাছে গণ-আকারে প্রচার করার ব্যবস্থাদি (ম্যাস-মিডিয়া) এবং বুর্জোয়া তাত্ত্বিক চিন্তার কয়েকজন প্রবক্তা পরিমণ্ডলের সমস্যাকে যেন একটা একেবারে নতুন হঠাৎ কোনো ব্যাপার যেটা বেশির ভাগ লোক এর পূর্বে আশঙ্কাই করতে পারে নি—এইভাবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। কয়েকজন লেখক অবশ্য পরিমণ্ডলের একেবারে মূলতঃ ক্ষয় হওয়ার কারণ বার করার চেষ্টা করেছেন। ফরাসী পত্রিকা, 'ল্য মণ্ড'-এ রেনে প্যাসে লিখেছেন : "পরিমণ্ডল দূষিত হওয়া, চতুর্দিকের আবহমণ্ডলের ক্ষয় করা, নিরাপত্তার সাধারণ নিয়ম-কানুনকে লঙ্ঘন করা, জনসাধারণের সুবিধার্থে ব্যবস্থাদি করে যাওয়া... আজকের দিনের এই সকল ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো মোটেই খামখেয়ালীপনা

নয়। লাভজনক কোন্‌টা হবে সেই ধারণা থেকে অর্থনীতিক্ষেত্রে যে হিসেব করা হয় তাতে ভিত্তি করে কয়েকটি সিদ্ধান্তের এটা হল যুক্তিসম্মত পরিণতি।

সত্যই প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের বিকাশের বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েকটি দশকে একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায় দেখা যাচ্ছে। বহু হাজার বছর ধরে মানুষের ইতিহাসে সমাজ গঠনের কাজে প্রকৃতিতে সামান্য যে পরিবর্তন দেখা যেতো তাতে যে পরিমণ্ডলে সেটা করা হতো তাতে বিশেষ কোনো প্রভাব পড়তো না ; তার কারণ সমাজের অগ্রগমনের জন্য প্রকৃতির আপাতদৃষ্টিতে 'অফুরন্ত' সম্পদে হাত পড়তো না।

প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর সঙ্গে শিল্পায়ন ও তার বিকাশের একটা যোগসূত্র আছে বলে অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন ; এতে পরিমণ্ডলের ওপরে মানুষের ক্রিয়াকলাপ সাধারণ অনেক কাজকর্মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এই অবস্থাতে পরিমণ্ডলের ওপরে বিস্তৃত পুনরুৎপাদন (extended reproduction)[৮] সংক্রান্ত মানবিক ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতিতে সেই ধরনের কাজের কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে তার বিচার না করে এমন ধরনের অপরিবর্তনীয় নেতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে যেটা সাধারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা পুনরায় আগের স্বাভাবিক মধ্য (neutral) অবস্থায় আনা সম্ভব নয়।

প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের "অন্তবর্তী স্তর" থেকে নতুন স্তরে যাওয়া প্রধানত এমন একটা অবস্থা যখন উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও পরিমণ্ডলের

---

৮. এখানে উৎপাদন (production) ও পুনরুৎপাদন (reproduction), তথা বিস্তৃত পুনরুৎপাদন (extended reproduction) মার্কসীয় অর্থনীতির সংজ্ঞা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মার্কসীয় অর্থনীতিতে পুনরুৎপাদন অর্থে বোঝায় মৌলিক তাত্ত্বিক শিল্পসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির বা শিল্পায়নের জন্য গোড়াকার এমন জিনিসের উৎপাদন, যাতে সেই যন্ত্রপাতি বা সেই ধরনের মৌলিক জিনিস থেকে অন্য যন্ত্রপাতি বা শিল্পায়ন করা যায়—অনুবাদক

গুণগত অবস্থার মধ্যে সরাসরি যে সম্বন্ধ আছে সমাজ সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে কয়েকটি মান (কাজ করার রীতি, standards—অনুবাদক) ঠিক করে। কোনোভাবে এই মানের ক্ষতি করলে মানুষের সমাজের সাধারণ কাজের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। আগেকার শতাব্দীতে প্রকৃতির কাজ ছিল রত্নখনির মতো যা থেকে মানুষ তার শুধু সম্পদ আহরণ করতো না, প্রকৃতির কাজ ছিল যেন গৃহরক্ষক দরওয়ানের মতো যে, সমাজের পুরো কর্মক্ষেত্রকে—জনবহুল যেখানে শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে—সেখানে প্রকৃতি যেন উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যবহারিক কাজকর্ম হয়ে যাবার পরে সবকিছু আবার ঝাড়পোঁছ করে পরিষ্কার করে তাকে আবার পূর্ববৎ সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়ে এনে দিতো। কিন্তু আজকের সমাজকে এই গ্রহে স্বাভাবিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে সেই ধরনের কাজের (অর্থাৎ পূর্ববৎ সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার—অনুবাদক) প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে। এই অবস্থায় এটা স্বীকার করতে হবে যে, প্রকৃতি সংক্রান্ত সামাজিক কাজকর্ম করতে হলে খুঁজে বের করতে হবে সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপ যেটা শিল্প থেকে নির্গত যে সকল দূষিত পদার্থ পরিবেশের প্রত্যক্ষ ক্ষতি সাধন করে তাদের শোধন করে এমনভাবে অকেজো করে দিতে হবে যাতে তারা ক্ষতি করতে না পারে।

অনেক দেশের বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের লেখাতে প্রকৃতির সাধারণ চক্রগুলোতে[৯] নির্গত বস্তুর ও জৈবিক পদার্থের প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন; তাঁরা দেখিয়েছেন, প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষের স্থান এবং জীবজগতে মানুষ এমন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে যাতে যুক্তিসম্মত অভিসন্ধি নিয়ে কাজ করে মানুষ প্রকৃতিকে কাজে লাগাতে পারে এবং তার বিচারমতো পরিমণ্ডলের কয়েকটি উপাদানকে বদল করে নিতে পারে।

অনেক ধরনের প্রাকৃতিক সমস্যার এবং পরিমণ্ডল সম্পর্কে থিওরি খাড়া

---

৯. যেমন বাষ্প্য-চক্র, যাতে নির্গত দূষিত পদার্থ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই পরিশোধিত হয়ে নানান শুদ্ধ পদার্থ-রূপে ফেরত আসে—অনুবাদক।

করার জন্য পড়াশুনাতে কয়েকজন বড়ো বড়ো প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর অবদান রয়েছে, যেমন, এলেকজাণ্ডার ভন্ হেমবোল্ড, কার্ল ভন লিনে, আর্ন্স্টহেকেল, যিনি প্রথম বাস্তব্য-বিদ্যার (বা ecology) কথা বলেন, চার্লস ডারউইন, এলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস্, লরেন্স হেণ্ডারসন, জিন লামার্ক, মিখাইল লোমো-নোসভ, ফ্রিডিক ওয়াগনার, পিয়ের তাই য়ার্ড দ্য শ্যারদাঁ, রেনে দুবো, বারবারা ওয়ার্ড, ব্যারি কমনার, ডিমিট্রি মেনডেলেভ্, ভ্যাসিলি ডুকাচায়েভ, ক্লিমেণ্ট তিমিরাজেভ, নিকোলাই ভ্যাভিলভ, এলেক্জাণ্ডার ভিনোগ্রাদভ ও ইভেনি ফিয়োদোরোভ।

পরিমণ্ডল এবং গ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে বাইরের যে আবরণ সেটাই তাদের বিচার্য বিষয়। এর মধ্যে রয়েছে আবহমণ্ডল[10] (যার মধ্যে আবার স্ট্র্যাটো-স্ফিয়ার[11] ও ট্রপোস্ফিয়ার[12]। পৃথিবীকে ঘিরে যে জলকণা বিশিষ্ট পরিমণ্ডল রয়েছে তাকে বলে হাইড্রোস্ফিয়ার বা জলমণ্ডল আর পৃথিবীর জমির

---

১০. পৃথিবীর জল-মাটিকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডলের আবরণ সেটি মোটামুটি হিসেবে মাত্র ২০০ মাইল পুরু, যেখানে পৃথিবীর ব্যাস হল ৮,০০ মাইল এবং পরিধি হল ২৫,০০০ মাইল। অর্থাৎ পৃথিবীকে বেশ বড়ো গোল কমলালেবুর মতো ভাবলে এই ২৫,০০০ মাইল বেড়-যুক্ত কমলালেবুর চারধারে মাত্র ২০০ মাইলের পাতলা একটি খোসার মতো বায়ুমণ্ডলের আবরণ পরানো আছে। অথবা দ্বিমাত্রিক রূপে যদি আমরা দেখি, তাহলে সমুদ্রতলে যে মানুষ বাস করে তার মাথার উপরে যেন ২০০ মাইল গভীর বায়ুসমুদ্র রয়েছে, যার একেবারে তলদেশে মানুষ বিচরণ করে।—অনুবাদক

১১ ও ১২. এই বায়ুমণ্ডলের অনেক স্তরভাগ আছে। তার মধ্যে সমুদ্রতল থেকে মাত্র প্রথম ৬।৭ মাইল ঊর্ধ্বে গেলেই যে অঞ্চলটা পড়ে, সেখানেই যাবতীয় ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। তার নাম ট্রপোস্ফিয়ার।

এর পরে প্রায় ১০।১১ মাইল অবধি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, যেখানে বায়ু থাকলেও মানুষের প্রাণ-ধারণের উপযোগী একেবারেই নয়। বস্তুত্ সাধারণ মানুষ উচ্চে মাত্র ৫ মাইলের বেশি গেলেই প্রাণ ধারণের উপযোগী বায়ু পায় না।

এই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার দিয়ে আজকাল আমাদের জেট প্লেন উড়ে যায়। বায়ুর ঘর্ষণ খুব সামান্য বলে তাদের গতি খুব দ্রুত হয়—অনুবাদক।

উপরাংশে যে আবরণ রয়েছে তাকে বলে লিথোস্ফিয়ার। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুল বাস করে এই বাইরের আবরণে, (অর্থাৎ জল-মাটি, সামান্য মাটির নীচে এবং সামান্য উপরদিকের বায়ুমণ্ডলে)—প্রাণী বাস করার এই পুরো অঞ্চলটাকে আমরা বলি জীবমণ্ডল বা বাইওস্ফিয়ার।

বিশিষ্ট-সোভিয়েত বিজ্ঞানী, ভ্লাদিমির ভার্নাডস্কি প্রথম জীবমণ্ডল সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক থিওরি (বা তাত্ত্বিক মতবাদ) প্রবর্তন করেন। সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের উল্লেখ করে তিনি দেখান: "সমগ্র মানবজাতি সারা ভূমণ্ডল যোগে তার কর্মক্ষেত্র প্রসার করে একটা শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার সামনে তার চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে সারা মানুষকে একক সত্তা ধরে মুক্ত মানুষের স্বার্থে জীবমণ্ডলকে পুনর্গঠন করার সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভার্নাডস্কির লেখাতে "নুস্ফীয়ার" (বা ধী-মণ্ডল) বলে একটা সংজ্ঞা ঠিক করা হয়েছে যেটা মানুষের বুদ্ধির প্রভাবাধীন। তাঁর প্রবন্ধ "গ্রহে বৈজ্ঞানিক জীবনের লক্ষণ" নামে তিনি বিশেষ জোর দিয়ে দেখিয়েছেন যে, "মানুষের চিন্তাও কর্মের দ্বারা জীবমণ্ডলকে একটা নতুন অবস্থাতে পরিবর্তিত করা যায়, যার নাম দিয়েছেন তিনি ধীমণ্ডল।

জীবন্ত প্রাণীদের সংগে তার পরিবেশের জটিল প্রতিক্রিয়ার সবটাই নিয়ে একটা আলাদা বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, যার নাম "বাস্তব্য-বিদ্যা" (ecology)।[১৩] জীবন্ত প্রাণীদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের আবাস পরিমণ্ডলের সঙ্গে প্রতি-

---

১৩. Ecology ও Economics-এর উৎপত্তিগত শব্দটি হচ্ছে Eikos, অর্থ—বাস। তাহলে উৎপত্তিগত অর্থ ধরলে Ecology হল 'বাস্তু জ্ঞান' এবং Economics হল 'বাস্তু কার্যক্রম'। কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগে Economics বলতে আমরা 'অর্থনীতি' বুঝি।

Ecology শব্দটি অপেক্ষাকৃত নতুন—চলতিকায় উৎপত্তিগত রূপ বলা হচ্ছে 'বাস্তব্য-বিদ্যা'। কিন্তু গ্রীক Eikos-এর একটি পুরনো সংস্কৃত প্রতিশব্দ আছে—ওক।

তাহলে আমরা Ecology-কে ওকশাস্ত্র বা ওকবিদ্যা বলতে পারি। ভিয়েতনামে আমেরিকান সমরবাদীরা যখন Ecocide করার চেষ্টা করেছে তাকে তাহলে আমরা ওকনাশ বলতে পারি।—অনুবাদক।

ক্রিয়ার ফলে জটিল বাস্তব্য-ব্যবস্থা গড়ে উঠে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'বাইওজিওসেনোলোজি' অথবা "জীব-পার্থিব মণ্ডলের বিশ্লেষণ"।

বাস্তব্য-ব্যবস্থাতে এক স্তর বা যোগসূত্র থেকে অন্য স্তরে শক্তির লেনদেন হয় এবং এটা সারবস্তুর জৈবিক চক্রের চেহারা বা কাঠামো গ্রহণ করে। যেমন উদ্ভিদরা তাদের কার্যকলাপের ফলে টিস্যু (বা গ্রথিত কোষসমূহ) সৃষ্টি করার জন্য সৌরশক্তির এবং জমিতে খনিজ পদার্থের ব্যবহার করে। গাছপালা ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে উদ্ভিদভোজী নিরামিষ আহারী প্রাণীরা। বাস্তব্য-ব্যবস্থাচক্রে যাকে বলে খাদ্য জোগানের শিকল (food chains), সেটা চালু থাকে বলে এই উদ্ভিদভোজী প্রাণীরা নিজেরাই মাংসভোজী প্রাণীদের শিকারে পরিণত হয়। যে বস্তুগুলো দিয়ে জীবন্ত প্রাণীদের কোষসমূহ গ্রথিত হয়, সেগুলো আবার জৈবিক চক্রে (biological cycle) হয় এই জৈবিক-রাসায়নিক, নয় শুধু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফিরে আসে।

এই-চক্রটা শুরু হয় সালোক-সংশ্লেষের (photo synthesis) দ্বারা, যাতে সবুজ উদ্ভিদরা কারবন ডাই-অক্সাইড্ জল ও খনিজ পদার্থ গ্রহণ করে। সালোক-সংশ্লেষ মুক্ত অক্সিজেনও জন্ম নেয়। বস্তুত, গত ২০০ কোটি বছরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ অক্সিজেন রয়েছে তার সমতা এই প্রক্রিয়াতেই রক্ষিত হচ্ছে।[১৪] সালোক-সংশ্লেষের প্রক্রিয়াতে যে অক্সিজেন তৈরি হয়, সেটা জলের অক্সিজেন (অর্থাৎ; জলে যে দুটি হাইড্রোজেন

---

১৪. পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে মোটামোটি ৪৫০ কোটি বছর অতীতে এবং তাতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে মাত্র ২০০ কোটি বছর অতীতে।

আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছিল না। উদ্ভিদরূপী প্রাণের প্রথম সৃষ্টি হবার পরে সালোক-সংশ্লেষের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। কারণ উদ্ভিদরা কারবন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে তাদের যেন প্রশ্বাসের সঙ্গে, আর ত্যাগ করে অক্সিজেন তাদের যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে। ঠিক আমাদের মানুষ বা অন্য প্রাণীর উল্টো প্রক্রিয়া। উদ্ভিদদের এই কারবন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন ত্যাগ করার জন্য সূর্যালোকের দরকার হয়, যেজন্য সমগ্র প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় সালোক-সংশ্লেষ।

পরমাণুর সঙ্গে একটি অক্সিজেন পরমাণুর যৌগিক মিলনের ফলে জল হয়, সেই অক্সিজেন—অনুবাদক) যেখানে সূর্যরশ্মির যেটুকু পৃথিবীতে পৌঁছায় তার মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র (০, ২%) সালোক-সংশ্লেষের কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বছর জৈবিক পদার্থের মধ্যে ১,০০০,০০০,০০০ টন হল উদ্ভিদরা এবং তারা প্রায় সেই পরিমাণ অক্সিজেনই সৃষ্টি করে। সবুজ উদ্ভিদদের থেকে উৎপন্ন হয় যে জৈবিকপদার্থ (যেমন গাছপালা পচে গেলে যেটা পড়ে থাকে—অনুবাদক) সেটা আবার জন্তুজগতের খাদ্য হিসেবে এবং শেষ অবধি মানুষের খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের কার্যকলাপ ছাড়াই বলা যেতে পারে, জীবমণ্ডলকে এমনভাবে সংগঠিত করা হয়েছে যাতে কোনো অপব্যয় না করে উৎপাদন করা যায়—কয়েকটি জৈবিক পদার্থের নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য কাজকর্ম অন্যদের পক্ষে অত্যাবশ্যকভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। মানুষের প্রভাব ব্যতিরেকেই প্রাকৃতিক শক্তিদের প্রভাবে বাস্তব্য ব্যবস্থা সমূহ আলাদা ভাবে গড়ে উঠেছে। সেই প্রাকৃতিক শক্তিগুলো হল : বিভিন্ন প্রজাতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, খাদ্য ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক যে যোগসূত্র (food chains) আছে, সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি।

প্রকৃতির এই মৌলিক প্রক্রিয়া ব্যক্তিমানুষের ব্যথা সমগ্র সমাজের জন্য একটা ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। আজকের সভ্যতার উচ্চস্তরে এটা (অর্থাৎ

যাই হোক, পৃথিবীতে উদ্ভিদ সৃষ্টি হবার পর থেকে সালোক-সংশ্লেষের প্রক্রিয়াতে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে আজ প্রায় শতকরা ২১ ভাগ।

তাহলে প্রাণীরা অক্সিজেন গ্রহণ করে কারবন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করছে আর উদ্ভিদরা করছে ঠিক তার উল্টো কাজ—এইভাবেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি অকসিজেন-কারবন ডাই-অক্সাইড ষড়সম্পূর্ণ বাস্তব্য-চক্র (ecological cycle) তৈরি হয়েছে। সহজেই বোঝা যায়, কোনো কারণে পৃথিবীতে উদ্ভিদবংশ ধ্বংস হয়ে গেলে আমাদের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনও থাকবে না।—অনুবাদক।

প্রকৃতির যৌগিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি—অনুবাদক) ঠিকমতো চালু থাকা বিশেষ করে জরুরী ; এতে সমাজ যেমন প্রকৃতির উৎপন্ন দ্রব্যকে তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী চেহারা পাল্টে দিয়ে কাজে লাগায়, তেমনি সমাজ তার নিজের প্রয়োজনে কৃত্রিম বস্তু ও তার কাজ চালাবার জন্য বন্দোবস্ত করে এবং এমন ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ তৈরি করে যার অনুরূপ কিছু প্রকৃতিতে কোনোদিন নেই বা ছিল না।

আজকের দিনের মানুষের উন্নতির স্তরের নতুন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দুটি "পরিমণ্ডল"-এ সমকালীন মানুষ বাস করছে তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই যে ঘাত-প্রতিঘাত হচ্ছে তারই জটিলতা ও সর্বব্যাপকতা। এই দুই "পরিমণ্ডল" হচ্ছে জীবমণ্ডল ও প্রাযুক্তিক-মণ্ডল (Vechnosphere), শেষোক্ত হচ্ছে মানুষ তার উৎপাদনের উপকরণের জন্য যা তৈরি করেছে। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের "গোড়াকার নিয়ম"গুলো যা স্থিরীকৃত হয়েছে তাকে ব্যবহার করে প্রাযুক্তিক-মণ্ডলের উপাদানগুলো। সেগুলো ইতিমধ্যেই একটি বিশিষ্ট অন্তর্কাঠামো, যার পরিধি ও বস্তুগত প্রভাব প্রকাশিত হয় পরিমণ্ডলের বিরাট এলাকা জুড়ে এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়েই। ইদানীংকালের দশকগুলোতে জীবমণ্ডল ও প্রাযুক্তিক-মণ্ডলের মধ্যে ভারসাম্যের অভাবে প্রচুর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া আজকের যা ঝোঁক তাতে এই দুইয়ের মধ্যে আদান প্রদানে দ্বন্দ্ব আরও বাড়বে। একমাত্র সমাজ তার কাজকর্মের চিরাচরিত ধরন ও পদ্ধতিকে বেশ ভালো করে শুধরে বদল করেই জীবমণ্ডল ও প্রাযুক্তিক-মণ্ডলের মধ্যে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, অথবা আরও সঠিকভাবে এটাকে (অর্থাৎ এই ভারসাম্যকে—অনুবাদক) একটা নতুন ও উচ্চতর পর্যায়ে স্থাপন করতে পারে, যেটা আজকের উৎপাদন-শক্তির বিকাশের উপযোগী হবে।

প্রসংগত, বিখ্যাত বই "একটিই আমাদের পৃথিবী" (Only One Earth)-এর লেখকরাও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই বইয়ের

প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হচ্ছে এইভাবে : "মানুষ দুটি জগতে বাস করে। একটি হচ্ছে উদ্ভিদ ও জন্তুজগত, পৃথিবীর মাটি ও জল যেটা মানুষের জন্মের কয়েক শত কোটি বৎসর পূর্বেই ছিল এবং যার অংশ সে। অন্যটা হচ্ছে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সে নিজে যে কৃত্রিম জগৎ নির্মাণ করেছে।" (বারবারা ওয়ার্ড ও রেনে দুপে, "একটিই আমাদের পৃথিবী", নিউ ইয়র্ক, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১)।

প্রকৃতির সঙ্গে স্পষ্টভাবে সামাজিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন প্রকৃতিকে ব্যবহার করার জন্য সর্বাত্মক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে একটা যুক্তিসম্মত রণনীতি (স্ট্র্যাটেজি) ঠিক করা; এটা করতে হলে রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে একটা তাত্ত্বিক নীতি নিয়ে বিচার করতে হবে। মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, অনেক বৈজ্ঞানিকই বারবার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বের দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন এবং এ থেকে সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের কালে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের সেই সকল ঘটনার, বিশেষ করে ধনতন্ত্রের বিকাশের সময়ের ঘটনাগুলোর দিকে নজর টেনেছেন যখন মানুষের কার্যকলাপের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদে ভালো করে সজ্জিত বিরাট বিরাট এলাকাকে নষ্ট করা হয়েছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর বিশৃঙ্খল কার্যকলাপের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদকে বেহিসেবী খরচ করে ফেলা হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতি হয়েছে জনসাধারণের দুঃখভোগ।

এঙ্গেলস তাঁর সময়ের অগ্রসর দেশগুলির বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক বিকাশের অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক লক্ষ্য করে লিখেছেন : "প্রকৃতিকে মানুষ জয় করতে পেরেছে এইরকম মনে করে আমাদের নিজেদের খুব বেশি সন্তোষ প্রকাশ না করাই ভালো। এই ধরনের প্রত্যেক জয়ের জন্য প্রকৃতি আমাদের ওপর তার প্রতিশোধ আদায় করে নেয়। এটা সত্য যে, প্রথমের দিকে প্রতিটি জয়ে

আমরা যে কথা আশা করেছিলাম তাই ঘটে; তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে এর প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হয়ে দাঁড়ায় এবং এমন অভূতপূর্ব কুফল দেখা দেয় যাতে প্রথম বারের ভালোটুকুকে নাকচ করে দেয়।" (ডায়ালেকটিকস্ অফ নেচার, এঙ্গেলস, মস্কো, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১৮০)।

মানুষের ইতিহাসের আসল ভিত্তি, যেখানে সে অন্য থেকে পৃথক, সেটা হল—মানুষ প্রকৃতিকে কি ভাবে দেখে। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বিশেষ কৃতিত্ব যে, এই মূল প্রতিপাদ্যকে তারা তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, ইতিহাসে প্রথম কাজ, মানবিক অস্তিত্বের প্রাথমিক প্রয়োজন হল—প্রকৃতি সম্পর্কে সামাজিক প্রায়োগিক ধারণা, যার বাস্তব ভিত্তি গড়ে উঠবে কাজের মাধ্যমে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকবে তার সামাজিক উপাদানের তাৎপর্যের ওপর মার্কস জোর দিয়েছেন: "...এই ব্যাপারে মুক্তি আসতে পারে তখনই যখন সামাজিক মানুষ যারা একজোটে উৎপাদকও বটে তারা প্রকৃতির সঙ্গে তাদের লেনদেনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে। প্রকৃতির অন্ধ শক্তির দ্বারা শাসিত না হয়ে তাকে সাধারণের নিয়ন্ত্রণে এনে; আর এটা করতে হবে সর্বাপেক্ষা কম শক্তি খরচ করে এবং মানবিক চরিত্রের উপযোগী এবং যোগ্য অবস্থার সৃষ্টি করে। (ক্যাপিটাল, মার্কস, ১৯৭১, তৃতীয় ভল্যুম, পৃষ্ঠা ৮২০)।

মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, মানুষ যতোটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে এবং তার যা বিকাশ হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে, সামাজিক সত্তাবিশিষ্ট মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লেনদেনকে যুক্তিসম্মতভাবে পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। একই সঙ্গে অনন্ত বিষয়মুখী সমগ্র বাস্তব সত্তার একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হিসেবে (আর মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতি হচ্ছে ঠিক তাই-ই)। মানুষ তার মধ্যেই অবস্থিত এবং তারই জোরে তাকে তার পারিপার্শ্বিকের বাইরের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে জটিল সম্পর্কের বাস্তব মূল্যায়ন করতে গিয়ে মার্কসীয় চিন্তার প্রতিষ্ঠাতাদের একই সংগে বেশ ভালো ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে দৃঢ় আস্থা ও আশা নিয়ে মানুষের সমাজের সৃজনশীল ক্ষমতার কথা বলেছেন তাঁরা, যেটা উন্নততর ও আরও বেশি যুক্তিসম্মত সংগঠনের দিকে ডায়ালেকটিকির পদ্ধতিতে রূপান্তরের পথে এগোচ্ছে।

'ডায়ালেকটিকস্ অফ নেচার' পুস্তকে এংগেলস যথার্থই বলেছেন: "প্রতিটি পদক্ষেপেই আমাদের মনে রাখতে হয় যে, বিদেশী জনগণের ওপর যেমন বিজয়ীরা শাসন করে আমরা কোনোক্রমেই প্রকৃতির ওপর সেরকম শাসন চালাতে পারি না। আমরা প্রকৃতি থেকে আলাদা নই, পরন্তু—আমরা আমাদের রক্ত, মাংস ও মস্তিষ্ক নিয়ে আমরা প্রকৃতিরই অংগ, আমরা তারই মাঝে বাস করি এবং যেটুকু আমাদের অন্য প্রাণীদের থেকে সুবিধা সেটুকু হল যে, আমরা প্রকৃতির নিয়ম অনুধাবন করে তাকে ঠিক ঠিক কাজে লাগাতে পারি।" (পৃষ্ঠা ১৮০)।

প্রাত্যহিক কাজকর্মে প্রকৃতির নিয়মকানুনকে হিসেবের মধ্যে ধরে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষের সমাজের ক্রমশই জটিলতর সমস্যাকে, যার আগের যুগে কোনো নজীর নেই, সমাধান করতে হবে। এই বিশেষ ব্যাপারটিই চোখের সামনে রেখে মার্কস লিখেছিলেন: "কাজেই মানুষ একমাত্র যে কাজ সমাধান করতে পারে সেইটেই তার সামনে করণীয় হিসেবে হাজির হয়; কারণ ব্যাপারটাকে যদি আরও খুঁটিয়ে দেখা যায় তাহলে এটা সবসময়েই দেখতে পাওয়া যাবে যে, সেই কাজটাই করণীয় কর্তব্য হিসেবে হাজির হয়, যার সমাধানের বাস্তব অবস্থা তৈরি হয়েছে অথবা হবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।" (মার্কস-এংগেলস, সিলেকটেড্ ওয়ার্কস, ভ্যলুম ১, পৃষ্ঠা ১৮২)।

মার্কসীয় বিজ্ঞানকে কাজেই এটা সবসময়েই হিসেবের মধ্যে ধরতে হয় যে, সমাজের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে (প্রথম এবং সর্বাগ্রে হল জনসংখ্যার

বৃদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনা) সমাজের ও প্রকৃতির মধ্যে যুক্তিসম্মত ভারসাম্য রক্ষা করার কাজটার গুণগত পরিবর্তন হয় সেই রকম ভাবেই, আর জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার কাজটার গুরুত্বও ক্রমশ বেড়ে যায়। প্রকৃতির সম্পদকে নিবিড়ভাবে ব্যবহার করা যায় এবং সমাজের ও পরিমণ্ডলের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে জীবমণ্ডলকে নতুন করে তৈরি করা যায়; তবে এটা করতে হলে প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে জানবার কাজটা চালিয়েই যেতে হবে আর সেটা করতে হবে প্রাকৃতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা আছে তাকে চিহ্নিত করে (বা সম্যক বুঝে—অনুবাদক)। কারণ এদের জীবমণ্ডলের ওপর প্রভাব ইতিমধ্যেই বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'মেটিরিয়ালিজম ও এম্পিরিও ক্রিটিসিজম' বইয়েতে লেনিন বলছেন : "...যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমরা প্রকৃতির নিয়ম জানতে পারছি, যার মানুষের মনের বাইরে এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, ততোদিন আমাদের 'অন্ধ প্রয়োজনের' দাস হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমরা একবার এই (প্রকৃতির) নিয়ম জেনে নিতে পারলে যেটা (মার্কস হাজার বার বলেছেন) আমাদের ইচ্ছা এবং মন থেকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে (অর্থাৎ, আমাদের ইচ্ছা—অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না—অনুবাদক)। তখনই আমরা প্রকৃতির ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারি।" (লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস্, ভল্যুম ১৪, পৃষ্ঠা ১৯০)।

প্রকৃতির ওপরে আধিপত্য করবে মানুষ, লেনিনের এই উক্তির দ্বারা বোঝা যায় তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের আসল চালিকা শক্তি হল মানুষের বুদ্ধি, তার মানবতা ও তার নৈতিক বোধ। তিনি মনে করতেন যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব ভিত্তি তৈরি করতে এবং সামগ্রিকভাবে তার উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের আসল শর্ত হল প্রাকৃতিক সম্পদকে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর প্রযুক্তি দিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বিশেষভাবে

ছিঁড় খেয়েছে এবং জটিল হয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে জীবমণ্ডলে বস্তুর ও শক্তির একেবারে নতুন রকমের আদানপ্রদানের ব্যাপারটা দেখা গেছে। যাতে এযাবৎ যে সকল প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় ছিল সেগুলি বিপর্যস্ত হয়েছে। নতুন ধরনের কৃত্রিম উৎপাদনের সঙ্গে আগে থেকে তাদের যে ধরনের গুণাবলী স্থির করা হয়ে আছে তাকে কি করে খাপ খাওয়ানো যাবে এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে চিন্তিত। এর কারণ এই ধরনের বস্তুদের সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থাতেও পাওয়া যায় না অথবা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাধারণ ভাবে যে লেনদেন চলে তাতেও পড়ে না, কাজেই পরিমণ্ডলের ওপরে বিশেষ রকমের চাপ পড়ে। এই রকমের ও আরও অন্যান্য অনেক কারণে সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রকৃতির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যে ভুলগুলো হয় তাদের শুধরে নেবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে; অতএব আজকের দিনে রাষ্ট্রদের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের সম্ভাব্য প্রভাব পরিমণ্ডলের ওপরে কি রকমের হবে সেটা যথাযোগ্য বিচার করে তাদের যুক্তিসম্মতভাবে করতে হবে।

সমগ্র দুনিয়া জুড়ে শিল্পগত উৎপাদনের অবস্থা আজ এমন যে, সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ককে নতুন চেহারা দেওয়াটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আর যদিও পরিমণ্ডলের ক্ষয়ের প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের "অবদান" নানা রকমের, তথাপি সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে লেনদেনের যুক্তিসম্মত চেহারা ঠিক করা ও তাকে প্রয়োগ করার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটা সাধারণ স্বার্থ আছে। এটা আরও দরকার এই কারণে যে, পরিমণ্ডল সংক্রান্ত সব রকমের সমস্যাবলী, বিশেষ করে দূষিত করার সমস্যা প্রযুক্তিগতভাবে সমাধান করা সম্ভব।

কোনো না কোনো বাস্তব্য সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধান সম্ভব কি, না, এটা বিচার করার সময় মনে রাখতে হবে, প্রায়শই পরিমণ্ডলকে জখম করার কারণ এই নয় যে, কোনো না কোনো প্রযুক্তির ব্যবহারের সময় বিচার করে দেখা হল না যে, পরিমণ্ডল রক্ষায় যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি, না, পরন্তু সমাজের

প্রযুক্তিগত কোনো সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে জীবমণ্ডলকে জখম করা হয়। প্রযুক্তির ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য কি হবে সেদিকে যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তার দিকেই শুধু সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকরা নজর দিতে বলেন নি, তাঁরা আরও বলেছেন সমাজের রোজকার জীবনের এবং পরিমণ্ডলের ওপরেও ব্যাপক ভাবে কি প্রভাব হবে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকার বৈজ্ঞানিক কে. স্টানকেল দেখিয়েছেন: "এটা আজ পরিষ্কার যে, প্রকৃতি প্রযুক্তির সীমানা বেঁধে দেয়। মানুষের উর্বর উদ্ভাবনী ক্ষমতাপ্রসূত অনেক ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়াকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। স্বল্পমেয়াদী প্রযুক্তিগত কোনো সাফল্য হয়তো দীর্ঘকালের ব্যবধানে বাস্তব্য কোনো বিপদ ডেকে আনতে পারে।" (বুলেটিন অফ এ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৪৪)। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর, সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপের বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন; সেখানে (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—অনুবাদক) এটা বিশেষভাবে পরিষ্কার যে, সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত ও আর্থনীতিক যে কাজগুলো করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তার ফল কি দাঁড়াবে সেটা ঠিকমতো মূল্যায়ন করা হল না। অথচ যেনতেন প্রকারেণ সর্বাপেক্ষা বেশি মুনাফা লোটবার প্রচেষ্টাতে প্রকৃতিকে জখম করা হল।

সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ককে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অনেক রকমের সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেবার কথা আলোচনা করে বিশেষজ্ঞরা যে ভাবনা ও ধারণা উপস্থিত করছেন তার বিশিষ্ট ও সাধারণ, দুটো দিকই আছে। উদাহরণ স্বরূপ, মানুষের সমাজ যে জীবমণ্ডলের অংশবিশেষ এবং মানুষের তৈরি প্রযুক্তি যে জীবমণ্ডলের বিকাশে একটা গুণগত প্রভাব বিস্তার করতে পারে—এই ধারণা থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানী এস. এস. কামশিলভ মনে করেন যে, মানুষের সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নুজেনেটিকস্, অর্থাৎ জৈবিক বিবর্তনের পেছনে শক্তি ও বুদ্ধির

প্রয়োগ করে দেখতে হবে। এই বিজ্ঞান (অর্থাৎ, নুজেনেটিকস্—অনুবাদক) জীবমণ্ডলের আজকের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে নিয়মাবলী তাকে খুঁটিয়ে অনুধাবন করে সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে যে ত্রুটি থাকতে পারে তাকে শুধরে দেবে এবং ভবিষ্যতের যুক্তিসম্মত সম্পর্ক (সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে—অনুবাদক) তৈরি করার পরিকল্পনা করবে।

যে সকল সারা দুনিয়াব্যাপী সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং যার সংগে যুক্ত রয়েছে আঞ্চলিক ও সারা গ্রহ জুড়ে প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাগুলোকে বিভিন্ন রাষ্ট্র কিভাবে বিকশিত ও ব্যবহার করবে এবং কয়েকটি আশু ফলপ্রদ অথচ শেষ অবধি ক্ষতিকারক প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্তকে বাতিল করার কাজ, এই সবের মধ্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানী পিটার কাপিজা জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার সমস্যাকে অংগীভূত করেছেন। তিনি বলছেন: "আজকের দিনে তিনটি প্রধান সমস্যা সারা দুনিয়াব্যাপী সর্বাপেক্ষা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে: (১) প্রযুক্তিগত আর্থনীতিক যার সংগে যুক্ত রয়েছে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদকে ক্ষয় করে ফেলা; (২) বাস্তব্য-সংক্রান্ত, যার সংগে যুক্ত রয়েছে দুনিয়াব্যাপী পরিমণ্ডলকে দূষিত করার সম্পর্কিত মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে জৈবিক ভারসাম্য; (৩) সামাজিক-রাজনৈতিক, কারণ এই সমস্যাকে সমাধান করতে হবে সমগ্র মানবসমাজকে হিসেবের মধ্যে ধরে।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমাজের সংগে প্রকৃতির সম্পর্কের সবটা কি ভাবে বদল করতে হবে সেটা বিবেচনা করলে জীবমণ্ডলের পরে তার প্রভাবের চেহারাটা, তার পরিধিটা এবং আশু ভবিষ্যতে সেই পরিবর্তনের প্রধান ঝোঁকটা কোন্ দিকে হবে সেটা বিচার করা বেশ চিত্তাকর্ষক।

প্রথমত, বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়েছে যেটা আর্থনীতিক কাজকর্মকে বিস্তার করুন ক্রমবর্ধমান অবস্থার সৃষ্টি করছে এবং যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে জীবমণ্ডলে, বিশেষ শিল্পসমৃদ্ধ ঘন জনবহুল বসতি এলাকাতে।

ইউনাইটেড নেশনসের হিসেবে ১৯৭৫ সালের শুরুতে দুনিয়ার জনসংখ্যা

দাঁড়িয়েছে ৪২৯ কোটি ১০ লক্ষে। আজকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি বজায় থাকে (গড়পড়তা প্রতি বছরে শতকরা দুই ভাগ), তাহলে ২০৭৫ সালে দুনিয়ার জনসংখ্যা ১৫০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। জন্ম মৃত্যু রোগ জনিত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের পরিসংখ্যান করাটা কাজেই আজকের দিনে একটা প্রধান সমস্যা যার সমাধানের ওপরে সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য সাধারণ একটা পলিসি ঠিক করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ হল ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বুকারেস্টে বিশ্ব জনসংখ্যার কনফারেন্সে, যাতে ১৪০-টার বেশি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। কনফারেন্সে জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার পরে দেখা গেল যে, জীব-মণ্ডলকে রক্ষা করার সমস্যাটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনের অন্যান্য সমস্যার ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রতিনিধিরা এই কনফারেন্সে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিপাদ্য উল্লেখ করে দেখান যে, জীবনের সামাজিক অবস্থাসমূহ নির্ভর করে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থানুসারে জন্ম, মৃত্যু, রোগ প্রভৃতি নিয়ে কি পরিসংখ্যান (ডেমোগ্রাফিক) দাঁড়ায়, যেটা আবার তাদের দিক থেকে নির্ধারিত হয় উৎপাদন শক্তিসমূহের বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্রের দ্বারা। সামাজিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মূল পরিবর্তন কি হচ্ছে এবং জীবন-ধারণের ও সাংস্কৃতিক মানের কি উন্নতি হচ্ছে তার ওপরে সঠিকভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তত্ত্ব (ডেমোগ্রাফিক) কতোখানি সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে সেটা নির্ধারিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রতিনিধিরা দেখিয়ে দেয় যে, জন্ম মৃত্যু রোগ থেকে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তত্ত্ব শেষ অবধি কি দাঁড়াবে সেটা নির্ভর করে সামাজিক-আর্থনীতিক উপাদানের ওপর, যেটা মোট

জনসংখ্যার ওপরে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিপাদ্য সাধারণ সমর্থন লাভ করে এবং কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়। বাইরে থেকে কোনো চাপ ব্যতিরেকে তার নিজের অবস্থা থেকে শুরু করে, ব্যাপক জনগণের সমর্থন নিয়ে ও মানবতার নীতিসমূহকে মেনে নিয়ে এবং মৌলিক মানবিক অধিকার ও সম্মানকে মর্যাদা দিয়ে গণতান্ত্রিক কায়দায় প্রতিটি রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্রভাবে তার জনসংখ্যার পলিসি নির্ধারণ করতে হবে।

জন্ম মৃত্যু রোগ জনিত জনতার পরিসংখ্যান তত্ত্ব ঠিক করার যে অভিজ্ঞতা ও তার জন্য যে পারস্পরিক সহযোগিতার দরকার কনফারেন্স তার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। পরিমণ্ডল সংক্রান্ত সমস্যার এবং বিশেষ করে বিপদজনক রোগের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য যে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হয় তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা হয়। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে দুনিয়া জুড়ে যে কার্যক্রমের পলিসি ঠিক করে কনফারেন্স, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল তথ্য সরবরাহ এবং রিসার্চকে বাড়িয়ে বিভিন্ন দেশগুলোকে তাদের জাতিগতভাবে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তত্ত্বকে সঠিকভাবে সমাধান করতে সাহায্য করা।

একই সময়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সম্পর্কে আর এক ধরনের মনোভাব, যাকে আধা-ম্যালথুসিয় বলে অভিহিত করা যায়, সেটাও এই কনফারেন্সে ভালো করেই দেখা যায়। এই ধরনের মনোভাবের সমর্থকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থার বাইরে দেখতে চান এবং তাঁদের মতে দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, সমস্ত মানুষের পক্ষে বিপদস্বরূপ, যাকে একমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণের মারফতই রোধা সম্ভব। তাদের বক্তৃতাতে এই ব্যাপারে ইদানীংকালে বুর্জোয়া লেখকদের যে সকল 'তাত্ত্বিক' যুক্তি বেরিয়েছে সেগুলোর তাঁরা পুনরাবৃত্তি করেছেন; সেটা হল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আর্থনীতিক পশ্চাদপদতার অবস্থা এতো ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে তার কারণ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির হার জনিত বিস্ফোরণ ("population explosion")। একই সময়ে তারা কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ ঘটনার কোনো

উল্লেখ করে না যে, অনেক উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনও সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া ধনপতিদের দ্বারা লুণ্ঠিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে মুনাফা তুলে নিয়ে গিয়ে ধনতান্ত্রিক জগতের জাতিগত ও বহুজাতিক করপোরেশন যে প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের সম্পত্তি নয়, তাকে ব্যবহার করে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং তারা ঔপনিবেশিকতাবাদ থেকে মুক্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার আর্থনীতিক বিকাশকে ব্যাহত করে।

আবহমণ্ডলকে দূষিত করা থেকে অত্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায়, পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতি কতো বেশি হচ্ছে এবং এটা মানুষের জীবন ও কার্যকলাপের জন্য বিশেষভাবে বিপদজনক। সারা দুনিয়া জুড়ে আবহমণ্ডল কতোখানি দূষিত হচ্ছে সে সম্পর্কে পুরো তথ্য উপস্থিত পাওয়া যায় না। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ষাট দশকের শেষের দিকে এবং সত্তর দশকের গোড়াতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের তুলনায় আবহমণ্ডল দূষিত হয়েছে পাঁচ থেকে সাত গুণ বেশি। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমির ওপরে আবহমণ্ডল দূষিত হয়েছে প্রতি বছরে ২০ কোটি টন।

নানা রকমের শিল্পায়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপ আবহমণ্ডলে গ্যাসীয় ও কঠিন পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এর অপরোক্ষ প্রভাবে অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ে মানুষের জীবনকে বিপদসংকুল করে তোলে, যার ফলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এক ধরনের ভাইরাসরা, ব্রনকাইটিস্ জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং আবহমণ্ডলে ক্ষুদ্র বীজাণুর বংশবৃদ্ধি হয় আর তাছাড়া চোখের রোগ এবং মাথাধরা তো আছেই।

আমাদের গ্রহের জলের সম্পদ, বিশেষ করে পানীয় জলের ঘাটতি একটা বিশেষ ভাবনার কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সারা পৃথিবীতে নদীতে পানীয় জলের পরিমাণ ১২০০ কিউবিক কিলোমিটার আর এটা প্রতি বছর ৩২ বার নতুন করে ভর্তি হয়। তাছাড়া মাটির নীচে জলের পরিমাণ (মোটামুটি

৬ কোটি কিউবিক কিলোমিটার) এবং পৃথিবীর সমুদ্রে নোনা জলের পরিমাণ ১৩৭ কোটি কিউবিক কিলোমিটারের চেয়ে বেশি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এটা যথেষ্ট। কিন্তু বিভিন্ন শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য প্রয়োজনে জল এতো বেশি এবং এমনভাবে খরচ হয় যাতে নদীর জলের গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায় এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকারও ক্ষতি হয়। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে প্রতি বছরে নদীতে ৪৪০ কিউবিক কিলোমিটারের মতো ময়লা ছাড়া হতো এবং তাতে এর ১৫ গুণ বেশি পানীয় জলকে দূষিত করতো, যার ফলে পৃথিবীর মোট পানীয় জলের পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

প্রতি বছরে মোট ৫০ কোটি টন পদার্থ নিষ্কাশিত হয় শিল্প, কৃষি এবং শহরের জঞ্জালরূপে। আর এর অনেকখানিই চলে যায় জলেতে। এর ফলে মাছ ও অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীরা নদীতে, হ্রদে ও সমুদ্রোপকূলবর্তী জলভাগে নষ্ট হয়ে যায় ; এইভাবে আমাদের সমগ্র গ্রহের প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই মানুষ জঙ্গলের প্রাণীকে নির্মূল করছে এবং এই প্রক্রিয়াটা বেড়েই চলেছে। ২০০০ বছরের কিছু কম সময়ে স্তন্যপায়ী বহু ধরনের প্রাণী, আর তাছাড়া পাখি ও অন্যান্য জন্তুরা তো বটেই, বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেখানে প্রথম ১৮০০ বছর ধরে ৩৩ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণীরা নষ্ট হয়েছে, সেখানে আরও ৩৩ রকমের নষ্ট হয়েছে পরের ১০০ বছরে এবং পরের অর্ধ-শতাব্দীতে আরও ৪০ রকমের। ইউনাইটেড নেশনসের বিশেষজ্ঞদের তথ্য অনুসারে ১৯৭৫ সালের শেষার্ধে গত ২০ শতাব্দী (২০০০ বছর) ধরে ১০৬ রকমের জন্তুরা এবং ১৩৯ রকমের পাখিরা বাস্তব্য ভারসাম্য[১৫] সম্পর্কে অবহেলা করার ফলে এবং অনেক সময়ে সভ্যতা-বহির্ভূত ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। আরও ৫০০ ধরনের প্রজাতিরা, যাদের প্রাকৃতিক

---

১৫. অর্থাৎ তাদের প্রকৃতির কাছ থেকে খাদ্যের যোগান ও অন্যান্য বাঁচবার ব্যবস্থা —অনুবাদক।

অবস্থাতে বহু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তন হয়েছিল, তারা নষ্ট হয়ে যাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। জীববিজ্ঞানীদের হিসেব অনুসারে প্রতি বছরই কোনো না কোনো ধরনের প্রাণীরা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এক সময়ে প্রচুর বাইসনের দংগল দেখা যেতো, আজ তারা প্রায় লুপ্ত। তেমনি উত্তর আমেরিকাতে এক ধরনের পাখি, বাহক পায়রা প্রচুর সংখ্যায় ছিল, আজ তাদের প্রায় পাওয়া যাবে না। নীল তিমি মাছরা প্রায় লুপ্ত। দুঃখজনক এই তালিকা আরও দেওয়া যায়।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কারবন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। এটা জানা আছে যে, প্রতি বছর আমাদের উদ্ভিদ-জগৎ ১৫,০০০ কোটি টন কারবন ডাই-অক্সাইডের সংগে ২,৫০০ কোটি টন হাইড্রোজেন মিলিয়ে ৪৫,০০০ কোটি টন জৈবিক বস্তু তৈরি করে এবং বায়ুমণ্ডলে ৪০,০০০ টন অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। সমাজ বিকাশের একেবারে প্রথম দিকে বায়ুমণ্ডলে কারবন ডাই-অকসাইড নিঃসৃত হতো একমাত্র প্রাণী ও মানুষদের কার্যকলাপের ফলে এবং গরম জলের প্রস্রবণ ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দ্বারা; আজকের দিনে[১৬] বায়ুমণ্ডলে কারবন ডাই-অক্সাইডের প্রায় সবটাই আসে সমাজের নানা রকমের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার ফলে : যেমন, নানা রকমের জ্বালানী পদার্থের ও প্রাকৃতিক সম্পদের দহনের জন্য প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে কম পক্ষে ১০০০,০০০,০০০ টন কারবন ডাই-অক্সাইড ছাড়া হয়। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুসারে প্রচুর পরিমাণের কারবন ডাই-অক্সাইডের (মোটামুটি ১০০০,০০০,০০০ টন) ক্রমাগত পৃথিবীর সমুদ্রের জলরাশির সংগে প্রতিক্রিয়া চলছে। ১৯৬০ সালের হিসেব থেকে ক্রমশই বেশ চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে

---

১৬. উদ্ভিদ-জগৎ সালোক-সংশ্লেষের ফলে যেমন কারবন্ ডাই-অক্সাইডকে গ্রহণ করে অক্সিজেনরূপে ফেরত দেয়, প্রাণী-জগৎ করে তার উল্টো। আর যে কোনো দহন বা আগুন জ্বালার প্রক্রিয়া থাকলেই বিস্তর অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়ে কারবন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়—অনুবাদক।

যে, আমাদের বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণের কারবন ডাই-অক্‌সাইড জমা হচ্ছে তাকে আমাদের জীবমণ্ডল সাফ করে দিতে পারছে না। ১৯৭৩ সালের আগের দশ বছরের হিসেবে মানুষের শিল্পগত ও অন্যান্য কার্যকলাপের ফলে প্রতি বছরে শতকরা ০·২ (১/৫) ভাগ কারবন ডাই-অক্‌সাইডের নেট পরিমাণ বেড়েই যাচ্ছে (অর্থাৎ কারবন ডাই-অক্‌সাইড ও অক্‌সিজেনের লেনদেন বাদ দিয়ে)। বিজ্ঞানীদের ভয় যে, এই হারে কারবন ডাই-অক্‌সাইডের পরিমাণ যদি বাড়তেই থাকে তাহলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

শিল্পের প্রয়োজনে নানা রকমের দাহ্য পদার্থের দহন চলছে, যেমন এ্যাটমীয় শক্তির শিল্প, পরিবহণ ইত্যাদি এবং তাতে আবহমণ্ডলের তাপশক্তির মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে—এদিকে অনেকগুলো দেশের বিশেষজ্ঞরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে মানুষের সমাজের নানারকমের ক্রিয়াকলাপ থেকে যে "বাড়তি" তাপমাত্রা তৈরি হয় তার পরিমাণ সূর্য থেকে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে পাওয়া তাপমাত্রার ১।১৫০০০ ভাগ।

কিন্তু "ভবিষ্যতের শক্তির সম্পদ" কি দাঁড়াবে তা নিয়ে যারা ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করে তাদের মতে কৃত্রিম উপায়ে যে তাপশক্তির পয়দা হচ্ছে—অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, আজকের হারে যতোটা শক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি করা হবে না—সেক্ষেত্রে আগামী ২৫০ বছরে সূর্য থেকে যে তাপশক্তি আমরা পাচ্ছি তার প্রায় সমান সমান আমরা পাবো এই কৃত্রিম উপায়ে। তাতে আমাদের গ্রহের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে ৫০° সেনটিগ্রেড এবং তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের গ্রহ মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী আর থাকবে না।

সাম্প্রতিক জীবমণ্ডল, আবহমণ্ডল ও আবহাওয়া পৃথিবীর চারধারে যে ওজন গ্যাসের স্তর[১৭] আছে, এই সকলের ওপরে মানুষের সামাজিক ক্রিয়া-

১৭. সমুদ্রতল থেকে উপরের আকাশে বা বায়ুমণ্ডলে যাত্রা করলে প্রায় ২০০।২৫০ মাইল অবধি বায়ু পাওয়া যাবে, যার পরে বায়ুশূন্য মহাকাশ। এই বায়ু মোটামুটি চারভাগ

কলাপের প্রভাব এমনভাবে পড়ছে যেটা বিপদের কথা এবং যার চরিত্র ও তার ফলাফল নিয়ে বহু পড়াশুনা হচ্ছে। এই সকল অনুসন্ধানের বিশেষ বিশেষ

নাইট্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন দিয়ে তৈরী। পৃথিবীর ভূমণ্ডলকে ত্রিমাত্রিকরূপে ভাবলে এই বায়ুমণ্ডল যেন একটি আবরণের মতো ভূমণ্ডলকে ঘিরে রয়েছে। আর দ্বিমাত্রিক রূপে ভাবলে আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর গায়ে বাস করে যে মানুষ ও প্রাণী, তার মাথার ওপরে একটা বায়ুসমুদ্র রয়েছে যার একেবারে তলদেশে আমরা বিচরণ করি।

আমাদের মাথার ওপরে ২০০।২৫০ মাইল গভীর বায়ুসমুদ্রের স্তরভাগ আছে। উপর থেকে দেখলে, ১২০ থেকে ৪০ মাইল সমগ্র অঞ্চল বা মণ্ডলটাকে আমরা বলি আয়নমণ্ডল। আয়ন হচ্ছে তড়িতাবিষ্ট গ্যাসের এ্যাটম। সূর্য-নিঃসৃত প্রচণ্ড তেজঃশক্তিবিশিষ্ট অতি-বেগুনী রশ্মির আঘাতে গ্যাসের এ্যাটমের কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে প্রোটনের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান এক বা একাধিক ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে যায়।

সাধারণত এ্যাটমের নিউক্লিয়াসে যতোগুলো প্রোটন থাকে তার চতুর্দিকে ঘূর্ণমান ততোগুলো ইলেকট্রন থাকে বলে সমগ্র এ্যাটম বা পরমাণুটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু সূর্যনিঃসৃত অতি-বেগুনী রশ্মির আঘাতে এক বা একাধিক ঋণাত্মক তড়িতাবিষ্ট ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হলে নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক প্রোটন তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়ে। আর কক্ষচ্যুত ঋণাত্মক ইলেকট্রন বেশীক্ষণ স্বাধীন অবস্থায় থাকে না, সে আবার প্রতিবেশী এ্যাটমে ঢুকে পড়ে তাকে তড়িতাবিষ্ট করে তোলে।

এই তড়িতাবিষ্ট গ্যাসের পরমাণুকে বলে আয়ন এবং এই প্রক্রিয়াকে বলে আয়নিতকরণ, আর সমগ্র মণ্ডলটিকে বলে আয়ন-মণ্ডল।

তাহলে কিন্তু সূর্যরশ্মি নিঃসৃত প্রচণ্ড তেজঃশক্তিবিশিষ্ট অতি-বেগুনী রশ্মির আঘাতে আয়ন-মণ্ডল সৃষ্টি হচ্ছে বলেই অতি-বেগুনী রশ্মি ভূপৃষ্ঠ অবধি নেমে আসতে পারছে না এবং তাতেই আমরা নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে হেসে-খেলে বাস করতে পারি।

কিন্তু ১২০ থেকে ৪০ মাইলের আয়নমণ্ডলেরও নীচে যে সামান্য অতি-বেগুনী রশ্মি নেমে আসে, সেটা ২১ থেকে ১২ মাইল অবধি ওজোন গ্যাসের স্তরে আটকে যায়। ওজোন হল অক্সিজেনের সঙ্গে আর একটি পরমাণু যোগ করে O_3।

তাহলে অতি-বেগুনী রশ্মির প্রচণ্ড প্রাণঘাতী আঘাতের বিরুদ্ধে ওজোন গ্যাস দিয়ে গঠিত। ওজোন-মণ্ডল হল আমাদের শেষ রক্ষীদুর্গ।

এখন এই ওজোন গ্যাসের স্তর বা মণ্ডল মানুষের নানারকমের ক্রিয়াকলাপে নষ্ট হয়ে যাবার ভয় দেখা দিয়েছে—অনুবাদক।

ফলাফল কি পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে না গিয়েও প্রথমেই এবং একেবারেই শুরুতেই যেটা স্বীকার করা দরকার সেটা হল যে, আজ এই সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের সভ্যতা আজ যে স্তরে পৌঁছেছে তারই বিকাশের যুক্তিসংগত ফল এটা। যতোই তাদের গভীরে অনুধাবন করা যাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো তখন জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার দিক থেকে সমস্যাটিকে বিচার করার চেষ্টা করবে এবং সমগ্র দুনিয়া জুড়ে একটা বাস্তব্য (ecological) ভারসাম্য স্থাপন করার চেষ্টা করবে। আর ভবিষ্যৎ অন্ধকার ধরে নিয়ে যে ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, যেগুলো একপেশে এবং অনেক সময়েই তাড়াহুড়ো করে ভাসা-ভাসা কোনো অনুসন্ধানের তথ্যে নির্ভর করতে হয়, তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হল—মানব সমাজের পরিকল্পনা ও যুক্তিসংগতভাবে যে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকে বদল করার কি সম্ভাবনা আছে, বিশেষ করে যখন বাস্তব্য সমস্যা তীব্র হয়ে উঠছে—সেটা এই সকল ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা হিসেবের মধ্যে ধরেন না।

বিশেষ করে লক্ষ্য করার যে, সমাজের প্রযুক্তির ও প্রকৃতির মধ্যে আদান প্রদান সম্পর্কে বুর্জোয়া লেখকরা দেখাবার চেষ্টা করছেন যে, সমসাময়িক কালে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যাটি যেন একটি "বাস্তব্য বিপ্লব" (ecological revolution) রূপে দেখা দিয়েছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত "দুনিয়ার তথ্য ও ঝোঁক, ২নং" বইয়ের লেখকদের মতে দুনিয়া জুড়ে মানব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, একটা "বাস্তব-সমস্যা সম্পর্কিত বিপ্লব"। লেখকরা এটাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন এই বলে "কয়েক শ' বছরে শিল্পগত-সামাজিক-ইলেকট্রোকেমিক্যাল ও ইলেকট্রনিক বিপ্লব হয়ে আজ নতুন মানুষের ও তার ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যার ফলে পৃথিবীর বাস্তব্য ভারসাম্যে আজ বড়ো করে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে (অর্থাৎ ভারসাম্য প্যাল্টে গিয়ে মানুষের জীবনধারণের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে)।

এইভাবে বুর্জোয়া পণ্ডিতরা (বা স্বলয়রা) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করতে চান, যাতে ইলেকট্রনিক্স, রসায়ন, মহাকাশ

বিজ্ঞান প্রভৃতি কোনো-না-কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে উন্নতি লক্ষ্য করা সম্ভব। আসলে কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব অনেক বেশি জটিল ব্যাপার এবং "বাস্তব্য-বিপ্লব" (ecological revolution) বলে আমরা আসল বস্তুর সবটাকে বোঝাতে পারি না, কেবলমাত্র সমাজের শিল্পায়নগত কার্যকলাপের ফলে একটা নতুন দিক যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাকেও বোঝায়।

সকল রাষ্ট্রগুলোকে "সারা দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত" বলে জোট পাকিয়ে বুর্জোয়া তাত্ত্বিক লেখকরা অনেক সময়ে জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার সমস্যাটাকে যেন একমাত্র প্রকৃতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংগে যুক্ত বলেই দেখাবার চেষ্টা করেন এবং সেটাকে আমাদের কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রক্রিয়াদি থেকে আলাদা করে রাখতে চান। একজন আমেরিকান লেখক লিখেছেন: "আজকের দিনে পলিসিকে ঠিক করতে গিয়ে আসল লক্ষ্য নয় যে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা নির্ধারণ করতে হবে যে প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত ক্রমাগত বিকাশ ও প্রযুক্তির আরও নিবিড়ভাবে ব্যবহার করার ফলে ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে তার কি প্রভাব পড়বে।"

অথবা আমেরিকার রাজনীতি ক্ষেত্রের বিজ্ঞানী জিগ্‌বিনিউ ব্রেজনিন্‌স্কি যে ভাবে বলেছেন: "মতাদর্শ নিয়ে মাথা ঘামানোটা শেষ অবধি বাস্তব্য সমস্যা নিয়েই একেবারে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায়। এর সূচনা দেখা যাচ্ছে জনসাধারণ যে ভাবে বায়ুর ও জলের দূষিতা, দুর্ভিক্ষ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, পারমাণবিক বিকীরণ নিয়ে এবং অসুখবিসুখ, ড্রাগ ও আবহাওয়া এবং একই সংগে ক্রমশই মহাকাশে পর্যটন ও সমুদ্রের জলের তলার সম্পদ আহরণের জন্য আগের চেয়ে যেন অনেক বেশি ব্যতিব্যস্ত।"

বাস্তব্য সমস্যা সম্পর্কে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের আজকের স্তরের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে লেখক যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে এই ধারণা হয় যে, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতাদর্শগত মতভেদ যেন আজ খানিকটা নরম ও কমনীয় করে ফেলা হচ্ছে এবং তার বদলে

উদ্ভূত হচ্ছে সারা ভূগোলক নিয়ে একটা টেকনিক্যাল (প্রযুক্তিবিদ্যাগত) চরিত্রের সমস্যা।

বাস্তব্য সমস্যা নিশ্চয়ই আজকের সমাজে ক্রমশই খুব বড়ো করে দেখা দিচ্ছে। তবে সেটা কোনো শূন্যগর্ভ অবস্থার মধ্যে উদ্ভূত হচ্ছে না; অথবা সেটা কেবলমাত্র মানুষের কার্যকলাপের "স্বাভাবিক মাত্রা"[১৮] দিয়েই আবদ্ধ থাকতে পারে না। এর কারণ আজকের সমাজজীবনের প্রধান প্রধান সামাজিক-আর্থনীতিক ও দার্শনিক দিকটা বাস্তব্য সমস্যার সংগে জড়িয়ে রয়েছে এবং তাতেই আমাদের আজকের জগতের সব সংঘর্ষের চেহারাটা তাতে পরিস্ফুট। এই সমস্যাগুলো ব্যক্তিমানুষের মানসিক জীবন ও মূল্যবোধের মধ্যে প্রতিফলিত তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামাজিক গ্রুপগুলোর চিন্তাধারাতে তাদের ছাপ ফেলে যায় এবং তারা শ্রেণী সংগ্রামের মর্মবস্তু ও কাঠামোকে নির্ধারিত করে।

জীবমণ্ডলকে অনুধাবন করা ও তাকে রক্ষা করার জন্য সমস্যাবলীর সমাধানের আসল পথ বের করতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে, যে পথ কেবলমাত্র প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে বিচার শুধু করে না, পরন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর ও সামাজিক উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে স্বার্থের সংঘর্ষ রয়েছে তাকেও বিচারের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসে।

সমগ্র ও প্রকৃতির মধ্যে সুসংগত ভারসাম্য রক্ষা করার কাজটা অনেক বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক নেতারা মনে করেন একই সংগে উচ্চতর সামাজিক কাঠামো নির্ধারণের কাজ: যেটা হল সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ স্থাপনের কাজ।

---

১৮. অর্থাৎ, কেবলমাত্র মানুষের কোনটা কাজে লাগবে কি না লাগবে তাই দিয়েই মাত্র—ইংরেজিতে বলা হয়েছে "natural dimension"—অনুবাদক।

২য় পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্র ঃ জনসাধারণের সুবিধার্থে প্রাকৃতিক সম্পদ

ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক মানুষই যাঁরা সাধারণভাবে রাজনৈতিক খবরাখবর একটু কম রাখেন, তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জীবনযাত্রা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। সমাজতান্ত্রিক সমাজের জীবনযাত্রার কোনো একটা দিক নিয়ে তাদের জানার ইচ্ছা থাকায় তারা সাধারণভাবে সভ্য গণমানুষের উপযোগী প্রচার সাহিত্যটুকু মাত্র দেখে থাকেন অথবা বিজ্ঞানীদের ও অন্য বিশেষজ্ঞদের লেখা পত্র পড়ে থাকেন, যাতে তারা তাদের নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কোনো না কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন চিত্র দিতে হয় এবং যে ভুল ত্রুটিগুলো আছে তাকে না ঢেকে রাখার চেষ্টা করে সমাজতন্ত্রের ভালো দিকটার ছবি তুলে ধরে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য ও যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, এই কথাগুলো সে সম্পর্কে প্রযোজ্য।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক খানিকটা সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার জন্য ও তারা পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছে সেটা অনুধাবন করার বেশ সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপে নিরাপত্তার ও সহযোগিতার কনফারেন্স করার পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতিসাধনের জন্য আরও ভালো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পরিক খবরাখবর আদান প্রদানের জন্য এবং

পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে সহযোগিতার কাঠামোর ও পদ্ধতির কি ভাবে আরও উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে জোরালো ভাবে নতুন নতুন ব্যবস্থা চালু করছে। ইউরোপীয় নিরাপত্তার ও সহযোগিতার জন্য সোভিয়েতের কমিটি, সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমি এবং অন্যান্য সংগঠনগুলো ও বিভিন্ন পাবলিক (জনগণের) চক্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে নানা রকমের আলোচনা সভা, কনফারেন্স ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে। যেমন ১৯৭৫ সালে "পরিমণ্ডল সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যাবলী এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ" নিয়ে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত ও বেশ প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের আলোচনা-সভা মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল; এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক, হাঙ্গেরি, পোলাণ্ড, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, ফিনল্যাণ্ড ও মেক্সিকো প্রতিনিধিরা এসেছিলেন।

পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যবস্থা সহ অন্যান্য অনেকগুলো ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে যে বিশেষ ইতিবাচক ফল লাভ হতে পারে সেটা যেমন লক্ষ্য করতে হবে, তেমনি কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা (পলিটিশিয়ানরা) যে ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ঘটনাবলী বিকৃত করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দোষারোপ করতে চান, সেটাও অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। এরই এ[illegible] উদাহরণ হল: মার্সাল ই, গোল্ডম্যানের লেখা বই, "প্রগতির উচ্ছিষ্ট, সোভিয়েত ইউনিয়নে দূষিত পরিমণ্ডল। (The Spoils of Progress: Environmental pollution in this Soviet Union by Marshall I Goldman.)। সোভিয়েত 'বিশেষজ্ঞ,' যিনি আবার অর্থনীতিশাস্ত্রে 'বিশেষজ্ঞ' হয়ে উঠেছেন, তিনি সাম্প্রতিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিমণ্ডল সমস্যা নিয়ে অনেকগুলো বিশেষজ্ঞের মতো প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলো লোমহর্ষক 'ভেতরের-কথা ফাঁস' করে দেওয়ার চরিত্র নিয়েছে। এই ধরনের কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি হল এই বইটি।

এটা বলা বাহুল্য মাত্র যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকেও পরিমণ্ডল রক্ষা করার সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় কারণ আজকের দিনে পরিমণ্ডলের ওপরে খানিকটা প্রতিকূল প্রভাবের অবস্থা বিবেচনা না করে উৎপাদনের কথা ভাবাই যায় না। আজকের দিনে বাস্তব ঘটনা হল যে, যে বিনা ব্যতিক্রমে শিল্পে-অগ্রসর ও বিকশিত প্রতিটি দেশকেই পরিমণ্ডলের সমস্যার প্রতি অধিকতর নজর দিতে হচ্ছে। নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিয়নও এই সকল সমস্যা সম্পর্কে তার ভাবনা-চিন্তা লুকিয়ে রাখে না। তার প্রেসে ও পত্রপত্রিকার স্তম্ভে পরিমণ্ডল রক্ষার পরিকল্পনার ও সাফল্যের এবং এই ক্ষেত্রে বেশ অনেক রকমের যা কিছু মুশকিল দেখা দেয়, এসব সম্পর্কে যথেষ্ট জায়গা দেওয়া হয়। মার্শাল গোল্ডম্যান তাঁর বইয়েতে এটার সুযোগ নিয়েছেন স্পষ্টই অশোভন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

পরিমণ্ডল রক্ষার অসন্তোষজনক ব্যবস্থা হওয়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের দারুণ ভাবনা-চিন্তা আছে এবং সেজন্যই তুলনা করা যেতে পারে এরকম তথ্যের খোঁজ পড়ে। গোল্ডম্যানের নিজের দেশের লোকেদের সামনে যে গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছে তা থেকে নজর সরিয়ে আনার প্রচেষ্টাতেই গোল্ডমান সোভিয়েত ইউনিয়নে কি ঘটছে এ সম্পর্কে তথ্যাদিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যেটা নিশ্চয়ই অভিসন্ধিমূলক ও একপেশে। লেখক তাঁর পাঠকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রিক নেতারা (স্টেটস্ম্যানরা) একমাত্র "ধনতন্ত্রের উত্তরাধিকার" হিসেবেই যেন পরিমণ্ডলকে নষ্ট হওয়ার ব্যাপারটা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সোভিয়েত প্রেসে প্রকাশিত ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের বিবৃতিগুলো পড়লেই যে কোনো বিদেশের অনুসন্ধানকারীই নিশ্চিত হতে পারেন যে, এই ধরনের মত প্রকাশ করাটা কতো খানি বিচারহীনতার পরিচয়।

মার্কস্, এঙ্গেলস ও লেনিনের লেখাতে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে যা লেখা আছে তার একটা ভাসা-ভাসা সমালোচনা গোল্ডম্যানের বইয়ের

প্রথম পরিচ্ছেদে দেওয়া আছে। গোল্ডম্যান বলতে চান যে, এঁদের লেখাতে পরিমণ্ডল-সমস্যার আলোচনা যথেষ্ট গভীর নয়। যেমন রাশিয়ার মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে রক্ষা না করে কেবলমাত্র তাদের ব্যবহার করে আর্থ-নীতিক লক্ষে পৌঁছবার ঝোঁকটা সঠিক কিনা তার প্রশ্ন করেছেন (তাই নাকি! —sic!)! একটা রাষ্ট্রের পক্ষে তার নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা ছাড়া সেটা যদি পাওয়া সম্ভব হয়, আর্থনীতিক বিকাশের জন্য যথার্থ আর কি পথ অবলম্বন করা যেতে পারে সেটা জানতে উৎসুক হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে ও শিল্পায়নের কার্যকলাপের ফলে যে ক্ষতি হতে পারে তাকে কি করে এড়াতে হবে,—এর যাবতীয় সমস্যা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যতোগুলো আইন পাস হয়েছে তার সবগুলোকে সাধারণ-ভাবে দেখে কয়েকটি বিশেষ পরিশিষ্টে তাদের তালিকা খুঁটিয়ে এবং গুছিয়ে দিয়ে টিপ্পনী কাটা হয়েছে এমনভাবে যাতে পাঠকের মনে হতে পারে যে, এই আইনগুলোর কোনো প্রভাবই পড়ে নি এবং তাদের ক্রমাগত অমান্য করা হয়েছে। সোভিয়েত প্রেস থেকে মাঝে মাঝে এই আইনগুলো লঙ্ঘিত হবার খবর তুলে দিয়ে বলা হচ্ছে,—এটাই (অর্থাৎ, এই আইনের লঙ্ঘনই) নিয়ম।

সোভিয়েত প্রেসে প্রকাশিত যে সকল রিপোর্টে জটিল কোনো পরিস্থিতির বর্ণনা করে দেখানো হচ্ছে যে, কেবলমাত্র আইনগত ব্যবস্থার দ্বারাই তার সমাধান করা যায় না এবং বিশেষ ধরনের গভর্নমেন্টের অরডিনান্সের দরকার পড়ে, গোল্ডম্যানের সেগুলো খুঁজে বের করার জন্য বিশেষ ঝোঁক। বড়ো বড়ো নদীগুলোর, সমুদ্রের, এবং লেকগুলোর (হ্রদগুলো) অবস্থা কি দাঁড়াবে এটা নিশ্চয়ই সোভিয়েতের সকল মানুষেরই ভাবনা এবং সোভিয়েত প্রেসে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলে। কিন্তু আসল ঘটনাটা কি সে সম্পর্কে যেমন গোল্ড-ম্যানের কোনোই উৎসুক্য নাই তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নে এ ব্যাপারে আজ যা ঘটেছে তার আসল মর্মবস্তুকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন

নি। যে ভুলগুলো হয় সেগুলো কি করে শুধরে নেওয়া হয় এবং প্রধান সমস্যার সমাধান জাতীয় ভিত্তিতে করার জন্য কি পন্থা নেওয়া হচ্ছে—এ সবই দেখতে তিনি অস্বীকার করেন। তাঁর মতে পরিমণ্ডলের অবস্থা দিনকে দিন 'মন্দ' থেকে আরও বেশি মন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তাঁর বইয়ের একটা পরিচ্ছেদে তিনি সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিগত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা এমনভাবে করেছেন যাতে তাঁর এই মিথ্যা যুক্তির— "উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়াটা পরিমণ্ডলের ক্ষতি না হওয়ার কোনো গ্যারাণ্টি নয়"—সমর্থন হয়। এর চেয়েও বড়ো কথা, সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিমণ্ডলের দূষীকরণের বিভিন্ন দিকগুলোর বাস্তব তথ্যাদির যে "বিশ্লেষণ"—তার জল, বায়ু, ভূমিসম্পদ ও কাঁচা মালের যোগান—এবং লেক বইকালের, কৃষ্ণ সাগরের উপকূলের, লেক বালখাসের ও কিস্লোভড্স্ক এলাকার অবস্থাদির যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাতে মনে হয়, সেটা প্রতিকূল এবং দিনকে দিন আরও অবনতি হচ্ছে। বৃথাই পাঠকরা সোভিয়েতের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির অগ্রগমনের খোঁজ করবেন এই বইয়ের পাতাতে, আবহ-মণ্ডলের দূষিতকরণকে যন্ত্রের সাহায্যে হিসেবের পরে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিয়েভে ও লেনিনগ্রাদে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বসানো হয়েছে (air monitoring system), কুজনেটস্কে ধাতুশিল্প সংক্রান্ত যতোকিছু উৎপাদনের জটু থেকে কয়লা-আলকাতরার রাসায়নিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ফেলে-দেওয়া জিনিসকে আবার পরিশুদ্ধ করে নেওয়া যায় (এক্ষেত্রে বীজাণুরা এই 'পরিশুদ্ধ' করার কাজটা করে) মোটরগাড়ির নির্গত বিষাক্ত গ্যাসকে আরও কম বিষাক্ত করার জন্য এবং আরও অনেক অনেক ব্যাপার রয়েছে। এদের সম্পর্কে সোভিয়েতের প্রেসে অনেক রিপোর্ট বেরোয়, যা গোল্ডম্যানের মোটেই নজরে পড়ে না, কারণ তাহলে যে কৃত্রিম ধারণা তিনি গড়ে তুলছেন তা খণ্ডিত হয়ে যাবে। গোল্ডম্যান কাজেই শুধু ধনতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করার জন্যই লিখছেন না, তাঁর লেখার বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-

ব্যবস্থাতে পরিমণ্ডলের যে বিশেষ "বিপদ" দেখা দেবে সে সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা।

তাঁর বইটা বইয়ের দোকানগুলোতে বিক্রির জন্য শেলফে রাখা শুরু হল এবং ঠিক যখন সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্ক উন্নতির দিকে যাচ্ছে তখনই বইটার বিজ্ঞপ্তি প্রথম প্রেসে প্রকাশিত হল।

যে, ১৯৭২ সালের শীর্ষ বৈঠকে অন্যতম প্রধান যে দলিলে সম্মতিসূচক সাক্ষর দেওয়া হল পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন অফ সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের সংগে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা। এই দলিলে উভয় পক্ষই মেনে নিল যে, সমতা, পারস্পরিক আদান প্রদান ও মংগল সাধন করার উদ্দেশ্যে তারা সহযোগিতা করবে। যুক্ত কার্যক্রম কি হবে সেটা নির্দিষ্ট হল। জাতীয় স্তরে কয়েকটি ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া, যেটার পরিধি ও চরিত্র নিশ্চয়ই পরস্পরের থেকে ভিন্ন হবে, উভয় পক্ষই রাজি হল যে, সামগ্রিকভাবে পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য সমস্যাগুলো কি কি সেটা খুঁজে বের করে তার সমাধান করার চেষ্টা করবে।

ভিন্ন সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন দুটি রাষ্ট্রের পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টাকে একত্র করে দেখে তার সমাধানের চেষ্টা সামগ্রিকভাবে করাটা বহু দেশের জনগণ ভালো চক্ষে দেখলো। সবাই বিশেষ করে লক্ষ করলো যে, এই সহযোগিতা দুই দেশের এবং সকল মানুষের স্বার্থেই নিয়োজিত হয়েছে।

গোল্ডম্যান কিন্তু সোভিয়েত আমেরিকান সম্পর্কের উন্নতি স্থাপনে কিংবা পরিমণ্ডল রক্ষা করার সমস্যার উন্নতিসাধনের সর্বাপেক্ষা ভালো ব্যবস্থা কি হতে পারে, কোনোটার জন্যই ব্যস্ত নন। তাঁর পড়াশুনা ও জনসাধারণের জন্য পাবলিক কাজকর্ম, সবটাই তিনি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সেই সকল চক্রের আদেশে করে যাচ্ছেন, যারা আমেরিকান ও সোভিয়েতের মধ্যে স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের বিরোধী।

বিনা কারণে গোল্ডম্যানের বইটা নিয়ে এতো আলোচনা হচ্ছে না। এই ধরনের লেখকরাই পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাফল্যকে বিকৃত করে দেখাতে চায়। আসলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর এ ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবি করতে পারে এবং তা থেকে পরিমণ্ডল রক্ষা করার ও ক্ষয়ে-যাওয়া কয়েক ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে নতুন করে ফেরৎ পাবার ব্যবস্থা যা করা হয়েছে সে সম্পর্কে আশাবাদী মনোভাব নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার একটা দারুণ সুবিধা আছে : উৎপাদনের উপকরণের একেবারে গোড়ার জিনিসগুলোকে ব্যবহার করা হয় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় সমগ্র শিল্পের স্বার্থে একটা পুরো এলাকার আর্থনীতিক স্বার্থের জন্য এবং সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য যে সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা থেকে দেখতে পাওয়া যায় ধনতন্ত্রের তুলনায় সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে সমাজতন্ত্র কতো বেশি উন্নত—ধনতন্ত্রে সম্প্রতি আর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ উত্তরোত্তর আর্থনীতিক সংঘাত প্রায়শই ঘটাচ্ছে আর তার বোঝা বইতে হচ্ছে খেটে-খাওয়া মানুষকে।

অনেক দেশেরেই পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে সোভিয়েত যেভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ঔৎসুক্য আছে; তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে এই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ভাবে কাজ হয় সেটা খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখে; সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারটা অন্যতম একটা জাতীয় সমস্যার রূপ নিয়েছে, যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষই এ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। উন্নত এবং উন্নয়নশীল ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর অনেক বিশেষজ্ঞরাই পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কি কি করা হচ্ছে সেটা অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশগুলোর সম্পর্কে বলা যায়, তাদের কাছে আর্থনীতিক

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রোগ্রামের জন্য প্রকৃতিকে রক্ষা করার ও তাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর ব্যাপারটা একটা অপরিহার্য অংগ।

মার্কস, এংগেলস ও লেনিনের লেখা বইগুলোর, প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীদের দার্শনিক দিক থেকে লেখাগুলো এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে গত ৬০ বছরে অগ্রসর উন্নত সমাজতান্ত্রিক বাস্তব অবস্থা ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি স্থাপন করার জন্য যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে—এই সবের নিশ্চিত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আজকের সোভিয়েতের পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সদ্যগঠিত সোভিয়েত রিপাবলিকের প্রথম দিনগুলোতে লেনিন প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও আদানপ্রদানের যে মূল নিয়মগুলোর প্রয়োজন সেগুলোকে খুঁজে বার করার ও প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছিলেন: "আমাদের তৈল সম্পদ রক্ষা করতে হলে আমাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নিয়মগুলো মানতে হবে।" (কালেক্টেড্ ওয়ার্কস, ভ্যলুম ৩২, পৃষ্ঠা ৩০৭)।

পরিমণ্ডল রক্ষার প্রশ্নটা লেনিন তিন ভাবে দেখেছিলেন। প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করার জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত নিয়মকানুন মানতে হবে, তাদের ব্যাপক আকারে ও সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং ধনসম্পদকে নষ্ট করা কিছুতেই চলবে না। সমস্যার সমাধান এইভাবে করতে হবে এই দৃষ্টিভংগীর সংগে দিমিত্রি মেনডেলিয়েভ, ভ্যাসিলি দুকাচিয়েভ, ক্লিমেণ্ট তিমিরাজিয়েভ, ভ্লাদিমির ভার্নাডস্কি ও নিকোলাই ভ্যাভিলভ এর মতো বৈজ্ঞানিকরা যে মানবিক দার্শনিক দৃষ্টিভংগী থেকে প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করে তাকে বৈজ্ঞানিক সম্মতভাবে বদল করতে হবে এই দৃষ্টি-ভংগীর মিল আছে।

এই নীতিগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট অবিচল-ভাবে পালন করার চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকটি সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থার একটা পুরো পদ্ধতি খাড়া করেছে,—এই পদ্ধতির প্রথম কয়েকটি লেনিনের জীবদ্দশাতে তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশেই করা হয়েছিল। জমির সম্পদকে যুক্তিসংগত-

ভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং জমির চাষকে আধুনিক পর্যায়ে আনার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে সোভিয়েত গভর্নমেণ্টের প্রথম দিকের 'জমি সম্পর্কে' (২৬-শে অক্টোবর, ১৯১৭) এবং 'জমির সামাজিকীকরণ' (২৭-শে জানুয়ারি, ১৯১৮) সংক্রান্ত ডিক্রিগুলোতে। ঠিক একই ধরনের কাজ করার কথা বলা হয়েছে "বনসম্পদ" (২৭-শে মে, ১৯১৮) এবং "খনিজ সম্পদ" (৩০-শে এপ্রিল, ১৯২০) সম্পর্কে ডিক্রিগুলোতে।

লেনিনের স্বাক্ষরিত "জমি" সংক্রান্ত ডিক্রিতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান করা হয়েছে এবং সেগুলো জনসাধারণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। লেনিনের স্বাক্ষরিত "রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেল রিপাবলিক-এর বনসম্পদ সম্পর্কে মূল আইন," যাতে বনসম্পদকে কাজে লাগানো এবং রক্ষা করার নিয়মগুলো ঠিক করা হয়েছিল, সেগুলো এখনও বলবৎ আছে। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে ও তার যুক্তিসম্মত ব্যবহারের বিভিন্ন দিকগুলো অন্য যে দলিলগুলোতে লেনিন স্বাক্ষর করেছিলেন, তা হল—দেশের সংরক্ষিত সম্পদকে বাঁচাতে হবে, শহরের জন্য ব্যবহার্য জিনিস-গুলোকে আরও উন্নত করতে হবে, শ্রম বা শ্রম-ব্যবস্থাকে রক্ষা করার[১৯] ও জন-স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন করতে হবে।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মতভাবে যাতে ব্যবহার করা হয় সেটা চালু করার জন্য "বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কাজকর্ম" (এপ্রিল, ১৯১৮) সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাবে দেওয়া হল; এতে লেনিন দেশের বৈজ্ঞানিক ও এন্‌জিনিয়ারদের শিল্পকে পুনর্গঠন করার একটা পরিকল্পনা এবং রাশিয়াকে বৈদ্যুতিকরণ করে আর্থনীতিক দিক থেকে উন্নত করার এবং রিপাবলিকের উৎপাদিকা শক্তিগুলোর ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের ব্যবহার করার প্ল্যান দিলেন।

---

১৯. যেমন কাজ করতে করতে দুর্ঘটনা ঘটলে বা স্বাস্থ্য নষ্ট হবার ভয় থাকলে তার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা—অনুবাদক।

লেনিনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও নির্দেশে যে 'গোয়েলরো' পরিকল্পনা (রাশিয়াকে বৈদ্যুতিকরণ করার জন্য রাষ্ট্রিক প্ল্যান) করা হয়েছিল তাতে কেবলমাত্র আর্থনীতিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনাই শুধু ছিল না, পরন্তু প্রকৃতি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সমাজের যুক্তিসম্মত মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন : জলসম্পদকে সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেচের জন্য জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র (বা স্টেশন) তৈরি করতে হবে, দেশের যে সকল অঞ্চলে উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত প্রণালীতে করা হচ্ছে না (প্রধানত শক্তির অভাবে—অনুবাদক) সেখানে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন (ভোলটেজ্) বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চালনা করার ব্যবস্থা করতে হবে, উৎপাদন শক্তির বণ্টন সমভাবে করতে হবে এবং অন্যান্য প্রায়োগিক বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে।

সোভিয়েত রাষ্ট্র লেনিনের মতাদর্শগত উত্তরাধিকারকে সৃষ্টিশীলভাবে কাজে লাগানোর জন্য কোনো না কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মত ব্যবহার করার জন্য সর্বাপেক্ষা ভালো কি পদ্ধতি হতে পারে সেটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছে এবং পরিমণ্ডলকে রক্ষা করতে চেষ্টিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পিপলস্ কমিসারের কাউন্সিল-এর সিদ্ধান্তগুলো থেকে প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করার তাগিদের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলো হল : "বনসম্পদকে সংগঠিত করা" (৩১-শে জুলাই, ১৯৩১), মাছের চাষ ও মৎস্য-সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থাদি (২৫-শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫), "জাতীয় ভূতাত্ত্বিক সম্পদ" (২৭-শে মার্চ, ১৯৩৭) এবং ১৯৪১-৪৫-এর মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের পূর্বে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠনের কার্যকলাপ দেখলে বোঝা যায় যে, প্রকৃতির রাজত্বকে কোনো অগ্রসর প্রযুক্তিরবিদ্যার নাম করে (যার দ্বারা সব সমস্যার সমাধান হতে পারে, এই অজুহাতে) এমন কোনো কাজ করা হবে না যাতে সেটা নষ্ট হয়ে যায়, আবার ঠিক তেমনি প্রকৃতিকে অক্ষত

রাখতে হবে, কোন রকম মানুষের হস্তক্ষেপ তাতে পড়বে না, যেটা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যুক্তিসম্মত, যেটাও সমানই নিন্দনীয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ঠিক যে বিশিষ্ট বাস্তব ও প্রযুক্তিগত অবস্থার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র নির্মিত হয়েছিল এবং সেই সময়ে যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল, সেটা আর্থনীতিক বিকাশের জন্য হাতে-কলমে যে সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো তাকে প্রভাবিত করতো। গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের (১৯১৮-২১) ফলে যে ক্ষতিজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেটাকে সমাধান করার জটিল কাজ সামনে দেখা দিয়েছিল, এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে ফেলার[২০] অবস্থাতে কৃষিকাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আখেরে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে জোরদার করা এবং সামরিক প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলা —এই সকল কাজের জন্য সোভিয়েতের আর্থনীতিক ও বৈজ্ঞানিক পলিসির মধ্যে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এটা ঠিক করার ব্যবস্থা করতে হতো। এই সকল কারণেই পরিমণ্ডল রক্ষা করার এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে দেশের স্বার্থে ব্যবহার করার দিকটা অনেক সময়ে সাময়িকভাবে কম জোর পড়েছে। আর ১৯৪১-৪৫-এর মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের পরে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আর্থনীতিক ক্ষতিকে সারিয়ে নেওয়ার জন্যও যে মুশকিল দেখা দিয়েছিল তার গুরুত্বও কম ছিল না।

এখন যখন সারা দেশে দ্রুত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ভিত্তিতে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠছে তখন প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার ও যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করার সমস্যাটা আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব নিয়ে

---

২০. ১৯৩৯ সালের পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পৃথিবীতে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল তখন তাকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলো ঘিরে ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু কিছু ক্ষতি করার চেষ্টা করতো। এই অবস্থাকে বলা হতো Capitalist encirclement—অনুবাদক।

দেখা দিচ্ছে। ২৩-শ ও ২৪-শ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রীয় স্তরে পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা ও প্রকৃতির মধ্যে যুক্তিসম্মত ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা পূর্বাপেক্ষা আরও জোর দিয়ে বলা হচ্ছে। পার্টি কংগ্রেসের এই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত ছিল জমির ব্যাপকভাবে উন্নতি সাধন করা যাতে প্রচুর ফসল পাওয়া যেতে পারে, বায়ু ও জল থেকে জমির ক্ষতি হওয়া বন্ধ করা যেতে পারে, ক্যাসপিয়ান সাগরে[২১] দূষিত পদার্থ ফেলে জলকে বিষাক্ত করা বন্ধ এবং বাইকাল হ্রদের প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মতভাবে রক্ষা করা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরের দিকের জলরাশির (inlandwaters) মাছের ফলনকে বাঁচানো এবং ভল্গা ও উরাল নদীদের দূষিতকরণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে।

এই তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায়, যেমন জাতীয় আর্থনীতিক ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্ল্যান করার পদ্ধতিগুলো উন্নত হচ্ছে এবং আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অভিজ্ঞতা জড়ো হচ্ছে, তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে ও তাদের যুক্তিসম্মতভাবে প্রয়োগ করার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা একটা ব্যাপক ও মৌলিক চরিত্র ধারণ করে।

"সমাজতন্ত্রের পঞ্চাশ বছরের সাফল্য" সম্পর্কিত রিপোর্টে লিওনিদ ব্রেজনেভ দেখিয়েছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতির ফলে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির চিরন্তন সম্পর্কের ব্যাপারটা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেছেন, "নতুন সমাজ গঠন করে আমরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পূর্বতন পুরুষেরা যা কেবলমাত্র যেন স্বপ্নে দেখেছিলেন আমরা তার অনেকগুলোকে কাজে পরিণত করতে পেরেছি। কিন্তু বাস্তব জীবনের

---

২১. ক্যাসপিয়ান 'সাগর' বললেও আসলে এর চতুর্দিক জমি দিয়ে ঘেরা বলে একে ভৌগোলিক দিক থেকে হ্রদ, তবে বিরাট হ্রদ বলা যেতে পারে, ফলে এর জল দূষিতও হয় অতি সহজেই—অনুবাদক

বনসম্পদের আকর রূপে এবং স্বাস্থ্য, সুখ, জীবনস্পৃহা ও মানুষের আত্মিক সম্পদের সূত্র হিসেবে প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে কিছুমাত্র কমে নি।"২২

সোভিয়েত রাষ্ট্রের পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি সময়ের কার্যফলের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এটা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ যে, মানুষের সংগে প্রকৃতির সম্পর্কের ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভালো ব্যবস্থাপনা, প্রকৃতির সম্পদকে বে-হিসেবী খরচ না করা, জমির, বনসম্পদের, নদীগুলোর এবং নির্মল বায়ুর ব্যবস্থা করার জন্য সোভিয়েতের নারী পুরুষরা সাম্যবাদী সমাজ গঠন করতে গিয়েই চেষ্টিত এবং এর জন্য আজকের ও ভবিষ্যৎ পুরুষের জন্য জমিকে রক্ষা করতে ও সুন্দর করতে তারা সব কিছু করতে প্রস্তুত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ শ কংগ্রেস যখন সমাজতন্ত্রের সুবিধাগুলোর সংগে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতিকে মিলিয়ে দেখার পুরো সম্ভাবনার গুরুত্বকে সামনে রাখে, তখন তারা সোভিয়েতের নাগরিকদের কাছে প্রকৃতির যত্ন নেবার মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা করে। "আমাদের যেমন-যেমন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতিকে দ্রুত আগু বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নোবো," পার্টি কংগ্রেসে ব্রেজনেভ বলেছিলেন, "তেমনি আমাদের দেখতে হবে, যাতে প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তি-সম্মতভাবে ব্যবহার করার সংগে সেটা যুক্ত হতে পারে এবং বায়ু ও জলকে দূষিত করে কিংবা জমির উর্বরতাকে নষ্ট করে সেটা যেন বিপদের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ সালে মস্কোতে সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনে সারা দেশ জুড়ে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হল। উক্ত সেসনে রিপোর্ট করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীমণ্ডলীর

---

২২. লেনিনের প্রদর্শিত পথে বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি ; লেখক : লিওনিদ ব্রেজনেভ, মস্কো, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৩৫। (ইংরেজি বইয়ের উল্লেখ দেওয়া হল)

(কাউন্সিল অফ্ মিনিস্টারস্) ডেপুটি চেয়ারম্যান বলেছেন যে, সমগ্র জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠু ও যুক্তিসম্মত ব্যবহার এবং তার রক্ষার জন্য যথাযোগ্য আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করছে। দুনিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম দেশ যে, বায়ুমণ্ডলে দূষিত পদার্থ কতো বেশি জমতে দেওয়া যেতে পারে সেটা ঠিক করে দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিশোধনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি (তার জন্য প্লান্ট ইত্যাদি) না নেওয়া হলে কোনো নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হয় না।

সুপ্রীম সোভিয়েতের চতুর্থ অধিবেশন প্রকৃতির রক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের আলোচনা করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন ইতিমধ্যেই পাস করেছে যাতে প্রধান এই সমস্যার কয়েকটা দিক আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে "সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলিতে জমির আইনের মূল বিষয়গুলো" (১৯৬৮), "স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলোর আইনের মূল বিষয়গুলো (১৯৬৯) এবং "সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলোর জল-সংক্রান্ত আইনের মূল বিষয়গুলো" (১৯৭০)।

জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীমণ্ডলী (কাউন্সিল অফ মিনিস্টারস্) সুপ্রীম সোভিয়েতের চতুর্থ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিমণ্ডল রক্ষার ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে আরও উন্নত করার জন্য উক্ত অধিবেশনে আলোচনার প্রস্তাবগুলোকে হিসেবের মধ্যে নিয়ে বেশ খুঁটিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রগুলোকে প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য আরও নজর দিতে, প্রাকৃতিক সম্পদকে যাতে যুক্তিসম্মত ভাবে ব্যবহার করা হয় সেটার নিশ্চয়তা স্থির করতে, জমির ক্ষয়কে রোধ করার নিয়মিতভাবে প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা, জল, বন, খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে ঠিকমত ব্যবহার

করা, পতিত জমিকে পুনর্বার চাষযোগ্য করার জন্য ব্যবস্থা করা, জমিকে নোনা ধরা বন্ধ করা, বনের জলসম্পদকে ও বৃক্ষরাজিকে রক্ষার ব্যবস্থা করা, পিটের খনিতে জল-নিয়ন্ত্রণ করা, জন্তুদের ও উদ্ভিদদের প্রজনন ব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে এবং বায়ুমণ্ডল যাতে দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা করতে বলে। এ ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃতিকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করার ও তাকে রক্ষা করার জন্য ঠিক ঠিক খবর সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টির ২৪-শ কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে প্রকৃতি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে কি সম্পর্ক স্থাপিত হবে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করার জন্য তিনটি মৌলিকনীতি গ্রহণ করা হয়েছে :

আজকের দিনে প্রকৃতিকে রক্ষা করা একটা প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারই পরে আর্থনীতিক পরিকল্পনাকে পূরণ করা এবং আজকের ও উত্তর পুরুষের মঙ্গল নির্ভর করছে।

জমির, খনিজ সম্পদের, জলের ও বনসম্পদের মালিকানা রয়েছে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সমাজের হাতে এবং সেটা স্থাপন করতে হবে বেশ শক্ত জমির ভিত্তিতে।

প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহার, রক্ষা ও পুনর্নবীকরণ এবং প্রকৃতিকে মিতব্যয়িতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যবহার করা—দেশে সাম্যবাদী সমাজ গঠন করার প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত এটি।

সুপ্রীম সোভিয়েতের চতুর্থ অধিবেশনের সিদ্ধান্তের ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রায়োগিক দিক থেকে যে সকল কার্যকলাপ গ্রহণ করে তাতে এই নীতিগুলোকে আরও বিকশিত করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের জাতীয় আর্থনীতিক যোজনাতে যোগ করা হয়েছে "প্রকৃতিকে রক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহার" শীর্ষক বিশেষ অংশ তাতে বলা হয়েছে বাস্তব উৎপাদনের ভিত্তি-ভূমিকে জোরদার করার জন্য যুক্ত এই সমস্যাগুলো এবং তারা জনগণের

জীবনযাত্রার অবস্থা, তাদের কাজের ও আমোদ প্রমোদের উন্নত ব্যবস্থা করার জন্যও নিয়োজিত।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনগুলোর মূল বিষয়বস্তু এবং অন্য রাজ্যগুলোর খনিজ সম্পদের যে আইনগুলো করা হয়েছে তার খসড়া নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। সেই খসড়াতে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল: "সোভিয়েত রাষ্ট্র কেবলমাত্র দেশের খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতেই সচেষ্ট নয় পরন্তু উত্তর পুরুষের এই ধরনের যে সকল চাহিদা থাকবে সেদিকেও লক্ষ্য রেখে কাজ করে।" খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আইনের উদ্দেশ্য ছিল যাতে খনিজ সম্পদকে যুক্তিসম্মত ও নানাভাবে ব্যবহার করার জন্য যে সুষ্ঠু সামাজিক সম্পর্ক সেটা গড়ে ওঠে, যাতে জাতীয় অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদ ঠিকমতো যোগান দেওয়া সম্ভব হয় এবং তার অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাও মেটানো হয়, যাতে খনিজ সম্পদকে যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করা হয় এবং তার ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়। এতে খনিজ সম্পদের ব্যাপক ও তত্ত্বাত্ত্বিক দিকটা অনুধাবন করার জন্য, খনিজ সম্পদের ব্যবহারের জন্য যথাযোগ্য নিয়মপালনের জন্য, প্রধান খনিজ পদার্থগুলো ও তার সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পদার্থেরও যাতে যথাসম্ভব উদ্ধার করে তাদের যুক্তিসম্মত ব্যবহার করা হয়, খনিজ স্টকের যাতে অযথা ক্ষয় না হয়, খনিতে যাতে প্লাবন না ঘটে বা আগুন না ধরে ইত্যাদি, ময়লা দিয়ে যাতে খনিজগুলোকে দূষিত না করা হয়, উৎপাদনজাত ফেলে দেওয়া দ্রব্য দিয়ে যাতে খনিকে ভরিয়ে না ফেলা হয় অথবা তেল, গ্যাস, ও অন্যান্য বস্তুগুলো যাতে জমির নীচে বেশি না জমে—এ সব ব্যবস্থাই করতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫-শ কংগ্রেসে "সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য যে নির্দেশগুলো" (১৯৭৬-৮০) দেওয়া হয়েছে তাতে বিশেষ করে বলা আছে প্রাকৃতিক সম্পদকে অনুধাবন করার জন্য এবং পরিমণ্ডল আজ কি অবস্থায় আছে এবং তার দূষিত করণের

সনুজপনুলো কি, সেগনুলো শনুষে রায় করার জন্য সর্বাধনুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযনুক্তিবিদ্যাগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

কংগ্রেস প্রদত্ত লিওনিদ ব্রেজনেভের রিপোর্টে বলা হয়েছে : "জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ করার এবং শহরে ও শিল্পকেন্দ্রগনুলো গড়ে ওঠার সংগে সংগে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য উত্তরোত্তর বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে—চলতি বছরেই ১১০০ কোটি রনুবল এর জন্য ধার্য করা হয়েছে। এর জন্য আরও বেশি বেশি টাকা ধার্য করার ঝোঁকটা বাড়তেই থাকবে। আর্থনীতিক উন্নতির সম্ভাবনার ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান দিনকে দিন উন্নততর হবার কথা মনে রাখলে এই বাড়তি টাকাটা কেবলমাত্র উৎপাদন করার দক্ষতা অর্জন করা থেকেই আসতে পারে।"

সোভিয়েত ইউনিয়নে কেন্দ্রীয়ভাবে প্ল্যানিং করা এবং সবকটা মন্ত্রীমণ্ডলীর ও সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে নিযনুক্ত বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কার্যকলাপকে সমন্বিত করেই এই ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও ফলপ্রসনুভাবে পরিমণ্ডল রক্ষা করার কাজ করা যেতে পারে।

যেমন একটা ব্যাপারে দেখা যাক, বায়নুমণ্ডল (ও জল) দনুষিতকরণের বিরনুদ্ধে আগে নিয়ম ছিল যে বস্তনুগতি (শিল্প থেকে বা অন্যভাবে) নির্গত হয়ে দনুষিতকরণ করে তার উচ্চসীমা বেঁধে দেওয়া ; এখন তার বদলে সোভিয়েত ইউনিয়নে চালনু করা হচ্ছে এমন অগ্রসর উন্নত ব্যবস্থা করা যাতে দনুষিতকরণের এই উচ্চসীমাটা কখনই ছাড়িয়ে যাবে না। এর ফলে কতোখানি দনুষিত হবে তার উচ্চতম পরিমাণটা একটা নির্দিষ্ট অংকের মধ্যেই সীমিত থাকে এবং কোনো কোনো এলাকার আরও আর্থনীতিক বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যেই ঐ দনুষিতকরণের পরিমাণটা আরও কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি করে দনুষিতকরণ-বিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা সজ্জিত করে ঠিক করে দেওয়া হবে যাতে দনুষিতকরণের সীমা লঙ্ঘিত না হয়।

ধনুলো জড়ো করে জমা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। একমাত্র

ইউক্রেইনেই ১৯৬৬-৭০ সালে ৭০০ ধূলো-জমো করার যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। নতুন কারুশিল্পের (টেকনোলজির) বিকাশ সাধন করা হয়েছে, যাতে বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি ছাড়ার পরিমাণ চারগুণভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে। ইউক্রেইন রিপাবলিকের বিজ্ঞান একাডেমির কারুশিল্পগত তাপ-পদার্থবিদ্যার (টেকনিক্যাল থার্মো-ফিজিক্স), এবং গ্যাস ইনস্টিটিউট একটা যন্ত্র বানিয়েছে যাতে বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণ একটি বেশি পরিমাণের অধিক না হয় (তার সাহায্যে ধরা পড়ে এবং নিয়ন্ত্রিত হয়) এবং এটা কিয়েভ ও লেনিনগ্রাদ শহরেও বসানো হবে। এই ব্যবস্থাতে ৫০-টি অবধি স্বয়ংক্রিয় ইউনিট আবহমণ্ডলে ক্ষতিকারক গ্যাস ও ধূলার ঘনত্বের পরিমাণ ক্রমাগত হিসেব করে চলে, বায়ু কোন্ দিকে বইছে, তার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কতো তা হিসেব করে দেখে। কেন্দ্রীয় টারমিনালে (যেখানে সব হিসেব ধরে রাখা হয়—অনুবাদক) শোধন-কর্মের প্ল্যাণ্ট (বা যন্ত্রপাতি) কতো ভালোভাবে কাজ করছে সেটা হিসেব করে দেখা হয় এবং বায়ুমণ্ডলে ধূলার পরিমাণ ও কোন্ কোন্ গ্যাস রয়েছে সেটা আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় টারমিনালে প্রাপ্ত এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে শোধনাগারের প্ল্যাণ্ট কতো ভালো করে কাজ করছে এবং আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব বায়ুমণ্ডলে ধূলার ও গ্যাসের পরিমাণ কতো।

মোটর যান থেকে যে দূষিত গ্যাস নির্গত হয় সেটা পরিমণ্ডলকে দূষিতকরণের একটা বেশ ভালো অংশ, সেটা দূর করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বড়ো বড়ো ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে যা ঘটে না, সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পনা অনুসারে সড়ক দিয়ে পরিবহণ-ব্যবস্থা করা হয়, অন্য ধরনের পরিবহণের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কি, সেটাও হিসেবের মধ্যে ধরে। কমিউনিস্ট পার্টির ২৫-শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৮০ সালে ২১ থেকে ২২ লক্ষ মোটর যান নির্মিত হবে, যার মধ্যে থাকবে ৮ থেকে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার ট্রাক লরী। একই সময়ে এই গাড়ীগুলো থেকে মোটর যানের নির্গত গ্যাস থেকে

বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণ যাতে কম করে হয় তার ব্যবস্থা নেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা আরও উন্নত ধরনের এনজিন নিয়ে, নানারকমের ইলেকট্রিক মোটর (যা থেকে মোটরযান তৈরি করা যায়), বাষ্পচালিত এনজিন, বহির্দহনের ব্যবস্থাযুক্ত (external combustion) এনজিন (যেটা স্টারলিং নিয়মে চলে) ও অন্যান্য এই ধরনের আরও কয়েকটি নিয়ে কাজ করছেন। আরও একটা উপাদান এই ধরনের কাজকর্মে বেশ অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেটা হল, "বাস্তব্য-চক্রের দিক থেকে একেবারে পরিশুদ্ধ"[২৩] জ্বালানি ও তেল ব্যবহার করা নানারকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যদ্বারা মোটরযান থেকে নির্গত কঠিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থকে ধরে ফেলা সম্ভব হয়, নির্গত পরিমাণকে কমানো এবং তাদের নির্গত বিষকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভব হয়।

চাষের জমি জল ও বায়ু থেকে যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য ৭০,০০০ হেক্টার এলাকা জুড়ে বড়ো গাছগাছড়া লাগিয়ে বনের যেন একটা বলয় (forest belts) তৈরি করা হয়। (এক হেক্টার হল ২'৪৭ একরের সমান)। এইভাবে ৮০,০০০ নিষ্ফলা জমিতে বন তৈরি করা হয়েছে এবং ১০ লক্ষেরও বেশি জমিতে আগে যেখানে উদ্ভিদরাজি ছিল, সেখানে নতুন করে আবার বনসম্পদ তৈরি করা হয়েছে।

ইউক্রাইনে সবুজের অভিযানের (উদ্ভিদরাজি তৈরি করে বন গড়ে তোলার —অনুবাদক) যে ১০ বছরের যোজনা ব্যাপক আকারে তৈরি করা হয়েছে তাতে প্রধান প্রধান শিল্প-অঞ্চলগুলোর চারধারে এই সবুজের মেখলা ছড়িয়ে দেওয়া হবে, সেই অঞ্চলগুলো হল: নীপ্রোপিট্রোভস্ক্, ডোনেৎস্ক, ওডেসা,

---

২৩. অর্থাৎ, এমন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা হয় যেটা মোটরযানকে চালাবার পরে যে দূষিত গ্যাস বা পদার্থ নির্গত করে তাকে আবার পরিশুদ্ধ করে পুনরায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব—অনুবাদক।

খেরসন, ক্রিভোরই ও অন্যান্য শহরগুলো। ১৯৮০ সালের মধ্যে সর্বসাকুল্যে ২ লক্ষ হেক্টার জমিকে সবুজ উদ্ভিদ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে।

মস্কোতে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। নবম পঞ্চবার্ষিকী যোজনাতে (১৯৭১-৭৫) সর্বসমেত ২০০০ গ্যাস ও ধুলো ধরে রাখার যেন ফাঁদ তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ১০০টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিমণ্ডলে দূষিত পদার্থ ছেড়ে দেওয়া বন্ধ করেছে অথবা শহরাঞ্চল থেকে তাদের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে মস্কোর কমিউনিস্ট পার্টি ও গভর্নমেণ্ট ১৯৭৬ সালে শহরের পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য ও পার্কের বলয়গুলোর (park belt) চারধারে রক্ষক বনরাজি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলোতে বলা হয়েছে, শহরের অবস্থার উন্নতি করার জন্য এবং পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। শহরের জল সরবরাহের এবং ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থার আরও উন্নতি করা হয়েছে, এবং মস্কোভা ও ইয়াওজা নদীর তলদেশ ছেঁচে পরিষ্কার করা হচ্ছে। শহরের জঞ্জালকে পরিশোধন করা ও তাকে পরিশোধন করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও বড়ো বড়ো গ্যারেজ তৈরি করা হয়েছে যার দ্বারা শিল্প ও জমি থেকে যে দূষিত জল নিষ্কাশিত হয় তাকে পরিশোধন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নিষ্কাশিত গ্যাস ও ধুলোকে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে ও শহরতলীর চারধারে সবুজ উদ্ভিদ পুঁতে আরও উন্নত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মস্কোর সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের জন্য পরিমণ্ডলকে গুণগতভাবে আরও উন্নত করা বিশেষ জরুরী বলে গণ্য হয়েছে। এর জন্য বিশেষভাবে যে সকল ব্যবস্থাপনা নেবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাতে পরিমণ্ডলের ক্ষতিকারক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে শহরের বাইরে নিয়ে যাবার, এলাকার ও শহরের সুবিধার সঙ্গে যোগ নেই এরকমের শিল্পগত ও অন্যান্য নির্মাণের কাজ

বন্ধ করে দেওয়ায়, জঞ্জাল ও মল নির্গমনের ব্যবস্থাকে আরও বাড়ানো এবং তাকে ও শিল্প থেকে নির্গত জঞ্জালকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো আছে তাকে বাড়ানো ও নতুনগুলো গড়ে তোলা—এ সব পরিকল্পনাই আছে।

মস্কোতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে ধূলি ও গ্যাস নির্গত হয় তাকে যেন ফাঁদ পেতে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ; উপস্থিত যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বায়ুমণ্ডলে গ্যাস ছাড়া হয় তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্ল্যাণ্ট বসানোর ব্যবস্থাকে আরও শক্তভাবে চালু করতে হবে। বনভূমি ও খেলাধুলা করার এলাকাকে প্রসারিত করতে হবে এবং তাদের আরও ভালো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থাও করতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেকগুলো এলাকাতে নতুন কারুশিল্পগত সুবিধার প্রবর্তন করা হয়েছে এবং জলাধারগুলো যাতে পরিশুদ্ধ হয় এবং জলের গুণাবলী যাতে উন্নত হয় তার জন্য নতুন রকমের ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। এস্টোনিয়ার তারতু বিশ্ববিদ্যালয়ে জলে অক্সিজেনের ঘনত্ব কতোখানি থাকবে এটা ঠিক করার জন্য একটা স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে ; সেটা আজকাল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার মধ্যে আছে আংগারাতে পেট্রো-কেমিক্যাল প্লাণ্ট, নোরিল্স্ক ও উসত-কামেনোগোর্স্ক-এ ধাতু-উৎপাদনের সব ব্যবস্থাগুলো। জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কতো হবে সেটা ঠিক করে দিয়ে যন্ত্রটি দেখিয়ে দেয় পরিশোধনকারী প্লাণ্টগুলো কিভাবে চলছে।

মস্কো ও ভিলনিয়াস শহরের জীববিজ্ঞানীরা এক ধরনের সবুজ, নীল সবুজ ও বৈত-এ্যাটমীয় এলজি (শ্যাওলা) তৈরি করেছেন যেটা দ্রুত ও সফলভাবেই নর্দমার জল ও অন্যান্য মলকে শোধন করে। বাল্টিক সমুদ্রোপকূলে কুরিল উপসাগরে যে পরীক্ষা চালানো হয়েছে তাতে দেখা গেছে পুরো আট দিন ধরে একটা বড়ো এলাকাতে ঐ শ্যাওলা দিয়ে নর্দমার মতো জল পরিশোধন করার পরে কুয়ার জলের মতোই পরিষ্কার হয়েছে। এই ধরনের ময়লা জলের

পুকুরকে পরিষ্কার করতে পরিশোধনকারী প্ল্যান্টের নির্মাণের খরচের তুলনায় খরচ পড়ে তিন ভাগের এক ভাগ, আবার প্ল্যান্টের চালাবার খরচও পড়ে ১৫ গুণ বেশি।

লেভেরনে দোনেৎস্ নদীর (ইউক্রাইনের দোনেৎস্ বেসিন) ১০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম স্বয়ংক্রিয় জল রক্ষা করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এতে নদীর জল ও তাতে যা কিছু দূষিত পদার্থ এসে পড়ে তার গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করার স্বয়ংক্রিয় স্টেশনগুলো রয়েছে এদের দূর-কন্ট্রোলের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। স্বয়ংক্রিয় স্টেশনগুলো একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী প্যানেলের কাছে নদীর যে সূত্র থেকে জল ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ আসছে তার খবরাখবর পৌঁছে দেবে। সেখানে এই তথ্যগুলোকে কমপিউটার-এর মাধ্যমে যাচাই হয়ে যাবার পরে জলের গুণাগুণ বিচার করা ও ভবিষ্যতে সেটা কি দাঁড়াবে সেটা বার করা সম্ভব হবে এবং তার ভিত্তিতে জল রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোনটা সব চাইতে ভালো সেটার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে। নিয়ন্ত্রণের প্যানেল থেকে জল ধরে রাখার আধারকে নদীর জলে কতোখানি অক্সিজেন থাকবে কৃত্রিম প্রণালীতে এবং পরিশোধনকারী প্ল্যান্টগুলো কি ভাবে চলবে তার যেন নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভবিষ্যতে নীপরের ও সির দারিয়ার মতো বড়ো নদীর জলের গুণাগুণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঐরকমই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা হবে।

যবে থেকে এক বছরের আর্থনীতিক প্ল্যানে প্রকৃতিকে রক্ষা করার ও প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই থেকেই বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন যে ক্যাস্পিয়ান সমুদ্রের স্বাস্থ্য[২৪] বেশ স্পষ্ট ভাবেই উন্নত হয়েছে। ১৯৭২ সালে ভলগা ও উরাল নদীদ্বয়ের বেসিন

২৪. ক্যাসপিয়ান 'সমুদ্র' বলা হলেও আসলে এর সবটাই জমি দিয়ে ঘেরা বিরাট হ্রদ বলা যেতে পারে যাতে জল দূষিত হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি—অনুবাদক।

দূষিতকরণ করার সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি এটি। শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত দূষিত পদার্থের পরিশোধনের জন্য উন্নততর ব্যবস্থা করা হয়েছে যার সর্বসাকুল্যে খরচ পড়ছে ৭০ কোটি রুবল, বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানে এটি চালু করা হয়েছে।

একমাত্র ১৯৭৩ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৭০০-টি পরিশোধনকারী প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে। তারা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ ঘন মিটার জলকে শোধন করে। এর মধ্যে শিল্পে ব্যবহৃত অর্ধেকের বেশি জলের পরিমাণ আবার ফেরৎ পাবার ব্যবস্থা করা হয়। দেশের ভেতর দিকের (অর্থাৎ, সমুদ্রোপকূলের নয়—অনুবাদক) জল বেশ লক্ষণীয় ভাবেই আগের চেয়ে বেশি পরিষ্কার হয়েছে। মস্কোভা, ওকা, ভেসনা, কুবান, ডন ও টম্ নদীগুলোতে আগেকার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে ময়লা ফেলা হচ্ছে।

১৯৮০ সালে ভলগা বা উরালে এক ঘন কিউবিক মিটার অপরিশোধিত শিল্প থেকে নিষ্কাশিত ময়লাও ফেলা হবে না। একটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনার মধ্যে ৪২২ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ৬৪৫-টি পরিশোধনের প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি মস্কোভা নদীতে যে কোনো স্বাস্থ্য সূচক সংজ্ঞার ভিত্তিতে জলের গুণ উন্নত হবে শতকরা ৫০ থেকে ১০০ (অর্থাৎ, অর্ধেক থেকে প্রায় পুরো জলটাই শুদ্ধ হয়ে যাবে—অনুবাদক)। তার ফলে নদীতে মাছের পরিমাণ বেশ ভালভাবেই বাড়বে। ১৯৭৩ সালে মস্কোভা নদীতে ৭৫০-টি পরিশোধনকারী প্ল্যান্ট কাজ করবে এবং আরও ৪৬০-টি নির্মিত হবে।

বাইকাল হ্রদকে বাঁচাবার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একমাত্র বুরিয়াট স্বায়ত্ত-শাসিত রিপাবলিকেই ৭০-টি পরিশোধনকারী প্ল্যান্ট নির্মিত হয়েছে এবং যে সকল নদীতে বাইকাল হ্রদে তাদের জল ঢেলে দেয় তারা যাতে বাইকাল হ্রদকে নোংরা না করে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নদীগুলো দিয়ে কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে, এবং ডুবে যাওয়া কাঠ সেখানে আর নেই। হ্রদেতে সিগারের মতো চেহারার ভেলাতে ভাসিয়া কাঠ নিয়ে যাওয়া হয়।

হ্রদের জলাধারের কাছে কাঠ কাটার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে এবং যে বিরাট এলাকা জুড়ে কাঠ কেটে রাখা হয়েছিল তাদের সেখানে আবার বৃক্ষরাজি রোপণ করা হয়েছে। প্রকৃতিকে রক্ষা করার নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে শিকার করা বন্ধ করা হয়েছে, এবং ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যদের রক্ষণীয় করা হয়েছে। মূল্যবান মাছ—রাশিয়ান স্টারজন ও 'অমুল' এর স্টক যাতে নষ্ট না হয় এবং তাদের মাছের চাষ যাতে ভালো করে হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নতুন নির্মাণ করার পরিকল্পনাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় প্ল্যানিং কমিটি (গস-প্ল্যান) ও অন্যান্য সংগঠন প্রকৃতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে এবং বাস্তব্য দিক থেকে তাদের সযত্নে বিচার করে দেখার জন্য খুঁটিয়ে দেখে থাকে।

সাইবেরিয়ার টোমস্ক শহরে এক সময় পেট্রোকেমিক্যাল সংক্রান্ত যাবতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার প্ল্যান করা হয়েছিল। যখন বেশ বোঝা গেল যে, ভূগর্ভস্থিত জলের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে এই পরিকল্পনাতে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নি, তখন তাকে বেশ ঢেলে সাজানো হল। এখন টোমস্ক পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদন-ব্যবস্থাকে তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা হচ্ছে, কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলকে রক্ষা করা হচ্ছে এবং দশ লক্ষ অধিবাসী নিয়ে এই শহরে কয়েক কুড়ি বছর ধরে পরিষ্কার টলটলে ঝর্ণার জল পাওয়া যাবে।

কাজাকস্তানে ইলি নদীতে, যেটা বালখাস হ্রদে তার জল ঢেলে দিচ্ছে, কাপচাগাই জলশক্তি স্টেশন তৈরি করা হয়েছিল ১৯৭০ সালে। কিন্তু তার ক্ষমতার তুলনায় মাত্র এক চতুর্থাংশ ক্ষমতা নিয়ে শক্তিকেন্দ্রটিকে চালানো হচ্ছে। তার কারণ রিপাবলিকের গভর্নমেন্ট ও বিজ্ঞানীরা ইচ্ছা করেই জলশক্তির জলাধারটিতে মৃধ গতিতে জল ছেড়ে দেন যাতে বালখাস হ্রদ, যেটাকে প্রকৃতি নিজেকে নানাভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে রেখেছে, সেটি যেন নষ্ট না হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিমণ্ডল রক্ষার কাজ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থাতে (কনভেনশান) যোগ দিয়েছে, তার মধ্যে সমুদ্রতে তেল ছেড়ে দূষিতকরণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশনও আছে। এই কনভেনশনের বাধ্যতামূলক নির্দেশ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শর্ত অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়াম ২৬-শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪-এ "সমুদ্রতে মানুষের স্বাস্থ্যের ও জীবজগতের সামুদ্রিক সম্পদের পরিপন্থী নানারকমের পদার্থ ছাড়লে যে দায়িত্ব বেড়ে যায়" সে সম্পর্কেও একটা ডিক্রি আছে। এই ডিক্রিতে সমুদ্রের জল যেটা উপকূলের ভেতর দিকে বয়ে যায় অথবা উপকূলের জল বিষাক্ত করলে অথবা খোলা সমুদ্রের (যা সব দেশের মধ্যে রয়েছে) তাকে বিষাক্ত করলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে (সোভিয়েত এই শেষোক্ত ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক ভাবে চুক্তিবদ্ধ)।

জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীমণ্ডলী উভয়ে মিলে কৃষ্ণ সাগর ও এজভ্ সমুদ্রোপকূল দূষিতকরণের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সমুদ্রোপকূলের এলাকাতে বহু ফ্যাক্টরি ও কারখানা কেমিক্যাল প্ল্যান্ট এবং উজ্বলি বুগ, নীপার ও ডন্ নদীর ধারে কৃষি-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। জলটা যতোই লভ্য হয় ততোই কাছের শহরে শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু একই সময়ে জলের সঙ্গে যতো নোংরা জিনিস চলে আসবে, সমুদ্রের ও নদীর জল, বায়ু ও ভূমি দূষিত হবার ভয়ও ততো বেশি।

এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, পরিশোধনের জন্য যথার্থ কাজ করতে পারে এবং জলের দূষিতকরণ নিবারণের জন্য প্লান্টের সঙ্গে আরও অনেক রকমের প্রযুক্তিবিদ্যাগত ব্যবস্থাপনা এই এলাকাতে নোংরা জল ও জঞ্জাল যেটা নদীতে গিয়ে পড়ে তার পরিমাণকে কমিয়েছে। একই সময়ে যে সকল নদী কৃষ্ণ সাগর ও এজভে গিয়ে পড়বে তারা ১৯৮৫ সাল নাগাদ একেবারেই কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ নিয়ে যাবে না (অর্থাৎ, এই

দূষিত পদার্থসমূহের পুরোপুরি পরিশোধনের ব্যবস্থা করা সম্পন্ন হবে ১৯৮৫ সালে—অনুবাদক)।

এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হলে কেবলমাত্র দেশের একটা বড়ো শিল্প-অঞ্চলেই যে পরিমণ্ডলের গুণগত উন্নতি হবে তাই নয়, পরন্তু এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য প্রোগ্রামের পথও খুলে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কয়েকটি বড়ো শহরে এবং কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও খনিতে দশম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার অধীনে পরিশোধনকারী ব্যবস্থাও সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ১৯৮০ সালে প্রকৃতি থেকে যতোটুকু পরিষ্কার জল নেওয়া হয়ে থাকে সেটুকুই তাকে আবার ফেরৎ দেওয়া হবে। ১৯৭৬ সালে ওডেসা, ইলিচেভস্ক, তুয়াপস্ ও সেবাস্তোপোল বন্দরে জাহাজ থেকে নির্গত নোংরা জলকে গ্রহণ করে পরিশুদ্ধ করার জন্য তীরবর্তী যন্ত্রাদি ও প্লান্ট বসানো হবে। কৃষ্ণ ও এজভ সমুদ্রে ও তাতে যে সকল নদী পড়েছে তাতে ভাসমান যে সকল যন্ত্রপাতি আছে (যেমন জেটি ইত্যাদি—অনুবাদক) তাতে এমন ধরনের যন্ত্রপাতি বসানো আছে যারা নির্গত দূষিত পদার্থসমূহকে বা নোংরা জলকে পুনরায় পরিশোধন করে দিতে পারে যাতে জলের ব্যবহার যুক্তি-সম্মত হয়।

পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নত ব্যবস্থা করলেই হবে না, তার জন্য প্রতিষ্ঠান, পুরো নতুন শিল্প ও কৃষির ব্যবস্থা বেশ পাকাপোক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে। পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য যাতে সমাজের প্রতিটি লোকের একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থাকে তার জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এর জন্য প্রকৃতিকে রক্ষা করার ও প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মত ভাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যবস্থার যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে লঙ্ঘন করে তাহলে তার প্রতিবেধক ব্যবস্থা নেবে গভর্নমেণ্ট।

১৯৭২ সালের একটি প্লিনারি মিটিংয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম

কোর্ট বনসম্পদ রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার পর্যালোচনা করে। এর জন্য যে সকল আদেশ আছে সেগুলো লঙ্ঘিত হলে বিচারবিভাগের দিক থেকে তার দিকে নজর দিতে হবে এবং লঙ্ঘনকারীদের তার জন্য উপযুক্ত প্রশাসনিক বা অন্য শাস্তি দেবার ব্যবস্থা নিতে হবে। ১৯৭২ সালে সুপ্রীম কোর্টের প্লিনারি মিটিং "কোর্টের দ্বারা প্রকৃতি রক্ষার কি কি হাতে-কলমে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে" সে সম্পর্কে বিশেষ আইন প্রণয়ন করে এবং প্রকৃতি রক্ষার ব্যবস্থাকে যারা লঙ্ঘন করবে তার জন্য যে জটিল সমস্যাদি উঠতে পারে সেগুলো বুঝিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে।

কাজেই প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য সংগঠনিক আর্থনীতিক ও মতাদর্শগত শিক্ষামূলক ব্যবস্থাদি সোভিয়েত রাষ্ট্র গ্রহণ করে থাকে তাকেই বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থাদি ও পদ্ধতিতে পাশাপাশি আরও জোরালো করে তোলা হয়। এই প্রক্রিয়াতে নিহিত রয়েছে নিয়ন্ত্রণমূলক, শিক্ষামূলক ও আরও নানা রকমের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি যেটা ক্রিমিনাল, প্রশাসনিক, সিভিল ও অন্যান্য আইনের মধ্যেই রয়েছে। আইনের প্রত্যেক বিভাগেই প্রকৃতিকে রক্ষা করার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রকৃতিকে আইনের তত্ত্বাবধানে এনে তাকে বরাবর রক্ষা করতে হবে—সোভিয়েত আইন প্রণয়নে এর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তা থেকে বোঝা যায়, সোভিয়েত রাষ্ট্র যেমন গড়ে উঠছে, প্রকৃতিকে আইনের দিক থেকে রক্ষা করার তেমনি কয়েকটি তাত্ত্বিক দিক আমাদের সামনে এসে হাজির হচ্ছে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৫-শ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে একটা বিবৃতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রাষ্ট্রিক কার্যকলাপের একটা সাধারণীকরণ করা হয়েছে : "আমাদের সমাজ যে নতুন অবস্থার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে তার উপযোগী আইনগত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগেকার দিনে অনেক জিনিস আইনের আওতায় পড়তো না, যেমন পরিমণ্ডল রক্ষা করার ব্যবস্থাদি, যার মধ্যে রয়েছে জল, পৃথিবী, বায়ু-

মণ্ডল প্রভৃতি। এটা খুব ভালো কথা যে, প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য বেশ আটঘাট বেঁধে পরিকল্পনা-মাফিক কাজ করার জন্য আইন করা হচ্ছে।"

জাতীয় পরিধিতে ব্যাপকভাবে এই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রকৃতির রক্ষার্থে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা সর্বস্তরে শুধু ব্যবস্থা অবলম্বনই করেন না, সমাজের সকল মানুষ যাতে সেই নিয়মগুলো মেনে চলে এবং বিশেষজ্ঞরা যাতে তাতে অংশগ্রহণ করেন, সে ব্যবস্থাও করেন। জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনের চাপে এবং এই সকল সমস্যাবলীর বিশিষ্ট দিকগুলোকে এলাকাভিত্তিকভাবে দেখার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিশোধনকারী প্লাণ্টের ছাত্রদের বিশেষজ্ঞ করার জন্য ট্রেনিং দিচ্ছে, যাতে জলসম্পদ ও বায়ুমণ্ডলকে এবং পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য তত্ত্ব ও প্রয়োগকে কাজে লাগানো যায়।

১৯৭৬ সালে মস্কোতে রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ্যার মেনদেলিয়েভের[২৫] ইনস্টিটিউটে "শিল্পে উৎপাদিত দ্বিতীয় পর্যায়ের যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাদের আবার কি করে ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে" সে সম্পর্কে এনজিনিয়ারদের প্রথম গ্রুপকে শিক্ষিত করে। স্নাতকরা প্রথম বড়ো শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফেলে-দেওয়া জিনিসগুলো থেকে আবার কি করে মূল্যবান শিল্পের উপযুক্ত কাঁচা মাল ফেরৎ পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে কাজ করে। সোভিয়েতের তরুণরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ডিপার্টমেণ্টে পরিমণ্ডলের বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে সহজেই ভর্তি হতে পারে।

পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে অনুধাবন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাদেমি নিযুক্ত এবং তা থেকে যা ফল পাওয়া যায় সেটা যতো শীঘ্র সম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে একাদেমির একটি সাধারণ সভাতে পরিমণ্ডল রক্ষার সমস্যাটা খুঁটিয়ে আলোচনা

---

২৫. ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত রাশিয়ান রসায়নবিদ, যিনি মৌলিক পদার্থ সমূহের পর্যায়ক্রমিক সারণী (periodic table) প্রথম রচনা করেন—অনুবাদক।

করা হয়, সেখানে ভবিষ্যতের জন্য যুক্তভাবে রিসার্চ করা এবং তার জন্য জাতীয় অর্থনীতিগত প্রয়োজনকে হিসেবের মধ্যে ধরা হয়।

ভবিষ্যতের রিসার্চের প্রধান ঝোকগুলোকে এইভাবে তালিকাবদ্ধ করা হয় : প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ও মানুষের কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত ভূগোলকে ব্যেপে ও এলাকাগত ভিত্তিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, ভবিষ্যতে সে সম্পর্কে কি কাজ করা হবে সেটা নির্ধারণ করা ; প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার, রক্ষা ও পুনরুৎপাদন করার জন্য যুক্তিসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করা ; বায়ুমণ্ডলে মানুষের কার্যকলাপের প্রভাব কি পড়বে সেটা অনুধাবন করা ; 'বাস্তব্য-চক্রের দিক থেকে পরিষ্কার'[২৬] (ecologically clean) প্রযুক্তির বিকাশ সাধন করা প্রাকৃতিক সম্পদ কতোখানি আছে এবং তাকে কতোটা ব্যবহার করা যায় এবং পরিমণ্ডলের পরে মানুষের প্রভাব কি তার মোট হিসেব করে দেখা ; প্রকৃতিকে ব্যবহার করার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক একই ধরনের আইনগত মান নির্ধারণ করা ; এবং জীবমণ্ডলকে ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে পুরো ব্যবহার করার জন্য গাণিতিক মডেল তৈরি করা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীমণ্ডলীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কমিটির ও সোভিয়েতের বিজ্ঞান একাদেমির পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে দেখার জন্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার

---

২৬. পৃথিবীতে বাস করার জন্য প্রকৃতির তৈরি স্বয়ংসম্পূর্ণ 'চক্র' আছে ; যেমন আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বনডাই-অক্সাইড নির্গত করি তাকে উদ্ভিদরাজি গ্রহণ করে সূর্যালোকের সাহায্যে একটা প্রক্রিয়ার দ্বারা (যাকে সালোক-সংশ্লেষ বলা হয়ে থাকে) আবার অক্সিজেন রূপে ফেরৎ দেয়। তেমনি আমাদের দেহনিঃসৃত মলমূত্রাদি নাইট্রোজেন রূপে জমিতে প্রবেশ করে জমির সাররূপে কাজ করে আবার খাদ্যরূপে আমাদের কাছে ফেরৎ আসে।

অক্সিজেন-কার্বনডাই-অক্সাইড বা নাইট্রোজেনের স্বয়ংসম্পূর্ণ 'চক্র'-কে বলা হয় "বাস্তব্য" (ecológical) চক্র।

এখানে বলা হচ্ছে, এই বাস্তব্য-চক্রগুলোর যেন ক্ষতি না হয়—অনুবাদক।

করার জন্য আন্তঃবিভাগীয় কাউন্সিল রয়েছে। সক্রিয়ভাবে কর্মরত এই কাউন্সিলে রয়েছে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ও পৃথিবী বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা, জোয়ার ও সাগরের বিকাশের জন্য; শিল্পগত উৎপাদনের প্রধান প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার জন্য এবং জমি, জল, বন ও অন্যান্য জৈবিক সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের ও সংরক্ষণের এবং সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য ও নানা ধরনের প্রতিনিধিরা। উদ্ভিদের জন্য রিসার্চ করা ও তাকে আরও বাড়ানো, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ও পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান করার কাউন্সিলের কাজ নির্ধারণ করা হয়।

আগামী বিশ-ত্রিশ বছরে সোভিয়েতের জাতীয় অর্থনীতি যে ভাবে বিকশিত হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবমণ্ডলে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কি কি সম্ভাব্য পরিবর্তন হতে পারে সে সম্পর্কে কাজ করা প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। আর্থনীতিক কাজের জন্য পরিমণ্ডলে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিপন্থী প্রভাব ভবিষ্যতে কি পড়তে পারে তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত পরিমণ্ডল সম্পর্কে যে পলিসি কাজে চালু করা হচ্ছে তা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতির সঙ্গে সুসংগতিপূর্ণ ভারসাম্য ফলপ্রসূভাবে রক্ষা করতে পারে সেই ধরনের সমাজ যার বৈজ্ঞানিকগণও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই সমস্যার দিকে পুরো নজর দিতে পারে, এবং যে সমাজে ভূমি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো জনসাধারণের সম্পত্তি। এটা হওয়ার জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন মানুষ ও প্রকৃতির, উভয়ের স্বার্থের ক্ষতি না করে বড়ো রকমের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিমণ্ডল রক্ষা কতো ভালভাবে হতে পারে সেটা জানতে অন্য দেশগুলো বিশেষভাবে উৎসুক। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলো সহ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত যে সহযোগিতা ইদানীং কালে স্থাপিত হয়েছে,

তাতে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য যে বিশিষ্ট পরিকল্পনাগুলো আছে তাতে ক্রমশই বেশি বেশি জোর পড়ছে।

বিদেশী প্রতিষ্ঠানরা (ফার্মরা) যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি-তৈরি করার কারখানার জন্য এবং পরিমণ্ডলের ওপারে যে ক্ষতিকারক প্রভাব শিল্পদের উৎপাদন থেকে পড়ে তা কমবার জন্য সোভিয়েতের যে ব্যবস্থাপনা (লাইসেন্স) আছে তা সহজই কিনে নেয়। সাম্প্রতিক আমেরিকার ফার্মরা জল শোষন করার জন্য যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্লাণ্টের লাইসেন্স (ব্যবস্থাপনা), জল শুকিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে বিস্ফোরণকারী প্লাণ্ট; মোটরগাড়ী থেকে দূষিত ক্ষতিকারক পদার্থ যাতে কম নির্গত হয় এবং সোভিয়েত নক্সাকারক ও এন্‌জিনিয়ারদের দ্বারা উদ্ভাবিত আরও কয়েকটি ব্যবস্থাপনা কিনেছে।

জল পরিশোধনকারী প্লাণ্টের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সোভিয়েত নির্মিত এফ্, পি, এ, কে, এম,-২.৫ ফিলটার প্রেস যা সোভিয়েতের অবদান হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে এবং যাতে বিভিন্ন জিনিস থেকে তার জল (বা জলীয় ভিজে পদার্থ) নিষ্কাষণ করে নেওয়া সম্ভব : রং করার বস্তু, রংয়ের পিণ্ড ডেটারজেণ্ট প্রভৃতি। এই ফিল্টারগুলো (অনেক সময় বিদেশে এদের "ইক্রাইন প্রেস" নামে ডাকা হয়) ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্সের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশগুলো কিনে নেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন রকমের পরিশোধনকারীর ব্যবস্থা করেছে, সেটাকে বলা হয় লেগে থাকা বিচ্ছেদ করা (adhesive separation) এবং সেটা খুবই ফলপ্রসু, চালাতে শক্তি খরচ হয় সামান্য, খরচও পড়ে অল্প এবং এটাকে চালানো বেশ সোজা।

যদিও উপস্থিত পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সোভিয়েতের সহযোগিতা কেবলমাত্র খবরাখবর আদানপ্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তার জন্য সীমিত ব্যবস্থা নেবারই উদ্যোগ মাত্র নেওয়া হয়, তথাপি

"পারস্পরিক আর্থনীতিক সাহায্যের জন্য কাউনসিল" (CMEA—Council for Mutual Economic Assistance) ক্রমশই অগ্রসর চেহারা নিচ্ছে। পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে যুক্ত প্রোজেক্টগুলো থেকে তথ্য পাওয়া যায় যে, যেমন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব বিকাশ লাভ করবে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে যে কতোখানি আরও বেশি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে (reserves of the socialist system) সেটা বোঝা যাবে, দেখা যাবে যে, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ করে সমাজের সকল মানুষের সন্তোষ সাধন করা, তেমনি একাধারে মানুষের ও প্রকৃতির মধ্যেও যুক্তিসম্মত সম্পর্ক রাখা সম্ভব।

সি, এম, ই, এ, (পারস্পরিক আর্থনীতিক সহযোগিতা)-র সদস্য দেশগুলোর আর্থনীতিক প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অধ্যয়ন চালানো এবং ঐ সকল জটিল সমস্যার প্রায়োগিক সমাধানের জন্যও কাজ আরম্ভ করেছে; এটা করতে গিয়ে পরিকল্পনা-মাফিক উৎপাদন চালাবার জন্য এবং পরিশোধনকারী প্লান্ট ও তার জন্য যা যন্ত্রপাতি দরকার তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে; এর জন্য 'জঞ্জাল-মুক্ত' প্রযুক্তি ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করছে, এবং এমন ধরনের হিসেবপত্র করার (একাউনটিং) চেষ্টা করছে যাতে দর ঠিক করার নতুন নীতিগুলো প্রবর্তন করা যায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে খুব ভালো করে বিবেচনা করে কোনো সম্পর্ক নেই, যেটা বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির প্রশ্নকে হিসেবের মধ্যে ধরবে,—কয়েকজন দুরভিসন্ধিকারীদের এই ধরনের প্রচারের প্রচেষ্টা একেবারেই অবিশ্বাস্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। সত্যই, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে এটাই দেখা যায় যে, সমাজ, প্রযুক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুসংগতি গড়ে তোলার সাফল্য দেখা দিয়েছে।

কয়েকটি বই থেকে দেখা যাবে বিকশিত সমাজতন্ত্রের সমাজ ও তার সাধারণ পরিমণ্ডলের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য থেকে যে ঐক্যবদ্ধ ধারণা হতে পারে

তা থেকে উদ্ভূত হয়েছে কয়েকটি যৌগিক বিষয়, যেটা বর্তমান ও উত্তর পুরুষের বাস্তব অবস্থার সূত্রস্বরূপ।

সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের মার্কসীয় ধারণার প্রধান কথা হচ্ছে সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য ও গুণগত প্রভেদকে স্বীকার করে নেওয়া। বাস্তবিকই এই আন্তঃসম্পর্ক (মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে—অনুবাদক) কি ভাবে গড়ে উঠেছে তার সবটাই এই ভাবে ব্যক্ত হয়েছে : "যাই হোক না কেন, শেষ বিচারে যে পরিমণ্ডলে আমরা বাস করি, চলাফেরা করি এবং নিজেদের প্রকাশ করি, প্রকৃতি ও ইতিহাস তারই দুটি গঠনমূলক উপাদান।" (মার্কস্-এঙ্গেলসের জার্মান সংস্করণ, ব্যাণ্ড, ৩১, দিয়েজ ভারল্যাগ বার্লিন এস্ ৬৩)।

সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে নির্ধারক যে উৎপাদনকে মার্কসবাদ স্বীকার করে, সেটা হল সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা, এবং সামাজিক উৎপাদন থেকে উদ্ভূত সম্পর্ক। যুক্তিসম্মত ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে এবং একমাত্র সেই সমাজই পরিমণ্ডলের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে দিতে পারে যেটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রকৃতি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম যৌলিকনীতি হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে পরিমণ্ডল সম্পর্কে স্থির পরিপূর্ণ মিতব্যয়ী মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার অনেকগুলো প্রতিপাদ্যের মধ্যে মানবিক দিকটা অনেক গভীর : কারণ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষা যে, উত্তরপুরুষের জন্য এমন একটি পরিমণ্ডল তৈরি করে যাওয়া, যেটি ভবিষ্যতের মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সঠিক যোগাযোগের সম্পর্ক রেখে কাজ করবে। ২৪-শ কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছেন, "কেবলমাত্র আমরাই নয় পরন্তু উত্তর পুরুষও দেশের চমৎকার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকে ব্যবহার ও ভোগ করতে পারবে।"

আর শেষ অবধি, মার্কসীয় ধারণাতে সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ককে

দেখা হয় আজকের সভ্যতার বিকাশের বর্তমান স্তরের অন্যান্য সাম্প্রতিক সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উত্তেজনা প্রশমনকে (দেঁতাতকে) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো যে অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে থাকে, যেটা করার জন্য সামরিক ক্ষেত্রে কার্যোপযোগী ব্যবস্থাও তারা অবলম্বন করে : যেটা হল অস্ত্রসম্ভারকে সীমিত করতে ও কমাতে হবে— অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটি হল অন্যতম কারণ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মতে গ্রহ-পৃথিবীর পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারটা ঠিক মতো করতে হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরিমণ্ডল রক্ষা করার সমস্যাকে নীতিগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যে সকল অস্ত্রাদি ব্যাপক আকারে সমগ্র জনগণকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে তাদের ব্যবহার বে-আইনী ঘোষণা করে বন্ধ করে দিতে হবে এবং গণধ্বংসকারী অস্ত্রসম্ভারকে বন্ধ করার জন্য চুক্তিকারী দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষমতা ও পারস্পরিক সার্বভৌম অধিকার মেনে নিয়ে কাজ করতে হবে যেটা সকলেরই উপকারে আসবে।

২২-শে ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে রাশিয়ান ফেডারেশন অফ সোসালিস্ট রিপাবলিক-এর[২৭] ৫০ বছর বার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, সোভিয়েত ইউনিয়ন অফ্ সোস্যালিস্ট রিপাবলিক-এর (ইউ, এস্, এস্, আর,) সুপ্রীম সোভিয়েত এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের সুপ্রীম সোভিয়েত "দুনিয়ার জনগণের কাছে যে আবেদন" জানিয়ে সেটা

২৭. ১৯১৭ সালের ৭-ই নভেম্বর রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে প্রলেতারিয়েতের হাতে ক্ষমতা আসার পরে সেটা পূর্বতন জার সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে এবং মধ্য এশিয়ার জারের উপনিবেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে।

২২-শে ডিসেম্বর ১৯২২ সালে পূর্বতন জার সাম্রাজ্যের প্রায় সবটা জুড়ে আজকের ইউনিয়ন অফ সোভালিস্ট সোভিয়েত রিপাবলিক বা ইউ, এস. এস. আর, ছোট কথায় সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে উঠে যার অন্যতম প্রধান অঙ্গরাজ্য হল রাশিয়া বা রাশিয়ান ফেডারেশন অফ সোভালিস্ট রিপাবলিক। —অনুবাদক।

দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, তাতে বায়ুমণ্ডল, সমুদ্র, নদী ও শহরের আবহাওয়াকে দূষিত করার জন্য সমগ্র পরিমণ্ডলকে নষ্ট করে দেবার যে বিপদ দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দুনিয়ার সব জাতিগুলোর কাছে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে "মানুষকে ঘিরে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ (বা পরিমণ্ডল) তাকে রক্ষা করতে ও পুনরুদ্ধার করতে সকলকে একজোটে জোরালো ভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪-কংগ্রেসে জাতিগুলোর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার (যেটা শান্তি প্রোগ্রাম বলে পরিচিত) একটা সংগ্রামী প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে, যেটা সারা গ্রহ জুড়ে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য নির্ধারক অবদান রেখেছে। এই প্রোগ্রামকে ২৫-শ পার্টি-কংগ্রেসে আরও বিকশিত করা হয়। জুন ১৯৭৬ সালে বার্লিনে ইউরোপের-২৯-টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিদের নেতারা আমাদের যুগের সর্বাপেক্ষা জটিল ও মৌলিক সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি ব্যাপক প্রোগ্রাম রাখেন; এই প্রোগ্রামে পরিমণ্ডল রক্ষা করার সমস্যাও ঢোকানো হয়েছে।

গত শতাব্দীতে বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক, আইভান তুর্গেনিভ তাঁর "পিতা ও পুত্র" নামক নভেলের প্রধান চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন; "প্রকৃতি একটা গীর্জার (ক্যাথিড্রাল) মতন নয়, সে যেন একটা কারখানা এবং মানুষ সেখানে একজন কর্মী!" সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যে-সমাজের প্রধান নজর রয়েছে কর্মী মানুষের দিকে, সেই সমাজ প্রকৃতিকে কারখানার মতোই যুক্তিসম্মত ভাবে ব্যবহার করে আনন্দ পেতে চায় এবং সেটা করতে গিয়ে এই 'কারখানা' যাতে ভুলের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং অতীতের বে-হিসেবী কাজের কুফলে যাতে ভুগতে না হয় অথবা ভবিষ্যতে সেই ধরনের কাজ যাতে পুনরায় না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার (প্ল্যানিংয়ের) এবং দীর্ঘ

মেয়াদী ভাবে ভবিষ্যতকে দেখার জন্য কয়েকটি শিল্প থেকে পরিমণ্ডল সম্পর্কে যে সর্ব-ব্যাপক ধারণার উদ্ভব হয় তাকে কাজে লাগাতে পারে এবং অন্য রাজ্যগুলো (বা রিপাবলিকগুলো) থেকে বা সারা দেশের আর্থনীতিগত ভাবে বিভক্ত এলাকাগুলো থেকে যে সাফল্য অর্জিত হয় তাকেও ব্যবহার করে তোলে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি নীতিগতভাবে আনুগত্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অবস্থা যখন বেশ অনুকূলজনক, তখন পরিমণ্ডলের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজ-তান্ত্রিক দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রেরও কাজে লাগবে।

৩য় পরিচ্ছেদ

পরিমণ্ডল ও ধনতন্ত্র

অন্যান্য সংকটের বৃদ্ধি পাওয়াতে তার পরিপ্রেক্ষিতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাস্তব্যচক্রের ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বিশেষভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে এবং সেটা ক্রমশই জনসাধারণের ও গভর্নমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। **টাইমস** পত্রিকা লিখছে : "এ বছরের আশ্চর্যজনক কাজ যেটা হয়েছে সেটা হল যে, শেষ অবধি জনগণ সমস্যাটার পুরো চেহারা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। এটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ১৯৭০ সালে যে লক্ষ্যের জন্য র‍্যাচেল কারসন একক যোদ্ধা হয়ে নিঃসংগ ও একনিষ্ঠভাবে লড়ছিলেন, সেটা জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো, এবং অনেক সময় যেন সারা জাতির চেতনাকে আচ্ছন্ন করলো…লক্ষণীয় দ্রুততার সংগে সেটা আমেরিকার কাছে মন্ত্র জপার মতো একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো…" (**টাইমস্** ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭১, পৃষ্ঠা, ২১)।

ঠিক এই সময়েই অনেক বুর্জোয়া সমাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদরা সাম্প্রতিক সমাজে সংকটের একটা নতুন মাত্রা (ডাইমেনসন্) দেখতে পেলেন ; তাঁদের মতে তার অগ্রগতি এতো বেশি হয়ে গেছে যে, স্বাভাবিক পরিমণ্ডলের সংগে তার সংঘাত শুরু হয়ে গেছে।

"যা ঘটবে (Things to come) শীর্ষক বইয়েতে হাডসন ইনস্টিটিউট এর হারমান্ কান্ ও বি, ব্রুস্-ব্রিগস্ লিখছেন যে, "১৯৮৫ সালের প্রযুক্তির সংকট" ধনতান্ত্রিক জগতের পরে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করবে। এই সংকটের অন্যতম উপাদান হল, লেখকদের মতে, পরিব্যাপ্ত পুনরুৎপাদনের প্রত্যক্ষ

ফলশ্রুতি হিসেবে পরিমণ্ডলের আরও অবনতি হবে।" তাঁরা লিখেছেন : "এই সংকটের সবটা বলতে হলে তিনটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে হবে : (১) একই সংগে একই সময়ে পাশাপাশি অনেকগুলো প্রযুক্তির প্রায়োগিক ব্যবস্থা হয় ভেংগে পড়ছে নয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, এই বিপদ আমাদের সামনে ঘনিয়ে আসবে ; (২) অতীতের অপেক্ষা কয়েকটি সংকটের চেহারা অনেক বড়ো ; (৩) যেহেতু পরিমণ্ডলের দূষিতকরণ ও প্রযুক্তির বৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাবার ঝোঁক থাকে, সেহেতু সমস্যাটির গুরুতর আকার ধারণ না করলে সমস্যাটা আমরা জানতেই পারি না এবং তখন তার সমাধান করার জন্য সময় আর বেশি থাকে না।"

ধনতান্ত্রিক সমাজে যে 'ট্রাজেডি'গুলো ঘটে তার মধ্যে পরিমণ্ডলের অপচয় করে—এর মতে অন্যতম একটি প্রধান বিষয় ; শিল্পায়ন করতে গিয়ে এই অপচয় ঘটেছে এবং "শিল্পায়নের-উত্তর" কালে এটা আরও অনেক বেশি ঘটবে। ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যই এটা ঘটে সেটা ধরে নিয়ে তিনি জনসাধারণকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন এই বলে : "আমাদের নিজস্ব সমাজ, যাকে মোটামুটি শিল্পায়িত-ধনতান্ত্রিক সমাজ বলা যায়, সেটা এই সকল সমস্যা সম্পর্কে (সংকট থেকে উদ্ভূত) নমনীয় ও পরিবর্তনশীল মনোভাব গ্রহণ করার চেষ্টা করে।"

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামাজিক-আর্থনীতিক অথবা রাজনৈতিক অবস্থা ব্যতিরেকে একমাত্র শিল্পায়নের জন্য, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের জন্যই বাস্তব্য-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সমস্যাগুলো বেড়ে যাচ্ছে, এইভাবে সমগ্র ব্যাপারটাকে কয়েকজন বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক দেখাবার চেষ্টা করছেন যে; সমস্যাটি সমাজ-তান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে বিশেষভাবে প্রকট।

ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিমণ্ডলের সমস্যার চরিত্র ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে কয়েকজন বুর্জোয়া বিজ্ঞানীকে শেষ অবধি স্বীকার করতে হয়েছে, প্রথমত, যে সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট জাড্য

আছে (অর্থাৎ তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের তাগিদ আছে—অনুবাদক) সেখানে এই সমস্যা দেখা দেয় ; দ্বিতীয়ত, অনেকগুলো পদার্থগত, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য পরিমণ্ডলের গুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক সময় চলে যাবার পরে বাস্তব্য-ব্যবস্থার এমন স্থানে এটা ধরা পড়ে যেখানে মোটেই সেটা হবে বলে আশা করা যায় না ; তৃতীয়ত, মানুষ ও জন্তুর পরে দূষিত পদার্থের যে প্রভাব পড়ে তার নেতিবাচক দিকটা ধরা পড়ে একটা প্রজন্মের সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ; এবং চতুর্থত, পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য কেবল নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ করলেই চলে না, পরন্তু সেটা সমাজের মূল্যবোধে ও প্রতিষ্ঠানগুলোতেও পরিবর্তন আনে এবং যদিও অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রযুক্তির উদ্ভাবনা করা সম্ভব, এর ফলে সামাজিক প্রতিক্রিয়া হতে অনেক দেরি হয়।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সাম্প্রতিক বাস্তব্য অবস্থার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা অর্থনীতিবিদরাও করেছেন।' যেমন, সুপরিচিত বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ কেনেথ বোলডিং বলেছেন, "গো-পালকের অর্থনীতি"-র (cowboy economy) মতো সবদিক খোলা মডেল থেকে যতো শীঘ্র সম্ভব মৌলিক-ভাবে নতুন "ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ" অর্থনীতির 'মহাকাশযাত্রীর' অর্থনীতি'-তে রূপান্তর সাধন করতে হবে ; এটা হবে এমন এক অর্থনীতি যাতে পৃথিবীকে ধরে নিতে হবে একটি একক মহাকাশযানের[২৮] মতন, যাতে

---

২৮. সারা পৃথিবীর জল-স্থল ও বায়ুমণ্ডলের বাইরের সমস্ত মহাকাশ অঞ্চলটাই প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে একেবারে প্রতিকূল বলে সারা পৃথিবীটাতেই কয়েকটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাস্তব -চক্রের, যেমন অক্সিজেন-কারবন ডাই অকসাইড চক্র বা নাইট্রোজেন চক্রের (ফুটনোট নং ১ ও ২ দ্রষ্টব্য) ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

কাজেই সারা পৃথিবীটাকেই আমরা একটা মহাকাশযান বলে উঠতে পারি।

প্রসঙ্গত ভবিষ্যতের দূর পাল্লার দীর্ঘস্থায়ী গ্রহান্তর যাত্রার জন্য যে মহাকাশযান তৈরি করা হবে তাতে এই রকমের বাস্তব্য-চক্রের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। —অনুবাদক।

নিষ্কাশনের বা পুনর্ব্যবহারের সীমাহীন যথেচ্ছ ব্যবস্থা থাকবে না। (Garrett de Bell editor, The Environmental Handbook, New york, 1970, পৃষ্ঠা ৯৬)। বোলডিংয়ের মতে নতুন ছাঁচের অর্থনীতিতে মানুষকে তার যথার্থ অবস্থান খুঁজে নিতে হবে, এটা হবে একটা "চক্রাকারে বাস্তব্য ব্যবস্থা যাতে বাস্তব চেহারার ক্রমাগত পুনরুৎপাদন হবে যদিও শক্তির আদান প্রদান করে কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকা এড়ানো যাবে না।" (ঐ পৃষ্ঠা ৯৬)।

পরিমণ্ডলের গুণগত অবনতির জন্য যে সকল বুর্জোয়া পণ্ডিতরা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের আজকের স্তরকেই কেবলমাত্র দোষ দেন, তাঁরা বাস্তব্য সমস্যার সামনে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা যে এক নয় সেই বস্তুবাদী দিকটা থেকে আমাদের নজর সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তাঁরা একটা ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন যে, ঠিক একই ভাবে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রভেদটা "মুছে" যাচ্ছে, অনেক কম প্রকট হয়ে পড়ছে, এবং সমগ্র দুনিয়া ধরে যে বাস্তব্য শক্তি-সংক্রান্ত ইত্যাদি সমস্যাবলী রয়েছে সেগুলো প্রযুক্তির দিক থেকেই বিচার করতে হবে।

পরিমণ্ডল সম্পর্কে যে সকল বুর্জোয়া লেখকরা আছেন তার মধ্যে আমেরিকান ভবিষ্যৎ-তত্ত্ববিদ[২৯] এ. টোফ্লারের বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। তাঁর সর্বশেষ বইয়েতে তিনি একটা শব্দ চয়ন করেছেন, "বাস্তব্য-স্পন্দন" (eco-spasm) বলে। তিনি বোঝাচ্ছেন, "বাস্তব্য-স্পন্দন অথবা স্বতঃস্ফূর্ত আর্থনীতিক ব্যবস্থা (spasmodic economy) হচ্ছে এমন একটা অর্থনীতি যেটা ধ্বংসের একেবারে কিনারাতে এসে দাঁড়িয়েছে, অপেক্ষা করছে কেবলমাত্র কয়েকটি এলোমেলো সংকটজনক পরিস্থিতির একই সময়ে উদ্ভব হওয়া যেটা এ পর্যন্ত হয় নি," (অর্থাৎ, তাহলেই সব ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়বে—অনুবাদক)।

টোফ্লারের মতে বাস্তব্য সংকট ধনতন্ত্রের "বৃদ্ধির যন্ত্রণা"-র একটি লক্ষণ

২৯. Futurologist, যেমন Archaeologist-কে আমরা বলে থাকি পুরাতত্ত্ববিদ—অনুবাদক।

মাজ, শিল্পায়ন থেকে উদ্ভূত সাধারণ সংকট, যেটা আমাদের শক্তির ভিত্তিকে, আমাদের মূল্যবোধকে, পারিবারিক ব্যবস্থাকে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থাকে, আমাদের দেশ-কালের ধারণাকে, প্রমাতত্ত্বকে এবং আমাদের অর্থনীতিকে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। মোদ্দা যেটা দাঁড়াচ্ছে, তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়, সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রহে শিল্পায়ন থেকে উদ্ভূত সভ্যতার ভাঙন এবং প্রথম একেবারে নতুন ও নাটকীয়ভাবে ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার টুকরো টুকরো আবির্ভাব: একটা অত্যধিক শিল্পায়িত সভ্যতা যেটা প্রযুক্তিগত কিন্তু আর শিল্পগত নয়।" (A Toffler, The Eco-spasm Report, New york ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৩)।

টোফ্লার বাস্তব্য সংকট থেকে বেরোবার পথ খুঁজছেন ধনতন্ত্রকে আরও উচ্চ-পর্যায়ে "অতি-শিল্পায়িত" স্তরে নিয়ে গিয়ে, কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নয়, যেটা হলেই একমাত্র প্রকৃতির প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারতো। ধনতন্ত্রের অবস্থাতে মালিকের মুনাফা লোটবার তাগিদেই প্রকৃতির সম্পদকে যেভাবে ব্যবহার করা হয় তার দ্বারাই প্রকৃতি সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হবে তা স্থির করা হয়। অবাক হবার কিছু নেই যে, আমাদের গ্রহের বাস্তব্য অবস্থার দিক থেকে যেগুলো সংকটজনক এলাকা রয়েছে সেগুলো বেশির ভাগই হচ্ছে সেইসকল এলাকা যেখানে ধনতন্ত্র শক্তি সঞ্চয় করেছে।

এঙ্গেলসের সময়ে তিনি যেভাবে লণ্ডন, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ও অন্যান্য শহরের শ্রমজীবী জনসাধারণের কাজ করার ও বাসস্থানের বর্ণনা দিয়ে গেছেন, সেই বিশ্লেষণগুলো মনে করলেই চলবে। ময়লা নিষ্কাশনের, ভালো সড়কের এবং ফ্যাক্টরিগুলোতে নির্মল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার অভাবের দিকে এঙ্গেলস আমাদের নজর টেনেছেন, দেখিয়েছেন ধোঁয়া ও বাড়ীর ময়লা থেকে নির্গত দূষিত বায়ুর ফলে আবহমণ্ডল দূষিত হয়ে যাচ্ছে, নির্মল জল যোগানের কোনো ব্যবস্থা নেই, এবং যাবতীয় নোংরা জিনিসে জল দূষিত হয়ে

যাচ্ছে। এক কথায়, এংগেলস পরিবর্তন সমস্যার শ্রেণীগত চরিত্রের দিকটা তুলে ধরেছেন ; শহরে ও তার এলাকাতে কয়েক দশক ধরে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠার সংগে সংগে বাস্তব্য ব্যবস্থার দিক থেকে সংকটজনক এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে।

বাস্তব্য সংকটের স্থির বিকাশ ও তাকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবার কারণগুলো তুলে ধরেছেন মার্কস, এংগেলস ও লেনিন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে অনড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেছে সেদিকে নজর টেনে লেনিন দেখিয়েছেন, অতিরিক্ত মুনাফা লোটবার তাগিদে প্রযুক্তির দিক থেকে আধুনিকীকরণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করে সাম্রাজ্যবাদ। তবে তিনি আরও দেখিয়েছেন :

"যেহেতু একচেটিয়া ভাবে দর ঠিক করে দেওয়া হয়, এমন কি সামরিক ভাবে হলেও, প্রগতির প্রযুক্তির দিকটা, ফলে অন্যান্য দিকটাও বেশ খানিকটা হারিয়ে যায় এবং এর ফলে আর্থনীতিক সম্ভাবনা দেখা দেয় যাতে প্রযুক্তিগত উন্নতিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যাহত করা হয়।" (Lenin Collected works, Vol, ২২, পৃষ্ঠা ২৭৬)।

প্রকৃতিকে ব্যবহার করা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির দিক থেকে অগ্রসর হওয়া ব্যাহত হওয়াতে ধনতান্ত্রিক জগতকে কয়েক দশক ধরে প্রায় যেন কারুর অজান্তে একটা বাস্তব্য সংকটের মধ্যে এনে ফেলেছে আর সেটার সমাধান হতে পারে একমাত্র গোটাকয়েক অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিয়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তব্য সংকট বিশেষভাবে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, যেটা আজকে জগৎজুড়ে যে দূষিতকরণ চলেছে তার জন্য দায়ী। আমেরিকান বিজ্ঞানীদেরই মতানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক তার পাল্টা একজন ভারতীয় নাগরিকের তুলনায় ৫০ গুণ বেশি পরিমণ্ডলের ক্ষতি করে। (The Economics of Environmental Pollution by D. Thompson, Cambridge, 1978, পৃষ্ঠা ৪—৫)

ষাট দশকের শেষের এবং সত্তর দশকের গোড়ার দিকে আমেরিকার জনসাধারণ ব্যাপক অংশ পরিমণ্ডলের সমস্যাকে দেখতে লাগলো যেন একটা "জাতীয় সংকট দেখা দিয়েছে এই রকমের মনোভাব নিয়ে। পরিমণ্ডলের পাদার্থগত উপাদানগুলো লক্ষণীয় ভাবে বদল হওয়ার জন্য একই সময়ে এ বোঝা গেল যে, বেশির ভাগ আমেরিকান নাগরিক জীবনগুলের কেন গুণগত ভাবে অবক্ষয় হচ্ছে এবং সেটা ঘটার প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে সামাজিক-আর্থনীতিক। আমেরিকাতে পরিমণ্ডল নিয়ে আন্দোলনের পরিধি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, গাস্ হল্, বলেছেন : "দূষিতকরণের বিরুদ্ধে যে বহু লক্ষ জনসাধারণ সংগ্রামে নিযুক্ত তারা কিন্তু এখনও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে প্রস্তুত নয়।" "(Ecology, can We Survive Under Capitalism ? by Gus Hall, New York, 1972, পৃষ্ঠা ১৩)।

এটা নিশ্চয়ই বলতে হবে যে, পরিমণ্ডল নিয়ে যাঁরা প্রায় ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে (ক্রুসেডের মনোভাব নিয়ে) লড়ে যাচ্ছেন তাঁরা ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছেন যে, "বিশেষ করে মার্কিন দেশে এবং দুনিয়ার নাগরিক-শিল্প সমৃদ্ধ এলাকাগুলো সাধারণভাবে আমাদের এই গ্রহের সংকটের জন্য দায়ী।" (J. Manners M. Mikesell, editors, Perspectives on the Environment, Washington 1974, পৃষ্ঠা ৮)।

তবে সমস্যাটার বৈজ্ঞানিক আর্থনীতিক ও দার্শনিক দিকটার সম্যক বিচার না করে তাঁরা এই সময়ের বাঁধাধরা প্রচার ও চালু ধারণা (যেমন "আমাদের পৃথিবী একটি মহাকাশযান", কাঁচা ও ফেলে-দেওয়া বস্তুকে আবার কি করে পুনরুদ্ধার করা যায় এবং সমাজের বাস্তব প্রয়োজনগুলোকে পরিবর্তন সাধন করা ও জীবনযাত্রাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো এবং শেষ অবধি অগ্রসর পুনরুৎপাদন (expanded reproduction—···নং নোট দেখুন) না করে

"শূন্য বৃদ্ধি"[৩০] অবস্থায় পৌঁছানো, যার ফলে অবশ্য কড়াকড়ি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

অন্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও এই ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠেছে। যেমন ব্রিটেনে, ১৯৭৩ সালের ২৩-শে মে জনসংখ্যা দিবস বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। অনেকগুলো গ্রুপ এটাকে চালু করেছিল : জন্মনিয়ন্ত্রণ অভিযান দিন ঘনিয়ে আসার বিরুদ্ধে অভিযান, ডাক্তার ও অধিক সংখ্যক জনসংখ্যার গ্রুপ, জনসংখ্যাকে সীমিত করা ও পরিবার নিয়ন্ত্রণকে সুস্থির অবস্থায় আনা, আর বহুদিনের পরম্পরা দিয়ে পৃথিবীর বন্ধু গ্রুপ। জনসংখ্যার দিবস নিয়ে প্রস্তুতি একটা সারা দেশব্যাপী চরিত্র নেয়। তাদের মধ্যে পার্লামেন্টের সভ্যরা এবং আঞ্চলিক কর্তারাও ছিলেন। জনগণের জন্য প্রচারের মাধ্যম-গুলোর ব্যবহার হয়েছিল বেশ ব্যাপকভাবে।

ফ্রান্সে প্রধান মন্ত্রীর উদ্যোগে ১৯৬৯ সালে "১০০-টি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে" বলে, একটা জাতীয় অভিযান হয়েছিল। এই অভিযান চলাকালে গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্টগুলো ও মন্ত্রীসভাগুলো, জনগণের (প্লাবিক) প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষরা, পরিমণ্ডল রক্ষার্থে ৩৬০০-র অধিক নানারকমের পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রস্তাব রাখেন।

সাধারণত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে গভর্নমেন্টে পরিমণ্ডল রক্ষার্থে হাতে-কলমে যে ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে সেটা জনগণের ব্যাপক দাবি থেকে আসে। এইমতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশে পরিমণ্ডলের সমস্যাকে "জরুরী অবস্থার উপযোগী" জাতীয় প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে। এই প্রোগ্রামগুলোকে কার্যে পরিণত করা হয় একটা বিশেষ আবেগপূর্ণ আবহাওয়াতে যাতে সমস্যাটাকে "জাতীয় লক্ষ্য" ও "জাতির পক্ষে অগ্রাধিকার" দিয়ে উঁচু পর্যায়ে রাখা যায়।

---

৩০. অর্থাৎ, প্রয়োজনের একটা মাপ ঠিক করে তার চেয়ে বেশি উৎপাদন না করা —অনুবাদক।

পরিমণ্ডল সংক্রান্ত নানা রকমের প্রোগ্রামের মধ্যে এর সাফল্য নির্ভর করে কতো টাকা এর পেছনে খরচ করা সম্ভব, কতো পরিমাণে বাস্তব সম্পদকে এর জন্য কাজে লাগানো যায়। জাতীয় স্তরে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা কি আছে এবং বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোও কতোখানি চেষ্টা করে। ১৯৭০ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক অনেক বাধা পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করেছে।

পরিমণ্ডল সমস্যার প্রযুক্তিগত জটিলতার জন্য এবং তার সুরাহা করার জন্য মোটা টাকার প্রয়োজনীয়তা ও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৬০ দশকের শেষের দিকের সুরু থেকে বড়ো বড়ো আমেরিকান যৌথ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো (করপোরেশানগুলো) পরিমণ্ডল সংক্রান্ত পলিসি তৈরি করার জন্য গভর্নমেন্টের প্রশাসনিক বিভাগ ও ব্যবস্থাগুলোকে যোগাবার চেষ্টা করে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্ররা ঘোষণা করেন : "পরিমণ্ডল নিয়ে জাতীয় পলিসি না-থাকার জন্য এটা ব্যবসায়িক মণ্ডলীর কাছে তথা সমগ্র জাতির কাছেই অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" ব্যবসায়িক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জোর দিতে লাগলেন যাতে প্রশাসনিক বিভাগগুলো এই সমস্যার সমাধানের জন্য হাত লাগিয়ে, গুণগত মান কি হবে সেটা ঠিক করে দেয়, এবং পরিমণ্ডল রক্ষার্থে সব রকমের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ করে দেয়।

বড়ো বড়ো ব্যবসায়িক পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠানগুলো (বিগ্‌ বিজনেস্‌) পরিমণ্ডলের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট যাতে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নেয়, সেজন্য চেষ্টা করছে। তাদের এই প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে যোগাযোগ দেখিয়ে দেয় যে, সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব থেকে প্রধান যে সকল সমস্যাগুলো উদ্ভূত হচ্ছে, সেগুলো ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।

রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক জগতের মধ্যে "বাস্তব্য-শিল্প"[৩১] (eco-industrial) সংক্রান্ত ধারণাতে পরিমণ্ডল ও প্রকৃতির সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহার সম্পর্কে আমার প্রদানের নতুন সংগঠনিক চেহারা দেখা যাচ্ছে।

আমেরিকার ব্যবসায়ীদের সামনে কি সম্ভাবনা আছে সেটা একটা বক্তৃতাতে টমসন, রামো, ওলড্রিজ ইনক্‌ (কোম্পানির) ভাইস চেয়ারম্যান, সাইমন রামো স্বীকার করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে বিশেষ করে ভাববার বিষয় হচ্ছে : জনসংখ্যার মাথাপিছু উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে মৌলিক দ্রব্যাদি উৎপন্ন করতে যে ক্যয়রাক্‌ দেখা যাচ্ছে, যে পরিমণ্ডলের দূষিতককণ হচ্ছে, এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির দ্রুত হারের সংগে তাল রেখে সে সামাজিক ব্যবস্থা চলতে পারছে না।

রামোর মতে শহরাঞ্চলের গঠন করা, পরিমণ্ডলের দূষিতকরণ না করে তার বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে গিয়ে সামাজিক-প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রাজনৈতিক আর মুশকিলের সামনে পড়তে হবে। তিনি মনে করেন এই সমস্যাগুলোই আগামী বিশ বছরে এ পথ কি ও পথ নেওয়া হবে সম্পদরাজিকে কি ভাবে বণ্টন করা হবে এবং প্রযুক্তিকে কি ভাবে লাগানো হবে সে সম্পর্কে বিরাট প্রভাব বিস্তার করবে।

বড়ো ব্যবসায়ীরা যে বহুলাংশে গভর্নমেন্টের সমর্থনের ওপরে নির্ভর করে সেটা জেনে রামো চেষ্টা করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাবিক ও প্রশাসন বিভাগ যাতে ঘোষিত জাতীয় প্রোগ্রামগুলোতে যার পেছনে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে, তাতে গ্যারান্টি দেয়, তা হলে বড়ো ব্যবসায়ীরা ভেলকি খেলিয়ে দেবে, যার মধ্যে আমেরিকাতে সুষ্ঠু পরিমণ্ডল বজায় রাখার ব্যবস্থাও থাকবে।

---

৩১. অর্থাৎ যে সকল শিল্প গড়ে উঠলে এবং কাজ সুরু করলে পরিমণ্ডলের বাস্তব্য অবস্থাকে ব্যাহত করতে পারে—অনুবাদক।

তিনি বলেছেন, "এক দশক আগে তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা এক দশকের মধ্যেই চাঁদে মানুষ পাঠাবার জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করবেন। মনে করা যাক যে, আজকের প্রেসিডেণ্ট এই দশকের জন্য সেই রকমের একটা সাহসী পরিকল্পনা রাখলো, যাতে বলা হল ; সত্তর দশক শেষ হবার পূর্বেই আমরা বৃহৎ লোকগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলবো। ...এই পরিকল্পনাটি আরও ব্যাপক ও মুশকিলও বেশি। আমরা এবারে বর্তমান পথিকৃতের কাজ করার কথা ভাবছি, তখন কেবল প্রযুক্তি সম্পর্কেই ভাবছি না, আমরা বুঝতে চাই সামাজিক ও আর্থনীতিক বিকাশ সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্যে পেঁছতে পরিমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কি করতে হবে? কিন্তু এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার জন্য নিযুক্ত হয়ে দূষিতকরণকে নিবারণার্থে আমাদের প্রযুক্তি দুনিয়াতে নেতৃত্ব দেবে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের দিক থেকে মৌলিক পরিবর্তনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে অনেক ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, জানুয়ারি ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট তার যুক্তরাষ্টের প্রতি রাষ্ট্রীয় বাণী দিতে গিয়ে বলেছেন, "নতুন আমেরিকান বিপ্লবের "তৃতীয় লক্ষ্য" হচ্ছে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করা। বড়ো ব্যবসায়ীর স্বার্থের জন্যই কিন্তু বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটা আগস্ট, ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আমেরিকানদের পরিমণ্ডলের ব্যাপারে কোনো ভেলকিবাজির আশা না করতে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে এটা সরকারী ভাবে মেনে নিয়েছেন। ঐ বছরের শেষের দিকে সেপ্টেম্বরে ধনিকদের প্রতিনিধিদের সামনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, "পরিমণ্ডল সম্পর্কে মাথাব্যথা দেখাতে গিয়ে সেটাকে এমন মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিয়ে করা হয় যাতে ব্যবস্থাটাকেই যেন গোড়া থেকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয়।

আর্থনীতিক অসুবিধা যতো বাড়ছে কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশের

গভর্নমেন্ট অতো বেশি পরিমণ্ডল সম্পর্কে আইন পাস করাকে দেরি করছে। তার প্রধান কারণ যাতে বড়ো ব্যবসায়ীদের ক্ষতি না হয়।

পরিমণ্ডলের গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর আইনের বিশ্লেষণ করলে এবং এই ব্যাপারে গভর্নমেন্টের মুখপাত্রদের উক্তিগুলোর মেজাজ বা সুরকে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, আর্থনীতিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের আগেকার পরিমণ্ডল রক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলোকে খানিকটা আলগা করে দিতে চাইছে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াতে নতুন নিয়ন্ত্রণগুলো আনতে এবং হাতের কাছে যে প্রযুক্তিগুলো লাগানো যায় তাকে প্রয়োগ করতে দেরি করছে— প্রথমেই মোটরযান সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকে রদ করেছেন; পরিমণ্ডলের ক্ষতি সাধনকে বন্ধ করতে হলে অর্থনীতির মৌলিক উন্নতি সাধন করতে হবে। প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড যেমন বলেছেন, মোটরযান থেকে নির্গত দূষিত ধোঁয়াকে বন্ধ করতে হলে এবং পরিষ্কার বায়ুর যোগানোর জন্য সংশোধিত আইনকে প্রয়োগ করতে দেরি করার কারণ হচ্ছে যে, আমরা বুঝতে পেরেছি যে, "পরিমণ্ডল সংক্রান্ত এবং আমাদের শক্তি ও আর্থনীতিক লক্ষ্যগুলোকে সব একসঙ্গে করে ফেলা সম্ভব নয়।"

ইতিমধ্যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে পরিমণ্ডলের সমস্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে এবং জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনের জন্য ইদানীং কালের সকল প্রার্থীই তাঁদের নির্বাচনী অভিযানে পরিমণ্ডলের প্রোগ্রামকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৬৮ সালের নির্বাচনী অভিযানে সিনেট সদস্য, এডমণ্ড মাস্কি ও জর্জ ম্যাকগভার্ন, জনসাধারণের পরিমণ্ডলের ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তাকে প্রতিফলিত করে জলবায়ু ও আবহাওয়া, দুই ক্ষেত্রেই প্রকৃতিকে রক্ষা করার প্রোগ্রাম গ্রহণ করার কথা বলেছেন। এর পরে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান উভয় পার্টি থেকেই তাদের নির্বাচনী মঞ্চে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ কয়েকটি পয়েন্ট যোগ করার কথা বলেছেন। ১৯৭৬

দাদের নির্বাচনী দফে ডেমোক্রাটিক পার্টি দাবি করেছে যে, পরিমণ্ডলের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে তারা যে প্রতিশ্রুতি তার প্রমাণ হচ্ছে যে, তাদের পরিমণ্ডল রক্ষা করা কেবলমাত্র একটা সৌন্দর্যের জন্য ব্যক্তিক লক্ষ্য নয়। ন্যায়সংগত সমাজ স্থাপনের জন্যও এটা অপরিহার্য।

কংগ্রেসের মারফত ডেমোক্রাটিক পার্টি পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য একটা ব্যাপক প্রোগ্রাম নিতে উদ্যোগ নিয়েছিল। নির্বাচনী দলিলে বলা হয়েছে, আট বছর এই প্রোগ্রামকে কাজে লাগাতে যে প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, সেটা প্রশাসন বানচাল করে দিয়েছে এই ভিত্তিহীন যুক্তির অজুহাতে যে অর্থনৈতিক বিকাশ ও পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যবস্থাকে নাকি মেলানো সম্ভব নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের কাছে পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যবস্থাটা একটা প্রধান জাতীয় সমস্যা হয়ে উত্তরোত্তর অন্য পাঁচটা সমস্যার মধ্যে বিশেষ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। বাজেটের দর্শকে প্রধান কোন্ কোন্ কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এ সম্পর্কে পরিকল্পনার জন্য যে জাতীয় সংস্থা আছে তাতে পরিমণ্ডলের ব্যবস্থার জন্য ফেডারেল গভর্নমেন্টের দিক থেকে কতো টাকা বরাদ্দ করা হবে সে সম্পর্কে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে, "যে ভাবেই বিচার করা হোক না কেন, পরিমণ্ডলের গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থাদি সকলের সমর্থন পাবার মতো একটা প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।" ১৯৭৩ সালের গোড়াতে হ্যারিস গণভোট (poll)-এর ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তই দাঁড়ায় : মোট ভোটদাতাদের (যারা মতামত দিয়েছেন) দুই তৃতীয়াংশ মনে করেন, ফেডারেল গভর্নমেন্টের টাকার বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

রক্তিসমন্ড, হেডট্রিটস্ [illegible] ১৯৭০ সালের [illegible] বাজেট অনুসারে জাতীয় স্তরে কি ধারণা দেওয়া হয়েছে সম্পর্কে [illegible] পরিমণ্ডল [illegible] ব্যবহার করে যে পার্লামেন্টের [illegible] সেটা বাঁধ,

ফেডারেল গভর্নমেন্টের পক্ষে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ কি ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সকল স্কলারদের (যারা পড়াশুনা করছেন) সামনে বিশেষ অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল বায়ুর ও জলের গুণগত মান ঠিক করে দেওয়া। এই সমস্যার সমাধানের তারা দুটো পথ দেখতে পায়: প্রথম, দূষিতকরণ কতোটুকু করা যাবে তার নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া যেটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে মানতে হবে, এবং দ্বিতীয় দূষিতকরণ হলে তার জন্য নানা রকমের ফাইন দিতে হবে।

ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট ও এজেন্সিদের প্রস্তাবিত ১৪৪-টি প্রধান পরিকল্পনাগুলোকে ম্যানেজমেন্ট ও বাজেট সংক্রান্ত অফিস বিচার করে দেখার পরে তারা ১৯৭৩ সালের শেষে পরের কয়েক বছরের জন্য কার কার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করতে হবে (অর্থাৎ অগ্রাধিকার দিতে হবে) সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের কাছে সম্মতির জন্য পেশ করে; তার মধ্যে জল ও বায়ুর গুণগত মান ঠিক করার জন্য ১৭-টি পরিকল্পনাকে ধরা হয় দূষিতকরণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য টেকনিকের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে কোনো না কোনো ভাবে ব্যবহার করার নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মগুলোকে চালু করার ব্যবস্থা করা হয়।

এটা করার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। সত্তর দশকের শুরুতে পরিমণ্ডলে নানা রকমের ময়লা জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় ৫-৭ গুণ বেশি বেড়ে যাচ্ছিল। সত্তর দশকের মাঝামাঝি কঠিন পদার্থের ময়লা প্রতি বছর জমছিল ৩৫০ কোটি টন (কৃষিক্ষেত্রে ছিল ২০০ কোটি, শিল্পতে ১০০ কোটি এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য বিষয়গুলোতে ছিল ৫০ কোটি টন ময়লা)। তাছাড়া, ২০০ কোটি টন ময়লার মধ্যে (যাঁরা দূষিতকরণ করে) শতকরা ৪০ ভাগ আসছিল মোটর গাড়ী থেকে, যেটা প্রতি বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিমণ্ডলকে দূষিত করছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল বিজ্ঞান একাডেমির হিসেব অনুসারে সত্তর দশকের গোড়ার দিকেই প্রতি বছরে ৪,০০০ আমেরিকান নাগরিক মোটর গাড়ী থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস ইত্যাদি থেকে মারা যাচ্ছিল,

এবং তা থেকে যা অসুখবিসুখ হচ্ছিল তা থেকে প্রতি বছরে ৪০ লক্ষ কাজের ঘণ্টা নষ্ট হচ্ছিল এবং প্রতি বছরে ১৬০০ কোটি ডলার বা জনসংখ্যার মাথা-পিছু ৮০ ডলার এর সম্পত্তির ক্ষতি হচ্ছিল।

ইউ. এস্. নিউজ এণ্ড ওয়ার্লর্ড রিপোর্টের যে হিসেব প্রকাশ করা হয় সেটা পুরোপুরি হিসেবের মধ্যে ধরলে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতির পরিমাণ কতো সেটা বোঝা যাবে। পরের দশ বছরে (১৯৭৩ থেকে শুরু করে) পরিমণ্ডল রক্ষার্থে ব্যবস্থাপনের জন্য মোট খরচের হিসেব দাঁড়াচ্ছে ২৮,৪০০ কোটি ডলার। বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণের বিরুদ্ধে প্রধান যেটা খরচের খতিয়ান সেটা হল; ১১,৩০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ফেডারেল বাজেট যে টাকাটা ধার্য করা হয়েছে তার পরিমাণ হল ৮০০ কোটি ডলার; ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে খরচ করা হবে, যার মধ্যে গাড়ী থেকে দূষিত পদার্থের ব্যাপারটা ধরা হয়েছে ৬,৫০০ কোটি ডলার আর শিল্প থেকে নির্গত ময়লা, যেমন ধোঁয়া ও ধুলোর পরিমাণ কমাবার জন্য ব্যবস্থাপনাতে ৪০০০ কোটি ডলার খরচ করা হবে— জলকে দূষিতকরণ বন্ধ করার জন্য খরচের পরিমাণ দাঁড়াবে ১২,৬০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ফেডারাল বাজেটের খরচ হবে ৪০০০ কোটি ডলার অংগ-রাজ্যদের ও স্থানীয় জনসংখ্যার জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ৩,৬০০ কোটি ডলার এবং এর মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রের খরচও ধরা আছে। একই সঙ্গে দেখানো হয়েছে, নির্মাণকার্যের শিল্পগুলোতে ন্যূনপক্ষে ৩,০০০ কোটি ডলারের কম খরচ করা হবে না, জনসাধারণের সেবার জন্য ব্যবস্থাপনার মালিকদের খরচ করতে হবে ১,২০০ কোটি ডলার এবং শক্তি উৎপাদনকারী, বাড়ী নির্মাণের দামগুলো এবং জাহাজ চালাবার কোম্পানিগুলোকে খরচ করতে হবে ৮,০০ কোটি ডলার। কঠিন দূষিত পদার্থগুলোকে কণ্ট্রোল করার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হবে তাতে খরচ পড়বে ৩,৫০০ কোটি ডলার এবং জোরালো আওয়াজ তেজোবিকীরণ ও অন্যান্য ধরনের দূষিতকরণ নিবারণের জন্য খরচ পড়বে ১,০০০ কোটি ডলার।

পরিমণ্ডলের গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য কাউনসিলের ভবিষ্যতের হিসেবটা অপেক্ষাকৃত কম ; তাদের হিসেব অনুসারে দশ বছরে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮২-এর মধ্যে পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে ফেডারেল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে খরচ পড়বে ১১,৫০০ কোটি ডলার।

১৯৭০ সাল থেকে কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের বাণীর মধ্যে পরিমণ্ডলের অবস্থাটা বর্ণনা করা প্রতি বছর রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো না কোনো ভাবে প্রেসিডেন্টের কংগ্রেসের প্রতি দলিলগুলোতে এই সমস্যার প্রতিফলন পাওয়া যায়। আমরা যদি কংগ্রেসের কার্যকলাপের দিকে তাকাই তাহলে সেখানেও দেখবো প্রতি বছরই ডিবেটগুলোতে ও আইন তৈরি করার জন্য কাজকর্মে একেবারে নতুন সমস্যাগুলোকে তুলে ধরা হচ্ছে। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে এই ব্যাপারে কংগ্রেস তার আগেকার পাস-করা আইনগুলোকে প্রায় সবগুলোই সংশোধন করেছে এবং নতুন আইন পাস করেছে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার চারিত্রিক চেহারার মধ্যে যেভাবে একে দেখতে হবে তাকে খানিকটা সাজিয়ে ধরার চেষ্টা করেছে।

জাতীয় পরিমণ্ডল সংক্রান্ত আইনের যে প্রধান দলিল তাতে ঘোষণা করা হচ্ছে পরিমণ্ডলের গুণাগুণকে রক্ষা করতে হলে কি কি করতে হবে এবং এর লক্ষ্য সাধনের জন্য কয়েকটি কি ধরনের শাসনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এই পলিসিতে বলা হচ্ছে; চেষ্টা করতে হবে "যাতে মানুষ ও প্রকৃতি উৎপাদনের সংগতি বজায় রেখে চলতে পারে এমন অবস্থার সৃষ্টি ও রক্ষা করতে হবে। "জীবমণ্ডলের ওপরে ক্ষতিকারক প্রভাবকে সীমিত করার চেষ্টা করতে হবে এবং বাস্তব্য-ব্যবস্থাতে ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে রিসার্চের ব্যবস্থা করতে হবে। এই আইনের আওতায় প্রায়োগিক কাজের মাধ্যমে যাতে আমেরিকার বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য জীবমণ্ডলের গুণাগুণ ঠিকমতো বজায় থাকে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে ; পরিমণ্ডলের ক্ষতি না করে যাতে আর্থনীতিক কার্যকলাপ চালানো যায় ; ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক

প্রাচীন নিদর্শনগুলোকে এবং প্রকৃতিকে তার সব রকমের বৈচিত্র্য নিয়ে যাতে রক্ষা করা যায়; জনসংখ্যার বৃদ্ধির সমতা যাতে রক্ষা করতে পারা যায়; প্রাকৃতিক সম্পদকে যাতে যুক্তিসম্মত ব্যবহার এবং জীবনযাত্রার মানকে, যে সম্পদকে পুনরুদ্ধার করতে পারা যায় তার গুণাগুণকে উন্নত করতে এবং যে সম্পদ ফেরৎ পাওয়া সম্ভব নয় তাকে যথাসম্ভব পুনরায় কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করতে যাতে পারা যায়।

আইনগত দলিল পত্রাদি রচনা করতে গিয়ে এবং প্রায়োগিক ব্যবস্থাবলী কি নেওয়া হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে ফেডারেল এজেন্সি ও ডিপার্টমেন্টগুলোকে প্রস্তাবিত আইনগুলোর ও ব্যবস্থাপনার প্রভাব পরিমণ্ডলের 'পরে কি পড়বে সেটা বাস্তব ক্ষেত্রে বিচার করে দেখতে হবে, তেমনি পরিমণ্ডলের পক্ষে ক্ষতিকারক যা কিছু এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তার জন্য বিল ও প্রস্তাবাদির সুপারিশ করতে হবে (যাতে ক্ষতি কম হয়—অনুবাদক) বিকল্প কি ব্যবস্থাবলী নেওয়া সম্ভব এবং ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ও স্বল্প-মেয়াদী কি ব্যবস্থাবলী নেওয়া সম্ভব তা-ও দেখতে হবে।

আইনের এই বিধি অনুসারে ফেডারাল এজেন্সি ও অন্য ডিপার্টমেন্টদের কাজকর্ম এমন ভাবে চালাতে হবে যাতে বিচার করতে হবে, পরিমণ্ডলের গুণগত অবস্থার কি সম্ভাব্য পরিবর্তন হতে পারে সারা ভূগোলক জুড়ে। যে সকল অঞ্চলে ঐ ধরনের কাজকর্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, সেখানে ফেডারাল এজেন্সিদের ও অন্য ডিপার্টমেন্টদের এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাপকতর করার জন্য উদ্যোগ ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

অবশ্যই যে আইনগুলো পাস করা হয়েছে তাদের কাজে পরিণত করতে হলে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির তরফ থেকে বাধা আসে তারা যাবড়ে যায় পাছে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান খরচ, যেটা জনসাধারণ চায়, তাতে প্রতিযোগিতার দিকটা কম পড়ে যায়। তাছাড়া, রেকর্ড হিসেবে দেখা যাচ্ছে

অনেক ক্ষেত্রেই তারা পরিমণ্ডলকে নষ্ট করার জন্য ইচ্ছা করে অনেক ফাইন ও ক্ষতি সহ্য করতে রাজি আছে, যার পরিবর্তে বাস্তব্য-ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে এবং প্রচলিত আইনগুলোর সর্তানুসারে উৎপাদনকে সুদূরপ্রসারীভাবে ঢেলে সাজানো তারা পছন্দ করে না। তাছাড়া কংগ্রেসের দ্বারা আইন পাস হওয়ার সময়ে তারা অনেক সময়ে তার বেশ আমূল সংশোধনী সাধন করে থাকে।

এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় আমেরিকাতে বাস্তব্য সমস্যা এতো তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, ফেডারাল গভর্নমেণ্টকে পরিমণ্ডল সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতেই হয়। কিন্তু যেহেতু এই সকল ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে চালু করতে হয় সেজন্য এগুলো প্রধানত শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই প্রধানত চালিত হয় এবং আংশিকভাবে একচেটিয়াদের কার্যকলাপকে। যারা পরিমণ্ডলকে দূষিত করার ব্যাপারে প্রধানত দোষী, তাদের রোধ করতে পারে এবং খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য কাঁচা মালের বেহিসাবীভাবে ব্যবহার করাকে বন্ধ করতে পারে।

পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য সাংগঠনিক ব্যবস্থাগুলো দেখতে যতোই চমকপ্রদ হোক না কেন এবং যতোটা জোরের সংগে তাদের চালু করা হবে বলে ঘোষণা করা হোক না কেন, বাস্তব কার্যক্ষেত্রে এগুলোকে প্রয়োগ করতে গিয়ে বিশেষ করে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে বাধা হয়ে কতকগুলি মুশকিল দেখা দিয়েছে। যেমন, ফোর্ড প্রতিষ্ঠান মোটর গাড়ির ইনজিন নির্মাণের জন্য একটা নির্দিষ্ট মান ঠিক করার ব্যাপারে ১৯৮২ সাল অবধি বিষয়টিকে স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। তারা বলেছে মোটর গাড়ী থেকে যে দূষিত পদার্থ নির্গত হয় তাকে বন্ধ করার ব্যবস্থা ১৯৮৫ সালের পূর্বে করা যাবে না এবং ১৯৮৭ সালের আগে শহরের রাস্তাগুলোতে ভারি মোটর গাড়ি চলার ব্যবস্থাকে বন্ধ করে শহরের আবহাওয়াকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের রিসার্চ বিভাগের একটিই বিশেষ রিপোর্টে বলা হচ্ছে, ১৯৭০ সালে

মোটর গাড়ী থেকে বায়ুমণ্ডল দূষিত করণ কমানোর জন্য ব্যবস্থা ১৯৭৫ সালের আগে চালু করা যাবে না, ব্যাপারটা নথিপত্রেই আটক আছে ঠিক তেমনি বায়ুমণ্ডলকে পরিষ্কার করার অন্যান্য ব্যবস্থারও একই অবস্থা।"

বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন যে, পরিমণ্ডল রক্ষার এজেন্সির সামনে দুটো জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। একটি হচ্ছে, বড়োশক্তি-উৎপাদনের (পাওয়ার স্টেশনের) ও শিল্প জোটের কাছে পরিমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাপনার পরে নির্ভর করা যায় না; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মোটরের ইনজিনের থেকে দূষিত পদার্থগুলো যা নির্গত হয় তাদের কোনো মান ঠিক করা এখনও সম্ভব হয়নি। একই সময়ে পরিমণ্ডল রক্ষার এজেন্সির কর্মাধ্যক্ষ রাসেল ট্রেন বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে বায়ুমণ্ডলের গুণগত বিশুদ্ধতা রক্ষিত হবে। ৩০শে মে, ১৯৭৫ সালে একটি সংবাদপত্রের কনকারন্সে তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশ বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার করার ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়েছে বটে তবে আরও অনেক কিছু করতে হবে।"

এজেনসি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মানচিত্র উক্ত কনকারন্সে দেখিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশের ২৪৭ টি পরীক্ষামূলক এলাকার মধ্যে ১৫৮-টি-তে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি পরিমণ্ডলের গুণগত মান রক্ষার ব্যাপারে যে মান নির্ধারণ করা হয়েছিল তা অন্তত একটি দূষিত পদার্থ নির্গত করে নষ্ট করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ট্রেন মনে করেন ১৯৭০ সালের তুলনায় বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই-অকসাইডের পরিমাণ কমে গেছে শতকরা ২৫ ভাগ এবং ভেসে-বেড়ানো দূষিত বস্তুর পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ। স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে দূষিতকরণ হয় সেটাও খানিকটা কমে গেছে যদিও কতোটা কমেছে সেটা মেপে ঠিক করা বেশ শক্ত, কারণ ট্রেনের মতানুসারে অনেক এলাকাতেই বায়ুমণ্ডলের গুণাগুণের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।

তাছাড়া যে আইনগুলো চালু রয়েছে সেগুলোর কয়েকটি ধারাও পালিত হচ্ছে না। বড়ো একচেটিয়ারা আইনের নানারকম ফাঁক বার করার চেষ্টা করে

যাতে দ্রব্য ব্যবসার দিক থেকে সঠিক উৎপাদন যেভাবে করতে হবে তার জন্য যা উন্নতি করা উচিত তা যাতে না করতে হয়। আগে যা বলা হয়েছে, তারা প্রায়ই দূষিতকরণ যাতে হয় সেরকম উৎপাদন ব্যবস্থাকে না পাল্টে বরং মোটা ফাইন দিতে রাজি আছে। পরিমণ্ডল রক্ষার এজেন্সি কয়েকটি বড়ো বড়ো কর্পোরেশনকে পরিমণ্ডলের গুণগত মানকে নষ্ট করার জন্য আদালতের সামনে হাজির করেছে কিন্তু আদালতের এই কেসগুলো চলে বড়ো ধীরে ধীরে এবং একচেটিয়া স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচারক-কর্তৃপক্ষরা তাদের খালাস করে দেন।

বায়ুমণ্ডলের গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য আইন করে যা কয়েকটি আমেরিকান শহরের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তাতে দেখা যায়, গ্যাসোলিন (পেট্রোল-জাতীয়) বস্তু বা মোটরের ব্যবহারই একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

জানুয়ারি ১৯৭৫ সালের রাষ্ট্রের প্রতি বাণী-তে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট 'পরিষ্কার বায়ু' রাখার জন্য আইন করার সুপারিশ করেছিলেন যাতে পরিমণ্ডল ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী-শিল্প-গোষ্ঠীর স্বার্থও রক্ষিত হয়। তিনি সারা দেশ জুড়ে যে দূষিত পদার্থগুলো নির্গত হয় তারও ব্যবস্থা করার কথা বলেন।

এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে হবে যে, বৃহৎ একচেটিয়াদের বাধা এবং পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থাপত্র ধীরে ধীরে চালু করলেও এই ব্যাপারে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন (সর্বক্ষেত্রে না হলেও) আস্তে আস্তে প্রভাব বিস্তার করছে। আমেরিকান হ্রদ ও অন্যান্য বিশিষ্ট সলিল-গুলোতে বায়ু ও জল যাতে দূষিত না হয় তার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে, যে সকল প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার সাফল্য দেখা যাচ্ছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের গুণও রক্ষা, উন্নতির ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রবল জনমতের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে, যার পেছনে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সমর্থনও

রয়েছে। এর ফলে গভর্নমেন্টকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য বরাদ্দ করতে হচ্ছে এবং বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম চালু করতে হচ্ছে।

অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও একই চেহারা দেখা যায়। পরিমণ্ডলের গুণাগুণ লক্ষণীয়ভাবে নষ্ট হয়ে গেলে তাকে একটা জাতীয় বিপদ বলে গণ্য করা হবে। জনগণের প্রতিবাদের ফলে গভর্নমেন্টরা এখন প্রাথমিক কি কি কাজ করতে হবে তাকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছে এবং অবস্থাকে আবার ঠিক করে নেবার জন্য পরিমণ্ডলের সমস্যা যাতে প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে দেখা হয় তার ব্যবস্থা করছে।

১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ সরকার লোক্যাল (স্থানীয়) গভর্নমেন্টও রিজন্যাল (আঞ্চলিক) প্ল্যানিংয়ের জন্য একটি সেক্রেটারি অফ্ স্টেটের পদ সৃষ্টি করে তার হাতে ব্রিটেনের পরিমণ্ডল রক্ষার ভার অর্পণ করে এবং স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের সেক্রেটারি অফ্ স্টেটের হাতেও অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করে। পরিমণ্ডল ডিপার্টমেন্ট নামে একটি জাতীয় সংস্থা ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে, শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে যে বিভিন্ন ধরনের দূষিত-করণ শিল্প-করপোরেশনের কাছ থেকে হয়ে থাকে তাকে বন্ধ করার চেষ্টা করা। আর পরিমণ্ডল দূষিতকরণের বিরুদ্ধে একটি রয়াল কমিশন বসানো হয়। যারা পরিমণ্ডলের ব্যাপারে "বরাবরের মতো শিকারী কুকুরের" মতো (ওয়াচডগ্—অর্থাৎ তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে—অনুবাদক) চোখ রাখবে।

পরিমণ্ডলে যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য কয়েকটি বিশেষ আইন পাস করা হয়েছে আর তার প্রত্যক্ষ ফল ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে 'বিশুদ্ধ বায়ু সংক্রান্ত আইন' (ক্লিন এয়ার এ্যাক্ট) পাস করেছেন, তাতে প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে কাঁচা কয়লা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে লণ্ডনের বিখ্যাত ধোঁয়াশা[৩২] প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

---

৩২. ধোঁয়া ও কুয়াশা মিশিয়ে এক ধরনের কালো পর্দার মতো যা শহরকে ঢেকে

যে ধোঁয়াশার কথা আর্থার কনান ডয়েল তাঁর বিখ্যাত শার্লক হোমসের কাহিনীতে বর্ণনা করেছেন "কড়াইশুটির ঝোল" এর মতন। তবে দেশের অন্যত্র কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও সেটা হয়ে থাকে।

জাপানের আর্থনীতিক অবস্থাতে প্রতি বছর নানারকমের দূষিতকরণের জন্য প্রচুর ক্ষতি হয়ে থাকে। সরকারী হিসেব অনুসারে ১৯৬০ সালে পরিমণ্ডল দূষিতকরণের জন্য যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা প্রতি জনসংখ্যাতে ২০০০ ইয়েন (জাপানী মুদ্রা) থেকে বেড়ে ৪৫০০ হিয়েন হয়েছে এবং ১৯৭০ সালে ১৫,০০০ ইয়েনে দাঁড়াবে। মাছ ধরা জাপানের অন্যতম শিল্প, সেটা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে এই শিল্প থেকে মোট যা আয় হতো, যার মধ্যে মাছের চাষও ধরা হয়েছে, প্রতি বছরে ক্ষতি হয়েছে শতকরা ৬৭ ভাগ।

পরিমণ্ডল খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুন জনগণের কাছ থেকে চাপ খাওয়ার ফলে ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি গভর্নমেণ্ট প্রশাসনিক ও আইন পাস করে এটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করে। ফেডারাল গভর্নমেণ্টের এবং প্রোজেকটর ও করপোরেশনের দ্বারা ব্যবস্থাপনা নেওয়ার জন্য খরচ বেড়ে যায়। এই ব্যাপারে রিসার্চ অনেক বেশি করা শুরু হয়। এই সময়েই জলসম্পদকে দূষিতকরণ থেকে বাঁচাবার জন্য ১৯৫৮ সালে এবং ধোঁয়া ও ভুষিকয়লা যাতে নির্গত না হয় তার জন্য ১৯৬২ সালে আইন পাস করা হয়। ১৯৬৭ সালে পরিমণ্ডলকে দূষিতকরণ করা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মৌলিক আইন পাস করা হয়, তাতে রাষ্ট্রের, পৌরপ্রশাসনের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। বায়ু, জল প্রভৃতি কতখানি নষ্ট করা হবে, আওয়াজ কতো বেশি হবে এর জন্য একটা মান নির্ধারণ করার জন্য কর্মসূচী ঠিক করা হয়। গভর্নমেণ্ট এজেন্সিদের চালু করে দেওয়া হয়।

কেনে। ইংরেজিতে নামকরণ করা হয়েছে "smog", যা smoke ও fog এবং বাংলায় ধোঁয়া ও কুয়াশা মিলিয়ে হয়েছে ধোঁয়াশা—অনুবাদক।

কতোবার করে ন্যাশনাল কনফারেন্সগুলো ডাকা হবে এবং পরিমণ্ডল দূষিত-করণ যাতে নিয়ন্ত্রিত হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

মৌলিক এই আইন পাস করার ফলে পরিমণ্ডল দূষিত করণের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন আইন পাস করা হয়েছে তাতে দূষিত-করণের বিরুদ্ধে যে অভিযান ইত্যাদি চালানো হয় তাতে অনেক সময় যে মতভেদ দেখা যায় তার পদ্ধতি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭০ সালে রাষ্ট্রের পরিমণ্ডল সম্পর্কে যে ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি নেওয়া হয়েছে সেটাকে জাপানে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়। পার্লামেন্টের একটি বিশেষ অধিবেশনে তার আলোচনা করা হয় তাতে ১৪টি আইন পাস করা হয় এবং তাতে আবার সংশোধনী থাকে (মৌলিক আইনে সংশোধনী থাকে)।

১৯৫৬ সালে জাপানে স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ মন্ত্রীর দপ্তর পরিমণ্ডল দূষিত-করণের সমস্যা সম্পর্কে কাউন্সিল তৈরি করে, তাদের পরামর্শদাতার কাজও দেওয়া হয়। এর পরে প্রধান মন্ত্রীর কেবিনেট থেকে পরিমণ্ডল দূষিতকরণ সম্পর্কে একটা কনফারেনস্ ডাকার ব্যবস্থা করা হয়। এর প্রধান কাজ ছিল, প্রধান মন্ত্রীকে এই সকল ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করে রাখা, পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য বহুমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং সেগুলো যাতে কাজে পরিণত হয় তার জন্য ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। প্রধান মন্ত্রী এই কনফারন্সে সভাপতির পদ নেন আর স্থায়ীসভ্য হন প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা নিয়োজিত মন্ত্রীরা ও ডিপার্টমেন্টের প্রধানরা। ১৯৭১ সালে জাপানের একটা পরিমণ্ডল সংক্রান্ত এজেন্সিও ছিল।

জাপানে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত বরাদ্দ অংশটা বেড়েই যাচ্ছে এবং ১৯৭৫ সালে সমগ্র জাতীয় উৎপাদনের মোট পরিমাণের (**gross national production** বা **G. N. P.**) শতকরা ২৪ ভাগ হয়ে দাঁড়ায়। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য সমগ্র জাতিগত ব্যয়ের মধ্যে এটাই সর্বপেক্ষা বেশি।

পরিমণ্ডল এজেন্সির সরকারী দলিল 'জাপানের পরিমণ্ডল সম্পর্কে

দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের জন্য পরিমণ্ডলের গুণাগুণ যাতে বজায় থাকে তার হিসেব করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে ; দীর্ঘ মেয়াদী পরিমণ্ডল সংক্রান্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে ; আন্তর্জাতিকভাবে যতোগুলো ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাতে যোগ দিতে হবে এবং পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য খবরাখবর সরবরাহ এবং তাদের সংগ্রহ করতে হবে।

মন্ত্রীমণ্ডলীর বায়ুমণ্ডল রক্ষার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে ; তাতে আছে পরিমণ্ডলের ব্যবস্থা ; মাছ চাষ করার ব্যবস্থা ; জমি, বনসম্পদ ও প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা ; পরিকল্পনা ও রিসার্চের জন্য পলিসি ; জলসম্পদ ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ সমস্যা নিয়ে কাউন্সিল এবং পরিমণ্ডল সংক্রান্ত কাউন্সিল যেটা মন্ত্রীমণ্ডলীর অধীনে।

১৯৬৮ সালে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত বিষয়ে সুইডেনের গভর্নমেন্ট একটি পরামর্শদাতাসূচক কাউন্সিল (কনসালটেটিভ কাউন্সিল) তৈরি করে। রিসার্চ সংগঠনের, আঞ্চলিক গভর্নমেন্টের সংস্থাগুলোর, শিল্পসংক্রান্ত অফিস-গুলো। জনসংযোগ বিভাগ এবং গভর্ণমেন্টের মেসিনারির সংগে এই ডিপার্টমেন্টগুলোর যোগাযোগ আছে। কৃষিদপ্তরের মন্ত্রী তার চেয়ারম্যান। ১৯৬৭ সালে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য সুইডেনের যে ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হয়, তাদের কাজ ছিল বায়ুমণ্ডল ও জলকে দূষিতকরণ করা বন্ধ করা, প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করা এবং এই ব্যাপারে রিসার্চ চালিয়ে যাওয়া। কাউন্সিলকে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে পরিমণ্ডলকে ভালো করে অনুধাবন করে তাকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে আজকের অবস্থাতে যখন শিল্পের কাজ বেড়ে গেছে এবং নতুন বাসস্থান তৈরি করা হচ্ছে ইত্যাদি।

এই তথ্যগুলো থেকে বোঝা যায়, বেশির ভাগ ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে পরিমণ্ডলের সমস্যাকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ ধরনের আইনকানুন ও কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠন করা হচ্ছে এবং বিশেষ

বিশেষ আইনও এর জন্য পাস করা হচ্ছে। তেমনি উপযুক্ত আর্থনীতিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিধিতে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যায় এবং বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি গ্রুপ এগিয়ে কাজ করছে।

একই সঙ্গে এটাও বলা দরকার, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে পরিমণ্ডল রক্ষার প্রধান ভার নতুন ট্যাক্স চাপিয়ে মূল্য বৃদ্ধি করে। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে-ছাটাই ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে খেটে-খাওয়া জনসাধারণের 'পরে নতুন করে বোঝা চাপানো হচ্ছে।

পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে এমন কি কিছু বুর্জোয়া রাজনীতিবিদেরাও সঠিক ব্যাপারটার মূল্যায়ন করতে পেরেছেন। যেমন, পরিমণ্ডল-সংক্রান্ত লোকদের (environmenttalists) উদ্দেশ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য, রিচার্ড ওটিনংগার (নিউইয়র্কের ডেমোক্রাট পার্টির প্রতিনিধি) বলেছেন ; "পরিমণ্ডল পরিষ্কার করার জন্য গভর্নমেণ্ট টাকা যোগাবে না। যদি সেটা করা সম্ভবও হতো তাহলে নিশ্চয়ই সেটা আপনার বা আমার পকেট থেকেই আসতো।"

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক জরুরি জাতিগত স্বার্থকে বরবাদ করাই বাস্তব্য সমস্যা সম্পর্কে অবহিত না থাকার যুক্তিসম্মত পরিণতি। "নিকসন ও পরিমণ্ডল ধ্বংস করে দেবার রাজনীতি" শীর্ষক বইয়ের লেখকদের মতে "বেঁচে থাকার রাজনীতি দলগত আনুগত্যের সীমানাকে ছাড়িয়ে যাবে (অর্থাৎ এই ব্যাপারগুলো দলাদলির উর্ধে সর্বদলীয় রাজনীতির পর্যায়ে পড়ে যে অনুবাদক) এবং প্রতিটি সম্প্রদায়, দেশ ও যে জগতে আমরা বাস করি সে সম্পর্কে কি করা উচিত তা অবহিত করবে।"

খেটে-খাওয়া জনসাধারণের রোজকার বাস্তবমুখী সংগ্রামের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশগুলো ধনতন্ত্রের অধীনে পরিমণ্ডলের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক দিক সম্পর্কে বাস্তবসম্মত মনোভাব গ্রহণ করে এবং শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়বস্তু হিসেবে তাকে গণ্য করে।

বিশেষ করে আমেরিকান কমিউনিস্টরা বারবার দেখিয়েছে যে, পরিমণ্ডলের অবনতি ঘটবার জন্য প্রধান দোষী হচ্ছে শিল্পের বড়ো বড়ো করপোরেশনগুলো এবং তারাই প্রাকৃতিক সম্পদকেও ক্ষয় করে দিচ্ছে। অথচ এই করপোরেশন-গুলোই গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাতে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উন্নত করার প্রধান দায়িত্ব বর্তায় খেটে-খাওয়া জনসাধারণের পরে। বড়ো একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো 'বাস্তব্যচক্র' সম্পর্কে বা অন্যান্য ব্যাপারে সংকটগুলোকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে শ্রমজীবী মানুষদের আরও বেশি শোষণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট নেতারা বারবার দেখিয়েছেন, যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিমণ্ডল সংক্রান্ত আইনগুলোকে লংঘন করে তাদের জাতীয়করণ করতে হবে এবং করপোরেশনের মুনাফা থেকে দূষিতকরণ-বিরোধী কাজকর্মের জন্য যে টাকার দরকার তার জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাস করতে হবে। এই কাজের গুণাগুণের মান নির্ধারণ করার জন্য জনগণ যাতে তাতে তদারকি করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৯-৩০ জুন, ১৯৭৬ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিদের কনফারেন্সে পরিমণ্ডলের সমস্যা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছিল। ২৯-টা ইউরোপীয় দেশের প্রতিনিধিরা নোট (লক্ষ্য) করলেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে মৌলিক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে জনগণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের এবং ব্যাপক রাজনৈতিক ও জনগণের শক্তিসমূহ সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদের সংকট যে গভীরতর হয়েছে, সে সম্পর্কেও তারা একমত হয়েছিল। কনফারেন্সে গৃহীত দলিলে বলা হয়েছে ; "সাম্রাজ্যবাদে যে গাড্ডায় মধ্যে পড়েছে তার কারণ হচ্ছে ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট পূর্বোপেক্ষা গভীরতর হয়েছে, সেটা ধনতান্ত্রিক সমাজের—তার আর্থনীতিক—সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক—সর্বস্তরকে প্রভাবিত করছে এবং বিভিন্ন দেশগুলোতে বিভিন্ন কাঠামো ও মাত্রা নিয়ে তার চেহারা পরিস্কার হয়ে উঠছে।"

ধনতন্ত্রের আর্থনীতিক ও সামাজিক কাঠামোর সংগে শ্রমজীবী জন-

সাধারণের এবং সাধারণ মানুষের যা দরকার তাতে যে ক্রমবর্ধমান সংঘাত দেখা দিচ্ছে সেটা পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর কাজকর্ম থেকে খানিকটা বোঝা যায়।

লিওঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার জে. লেগে এইভাবে ব্যাপারটার চমৎকার সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন ; "আমাদের কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, তারা প্রকৃতির উপরে মানুষকে আধিপত্য করার অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। কাজেই শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থাতে শ্রমিক শ্রেণী ও সকল খেটে-খাওয়া মানুষ এই শক্তি সম্পর্কে সচেতন হতেই হবে কারণ তাদের সামাজিক আর্থনীতিক সমস্যাগুলো বাস্তব্য সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেটা সামাজিক আর্থনীতিক কাঠামোকে হিসেবের মধ্যে না ধরে তার সমাধান তো দূরের কথা, তার কোনো কিছু করাই যায় না। যেখানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাস্তব্য-চক্র নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে কোনো মৌলিক ধরনের মুশকিল দেখা দেয় না, সেখানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাস্তব্য-চক্র নিয়ে সমস্যাগুলো একটা সংকটের আকার ধারণ করেছে যেটা নিশ্চয়ই ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের সঙ্গে জড়িত।

একমাত্র সামাজিক পরিবর্তন সাধন করাই আজকের বাস্তব্য-চক্র সংক্রান্ত সমস্যার আসল সমাধান সম্ভব।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

অস্ত্র প্রতিযোগিতা ঃ প্রকৃতির পক্ষে ভীষণ বিপদ

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের আজকের স্তরে পরিমণ্ডল রক্ষা করা সব দেশের পক্ষেই একটা বিশেষ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। শব্দটার পুরো মানে ধরেই বলতে হয় যে, এটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বহু দেশের রাজনৈতিক নেতারা আজ সঠিক বুঝতে পেরেছেন যে, পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই একমাত্র পথ এবং গ্রহ পৃথিবীকে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মত ভাবে ব্যবহার করতে হবে।

তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমন ছাড়া (দে'তাত) ভাবাই যায় না, যে দে'তাত নিশ্চয়ই সামরিক ক্ষেত্রেও স্থাপন করতে হবে। এই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এবং বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সুবিধামূলক সহযোগিতার জন্য, নিরস্ত্রীকরণ স্থাপন করার জন্য এবং সকল রাষ্ট্রের সংগতিপূর্ণ বিকাশের জন্য পরিমণ্ডল রক্ষা করার বিষয়টা অপরিহার্য অংশ বলে মনে করে।

শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা করা সোভিয়েত পররাষ্ট্র-নীতির অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ; এই কাজে অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ও দুনিয়ার সর্বত্র প্রগতিশীল জনগণ তাকে পূর্ণ সমর্থন করে থাকে। তাদের দেশ রক্ষা সুরক্ষিত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে যা করতে হয় তা বাধ্যতামূলক; এর কারণ অগ্রণী ধনতান্ত্রিক

রাষ্ট্রগুলো তাদের সামরিক শিল্পগত কাজকর্ম বাড়াবার ও তাকে আরও শাণিয়ে তোলার জন্য অনেক কিছু করে থাকে যার কোনো প্রয়োজন নেই।

ধনতন্ত্রের অধীনে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শ্রেণীস্বার্থের উপযোগী করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব করা হচ্ছে। এর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির জন্য যা করা দরকার তাকে অনেক সময় অবহেলা করা হয়, আর সর্ব প্রথমেই একেবারে প্রাথমিক সেটা লক্ষ্য থাকে সেটা হল এর ফলাফলগুলোকে এমন ভবে নিয়োজিত করা হয় যাতে সর্বাধুনিক অস্ত্রের বিকাশ সাধন করা, তাকে পরীক্ষা করা এবং বেশি করে শিল্পের মতো (কারখানার সাহায্যে—ম্যানুফ্যাকচারিং) করে করা যায়। প্রকৃতির স্বার্থকেও জবাই করা হয় এবং বৃহৎ একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃতির সম্পদকে এর জন্য নিদারুণভাবে শোষণ করে।

এই দুটো ঘটনাই—বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সামরিকীকরণ এবং তার জন্য প্রকৃতিকে সামরিক স্বার্থের খাতিরে ব্যবহার করা— এ দুটোর কোনোটাই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। ধনতন্ত্রের অধীনে প্রযুক্তির বিকাশের এই নোংরা রাজনৈতিক ও সামাজিক আর্থনীতিক বিকাশের দিকের কথাটা বিশ্লেষণ করে লেনিন তাঁর সময়ে দেখিয়েছেন, "ইতিহাসে এই প্রথম দেখা যাচ্ছে যে, প্রযুক্তি থেকে লব্ধ দারুণ শক্তিশালী সাফল্যকে এমন একটা ব্যাপক আকারে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার ধ্বংস করার ক্ষমতা এতো বেশি যে, কোটি মানুষকে হনন করতে পারে। যখন উৎপাদনের সকল উপকরণকেই এইভাবে যুদ্ধের জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে, তখন সর্বাপেক্ষা ভীতিজনক ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য বলে প্রমাণিত হতে চলেছে এবং ক্রমশই অধিকতর দেশগুলোতে অবনতি দেখা যাচ্ছে বুভুক্ষা ও উৎপাদনের শক্তিসমূহের পুরো ধ্বংস সাধন করা হচ্ছে।" (লেনিন, কালেকটেড্ ওয়ার্কস, ভ্যলুম ২৭, পৃষ্ঠা ৪২২ ;)

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির ফলাফলকে একপেশেভাবে, একমাত্র সামরিক দিকে

৫

ব্যবহার করার প্রবণতার নোংরা চেহারাটা আজকের দিনে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের দিনগুলোতে বিরাট অংকের টাকা ধনতান্ত্রিক দেশগুলো অস্ত্রসম্ভার জন্য ব্যয় করেছে। আমেরিকার পণ্ডিত জেমস্. এল্. ক্লাইটনে-র মতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধে আমেরিকা খরচ করেছে ১০,০০০ কোটি ডলার। ক্লাইটনের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে—ঠাণ্ডা যুদ্ধের ২৫ বছরের প্রতিটি আমেরিকান নাগরিকের জন্য ১০,০০০ ডলার দিতে (ট্যাকস্ মারফৎ—অনুবাদক) বাধ্য হয়েছে। তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ঠাণ্ডা যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই দেশ এবং প্রথম মহাযুদ্ধে যা খরচ করেছিল তার চেয়ে যথাক্রমে তিনগুণ এবং ছত্রিশ গুণ বেশি খরচ করেছে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ অস্ত্রসম্ভার নির্মাণ করার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা এমনভাবে নেওয়া হচ্ছে যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অথবা অন্য কোনো ধনতান্ত্রিক দেশের ইতিহাসে আগে ঘটার কোনো নজির নেই। সামরিক-শিল্পগত ব্যবসাগুলোতে জাতির ব্যয়বরাদ্দ (বাজেট) থেকে প্রচুর টাকা ঢালা ভালো হচ্ছে দরাজ হাতে, এটা করার অজুহাত, জাতির অস্ত্রাগারে নতুন "আরও উন্নত" ধরনের অস্ত্রব্যবস্থা গড়ে তোলা "লাল জুজুর" ভয় এবং সোভিয়েতের "আগ্রাসী মনোভাবের" জিগির তুলে। ২৪-শ পার্টি' কংগ্রেসে লিওনিদ্ ব্রেজনেভ এই মন-গড়া 'আতঙ্কের' কথা তুলেছেন এইভাবে ; "যখনই সাম্রাজ্যবাদীদের তাদের আগ্রাসী মতলবকে লুকিয়ে ঢুকে রাখতে হয় তখনই তারা 'সোভিয়েত আতঙ্কের' মায়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। তারা ভারত মহাসাগরের গভীরে এবং করডিলেরার শিখরে এই আক্রমণের কথা চিন্তা করে। আর নিশ্চয়ই সোভিয়েতের সামরিক বাহিনী ছাড়া আর কে পশ্চিম মহাদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণের কথা ভাবতে পারে যদি তাদের ন্যাটো শক্তিবর্গের দূরবীন দিয়েই দেখা হয়।"

খনিজ পদার্থসমূহ ও অন্যান্য প্রচুর কাঁচামাল ব্যবহার করার জন্য সামরিক শিল্পগত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের রোজানা কাজকর্ম বাড়িয়ে তুলছে, স্টীল, লোহার আকর ছাড়া অন্যান্য ধাতুদ্রব্য ও দুষ্প্রাপ্য ধাতুসমূহ উৎপাদনের জন্য এবং বিরাটভাবে শক্তি ব্যবহারের তারা ব্যবস্থা করছে। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণ, দেশের ভেতরের নদীনালার এবং দুনিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলোর দূষিতকরণ সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে কোনো মৌলিক ব্যবস্থা নেয়নি। অবাক হবার কোনো কারণ নেই যে, পরিমণ্ডলকে যেসব শিল্প দূষিতকরণ করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা দোষী তাদের মধ্যে রয়েছে তারা যারা সামরিক অস্ত্রসম্ভার তৈরি করেছে।

এই সামরিক-শিল্পগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো যা কিছু উৎপাদন করে তার প্রায় সবটাই পৃথিবীতে জীবন্ত সব কিছুকে ধ্বংস করার জন্য বিপদস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমী জগতের সামরিক কয়েকটি চক্র যুদ্ধোত্তর দশকগুলোতে যা গড়ে তুলতে চায়, বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারের ক্ষেত্রে, তাদের সম্পর্কে এটা বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত খবরাখবর সরবরাহের জন্য কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের হিসেব মতো ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি ৮,০০০ মেগাটন বোমা মজুদ করা হয়েছে। হিরোশিমাতে যে বোমাগুলো হয়েছিল তার থেকে এটা ৬,১৫,৩৫৮ গুণ বেশি শক্তিশালী। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নব নব প্রচেষ্টাতে রত।

শুধুমাত্র মানুষ ও প্রকৃতিকে অপরিসীম ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবার জন্যই এই পারমাণবিক অস্ত্রাদি ও অন্যান্য মারণাস্ত্র বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। অস্ত্র-প্রতিযোগিতার অন্যান্য সম্ভাব্য ফলাফল হচ্ছে যেমন 'সীমিত আকারে এটম অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা' নতুন ধরনের অস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হচ্ছে বিনা অনুমতিতে এবং এই সকল পরীক্ষার ফলে বিষাক্ত তেজঃরাশি ও অন্যান্য ব্যাপারও ঘটেছে। আর নানা রকমের একেবারে মারাত্মক বিধ্বংসী

অস্ত্রের 'যাদের রেখে দেবার প্রয়োজন নেই' ('সারপ্লাস' হয়ে গেছে) তাদের অবহেলাভরে (যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করে) মজুদ করে রাখা বা নষ্ট করে দেওয়ার মধ্যেও মানুষের প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের কাছে প্রকৃত বিপদ স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

সামরিক-শিল্পগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা থেকে কতো ক্ষতি হচ্ছে তার হিসেব করার চেষ্টা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এরা এই সকল রাষ্ট্রগুলোকে প্রধান আর্থনীতিক, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাবলীদের সমাধান করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখতে চায় যদিও সাম্প্রতিক সেটা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যাগুলো এতোই বিকট আকার ধারণ করেছে যে, তাদের সমাধানের জন্য কয়েক শত, কেন কয়েক হাজার কোটি ডলার খরচ করা দরকার অথচ সেটা প্রতি বছরে অস্ত্র-প্রতিযোগিতাতে খরচ করা হচ্ছে।

আশ্চর্যের কথা কিছু নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে ক্রমশই অধিকতর সংখ্যাতে রাজনৈতিক নেতারা, বিজ্ঞানীরা ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা নিরস্ত্রীকরণের জন্য জোরালো ভাষায় ডাক দিচ্ছেন, চেষ্টা করছেন যাতে রণনীতিগত ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহকে সীমিত করা যায়; অনেকগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির জন্য এবং সাধারণ ভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য সুবিধাজনক রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য এটা করার প্রয়োজনীয়তা সমধিক। নিরস্ত্রীকরণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরঙ্কুশ শান্তি-পলিসি চালিয়ে যাচ্ছে তাতে এরা ক্রমশই অধিকতর সংখ্যায় শামিল হচ্ছেন।

১৯৫০ সালের সময় থেকেই দুনিয়াতে নানাভাবে পারমাণবিক অস্ত্রাদি সীমিত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বাস্তবসম্মত প্রস্তাবাদি রেখেছে। ১৯৫৩ সালে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য ইউনাইটেড নেশনসের

নিরস্ত্রীকরণ কমিটিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের প্রস্তাবকে সমর্থন করে। ১৯৫৫ সালের যে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে, যে-সকল রাষ্ট্রের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রাদি রয়েছে তারা যেন তার পরীক্ষা করা বন্ধ করে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের বাতাবরণ এবং রাজনৈতিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংঘর্ষের মনোভাব বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে উত্তেজনা প্রশমনের (দেতাঁতের) জন্য যেটুকু কাজ আরম্ভ হয়েছিল এবং তার জন্য সামরিক দিক থেকে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছিল তার ক্ষতিসাধন করে; এই দুটি রাষ্ট্র হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই সব কারণে ১৯৫০-এর ও ১৯৬০-এর দশকে নিরস্ত্রীকরণের যে প্রক্রিয়া কাজ করছিল তাকে প্রধানত মহাকাশেও পৃথিবীর মহাসমুদ্রে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ব্যাপারেই নিবদ্ধ থাকে। আর এরই পাশাপাশি কিছুটা আমাদের গ্রহের কুমেরু অঞ্চলে এবং লাতিন আমেরিকাতে ব্যবহারও নিষিদ্ধকরণ করা হয় এবং বেশ কিছুটা সীমিতভাবে পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা করা বন্ধ করা হয়। কিন্তু এই ধরনের সীমিতচুক্তি সামরিক দেতাঁতের ক্ষেত্রে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য কঠিন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য কিছু করতে পারে না এবং সর্বোপরি পরমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার জন্য পরিমাণগত বা গুণগতভাবে (অর্থাৎ মজুত-পরিমাণ বা উন্নততর বিধ্বংসতার দিক থেকে—অনুবাদক।) কিছুই করতে পারে না। এতে ফল হয় যে, যেটা আমেরিকার বৈজ্ঞানিক হারবার্ট ইয়র্ক বলেছেন, ১৯৭০ সালের শুরু থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "বারংবার একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্ত্র-প্রতিযোগিতাকে অযথা বাড়িয়ে তোলে।"

সামরিক ক্ষেত্রে প্রথম কার্যকরী দেঁতাত নেওয়ার আসল পূর্বমত ছিল যেটা রণনীতিগত অস্ত্রাদি অবধিও চলেছিল, সেটা ১৯৬০-এর শেষ দিকে প্রকট হয়েছিল। ঐ সময় নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথা-মাথা রাজনৈতিক

নেতারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, পররাষ্ট্রনীতিকে ফলপ্রসূ করার জন্য পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ করা চলে না। এখন একটা অত্যন্ত বিশেষ রাজনৈতিক সংকটের উচ্চ পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিরাট পরিমাণের পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার পলিসি কার্যকারী হবে না (এই সম্ভাবনাই এতাবৎ যুদ্ধোত্তর যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারিত করেছিল)। বেশির ভাগ আমেরিকানের কাছে এটা পরিষ্কার হয়েছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে দারুণভাবে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে তার পাল্টা প্রত্যাঘাত খেতে হবে এবং তাতে আমেরিকার 'অসম্ভব' ক্ষতি হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রচণ্ডভাবে পারমাণবিক অস্ত্রদের দিয়ে আঘাত করে ঘায়েল করে দেবার পরিকল্পনাটা যে নির্ভরযোগ্য প্রস্তাব নয় এটা ১৯৬০ দশকের শেষের দিক থেকে ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের লেখা থেকে বোঝা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রফেসার জর্জ রাথ্‌জেনস্‌ দেখিয়ে দিয়েছেন, "এ বিষয়ে সন্দেহ করার প্রায় কোনো কারণ নেই যে, এখন যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পুরোদমে একটা পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে পাল্টাপাল্টি লড়াই হয়ে যায় তাহলে দুজনেরই ক্ষতি হবে সমান এবং অত্যন্ত বেশি। প্রতিটি দেশেরই সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিভূমিরও নিশ্চিত ক্ষতি হবে। একই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন আমেরিকার রণনীতি সংক্রান্ত অস্ত্র-বিশারদ, হারবার্ট স্কভিল, "আজকের অবস্থাতে রণনীতি গত সামরিক অস্ত্রাদিকে যদি ক্রমাগত বাড়িয়েই যাওয়া যায়··· তাহলে উভয় পক্ষেই যে বিশেষ কোনো ফ্যায়দা উঠানোর সম্ভাবনা কম। উভয় দেশের পক্ষেই একে অপরকে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে হলে খুব বড়ো বড়ো এটম-বোমা থেকে ধ্বংস এড়ানো সম্ভব হবে না। আর পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে যে কোনো পক্ষ খুব বেশি রাজনৈতিক দিক সুবিধাজনক অবস্থাতে যেতে পারবে, তা-ও নষ্ট নয়।"

১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে পেন্টাগন[৩৩] কর্তারা রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য "সীমিত ভাবে পারমাণবিক অস্ত্র" দিয়ে আঘাত করার সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন। এই ধরনের বক্তব্যের পেছনে দারুণ উত্তেজনা বাড়াবার মনোবৃত্তি থাকা ছাড়াও এতে সামরিক নেতৃত্বের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত এখন স্বীকার করেন, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সামরিক ক্ষমতার তুলনামূলক বিচারে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং দেঁতাতের জন্য দুনিয়াতে যে রাজনৈতিক আবহাওয়ার হাওয়া বদল হয়েছে তা-ও মেনে নিয়েছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকটের অবস্থার পরিধি ও কারণ কতোটা গভীরভাবে যে বদলেছে তা ও সঠিকভাবে দেখিয়ে দিতে হবে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে এই ধরনের তুলনামূলক বিচার করতে হলে প্রধানত হিসেবের মধ্যে ধরা হতো সামরিক সংঘাত হবার প্রধান কারণ কি কি, কারা কোন্ পক্ষে যোগ দেবে, কতো ক্ষতি হতে পারে এবং তার ফলাফল কি দাঁড়াবে। এখন আগামী দশকগুলোতে যে ধরনের সংকটময় অবস্থার উদ্ভব হতে পারে; সেটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এবং তার নেতিবাচক দিকগুলো আসছে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দিক থেকে। আমেরিকার যাঁরা আজ ভবিষ্যৎবিদ[৩৪] তাঁদের হিসেব অনুসারে, যেমন বলা হয়েছে যে, ১৯৭০-৯০, এই দুই দশকের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারমাণবিক যুদ্ধ সম্ভাব্য সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না, আসল কারণ হবে খাদ্য সংকট, পরিমণ্ডলের অবনতি, শক্তি ও কাঁচা মাল যোগানের ব্যবস্থা ভেঙে-পড়া। এই ধরনের সংকট বহু রাষ্ট্রকেই আঘাত করবে।

---

৩৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী, ওয়াশিংটনে পাঁচ তারকা-দেওয়া (যা থেকে নাম হয়েছে পেন্টাগন) বাড়ীতে আমেরিকার প্রধান সামরিক দপ্তর অবস্থিত—অনুবাদক।

৩৪. Futurologists—যেমন archaeologists-দের বলা হয় প্রত্নতত্ত্ববিদ—অনুবাদক।

পুরনো কায়দায় এই সকল সমস্যাকে সমাধান করার জন্য যে সকল এলাকাতে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দেখা দেবে সেখানে প্রচুর সম্পদ (খাদ্যশস্য ইত্যাদি) মজুদ করে আগের মতো অভীষ্ট ফল পাওয়া যাবে না। অস্ত্র-প্রতিযোগিতা যেখানে বেড়েই চলেছে সেখানে প্রয়োজনীয় ধন ও অন্যান্য সম্পদ যোগাড় করা প্রায় দুঃসাধ্য। সংকট সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় যা বরাদ্দ দরকার তাকে একমাত্র সামরিক প্রোগ্রামের জন্য যা করা হয়ে থাকে তার সংগেই তুলনা করা চলে।

১৯৬০ সালের শেষদিকে ও ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে আরও গড়ে তোলার জন্য যে মূল সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে তাতে বেশ একটা বড়ো ধরনের পরিবর্তন (যেন পুরোবাতাবরণটাই বদলে যাচ্ছে) লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০-এর ১৯৬০-এর দশকে প্রতিরক্ষা দপ্তর যে কোনো বড়ো অস্ত্র তৈরি করার প্রোগ্রাম নিলে মার্কিন কংগ্রেসের (পার্লামেন্টের—অনুবাদক) অনুমতি পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতো, কিন্তু আজকাল সামরিক যে কোনো প্রোগ্রাম (বা কর্মসূচী)-কে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে খুব মুশকিল করে পাস করাতে হয়। তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি এমন ধরনের বাঁধা-ধরা ঝোঁক রয়েছে যাতে মোট টাকার অংকের দিক থেকে সামরিক ব্যয় বেড়েই চলেছে। একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল বাজেটের বাৎসরিক বাজেটের খাতে খরচের যেটা ব্রুকিং ইনস্টিটিউশন ১৯৭০-এর দশকে বিভিন্ন খাতে কি কি খরচ করা হবে সেটা নির্ধারণ করেছিল—অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে রণনীতিগত ফোর্স ও তাদের আনুষংগিকদের,—আর সেটা ঐ শুল্ক বছরের ফেডারাল গভর্নমেন্টের বাৎসরিক বরাদ্দের অপেক্ষা ছিল কম। এই ধরনের একটা অনুসন্ধানসূচক (রিসার্চের) পরিকল্পনাতে বলা হয়েছে "খুব বেশি খরচ করলে সম্পদের আসলে ক্ষতিসাধন করা হয়, যেটা জাতির মংগলের জন্য কোনোই কাজে লাগে না এবং যার সর্বাপেক্ষা খারাপ দিকটা হচ্ছে নিরাপত্তা না বেড়ে বরং কমে যায়।" (অর্থাৎ,

যুদ্ধের বিপদ বেড়ে যায়—অনুবাদক)। আসলে সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ (বাজেট) আগামী বছরগুলোর জন্য যা অনুমোদিত বা পরিকল্পিত হয়েছিল তার চেয়ে যে কমে যাচ্ছে এবং যারা অস্ত্র-প্রতিযোগিতা চায় তাদের হিসেবের চেয়ে কম দাঁড়াচ্ছে এবং সেটা করা হচ্ছে বিশদ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, তা থেকে সামরিক ব্যয় কমানোর জন্য অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সামরিক ক্ষেত্রে দেতাঁতের আরও বিকাশলাভের সুযোগ হচ্ছে।

সামরিক দিকে কতোখানি সম্ভাবনা আছে এবং তাকে কতো বেশি বিধ্বংসী করা যায় এবং যার সম্পর্কে কোনো সীমিতকরণের ব্যবস্থা করা যায় না এবং যেটা যে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি বা মতৈক্য হয় বজায় রয়েছে নয় তাদের করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তাদের আওতায় আসছে না—এই সবগুলো নিয়ে রিসার্চ ও আরও কাজ করার জন্য বিরাট পরিধি রয়েছে এবং যার সামরিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের কাজের সম্ভাবনা ও ঝোঁক থেকে ভবিষ্যতের সামরিক বাহিনীর গঠন কি হবে এবং তাদের ক্ষমতা কি দাঁড়াবে সেটা বহুলাংশে নির্ধারণ করে। গভর্নমেন্টের রিসার্চ সংগঠনগুলি, রিসার্চ কেন্দ্রগুলি, সামরিক বাহিনীর গবেষণাগারগুলি, অস্ত্র-নির্মাণ করার ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলি এবং করপোরেশানগুলি (তথাকথিত মুনাফা লোটে না) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এই ধরনের কাজ ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে করা হয়।

"আজকের ধরনের", অর্থাৎ এমন ধরনের অস্ত্র এবং সামরিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ, যাদের একের পর এক সিরিজ করে উৎপাদন করার স্তরে পৌঁছেছে—এই ধরনের ' অস্ত্রসম্ভারের আরও বিকাশ সাধন-করার ও নির্মাণ করতে যারা যুক্তি দেয়, তাদের সেই যুক্তিগুলো কিন্তু আমেরিকায় অনেক রাজনৈতিক নেতারা যারা সামরিক বাহিনীর বিকাশ সাধনের গুরুত্বপূর্ণ দিকটির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এর সঙ্গে একমত নয়। তাছাড়া, এই ধরনের যুক্তিগুলো আজকের দিনের যে আন্তর্জাতিক দলিল-

গুলোতে কয়েক ধরনের রণনীতিগত সহ নানা ধরনের অস্ত্রনির্মাণ করাকে সীমিত করতে চায় তাদের আসল বক্তব্যকে খণ্ডন করতে চায়। এই ধরনের আন্তর্জাতিক দলিলগুলোর মধ্যে সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্ক নির্ধারণ করে যে দলিলগুলো করা হয়েছে সেগুলোকেও ধরতে হবে।

সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ্ রিপ্রেসেন্টেটিভ[৩৫]-এর সামরিক বাহিনীর কমিটি থেকে নিযুক্ত প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স) দপ্তরের রিসার্চ কাজের বাৎসরিক রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে যে, সামরিক বাহিনীর লড়বার ক্ষমতাকে বাড়াবার জন্য এবং প্রযুক্তির দিক্ থেকে তাদের আরও জোরদার করে যাতে তারা আধিপত্য করতে পারে তার ভিত্তি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। "সামরিক ব্যাপারে প্রযুক্তির আধিপত্য" স্থাপন করার অর্থ হল সামরিক কাজের জন্য রিসার্চ করা ও তার আরও বিকাশ সাধন করা।

প্রযুক্তির ভিত্তিকে উন্নত করার ধারণাটা নিশ্চয়ই খোলাখুলি প্রতিক্রিয়াশীল, তাতে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করার কথাই প্রকারান্তরে বলা হচ্ছে, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক—রাজনৈতিক মতবাদের একটা প্রধান দিক। কিন্তু ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে এটা গৃহীত হয়নি। এই ধারণা কয়েকজন আমেরিকান ঋত্বিকের লেখায় থেকে পাওয়া গেছলো। তারা এই ধরনের যুক্তি দিয়ে এটাকে দাঁড় করতে চেয়েছিল যে, এতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাধ্য করা হবে তার ধনসম্পদকে তার নিজের জাতীয় অর্থনীতিকে বিকাশ করা থেকে বিরত করতে (অর্থাৎ সোভিয়েতকে জাতীয় অর্থনীতির দিকে ধন সম্পদ খরচ না করে সামরিক দিকে ব্যয় করতে হবে বাধ্য করা হবে—অনুবাদ) এই ধারণাটা বিশেষ করে এস পসোনি ও জে, পুরনেলের বই 'প্রযুক্তির রণনীতি' (The Strategy of Technology by S. Possony and J. Pournell)-তে পাওয়া যাবে। এই বইয়েতে প্রযুক্তিগত যুদ্ধ সম্পর্কে এই

৩৫. আমাদের দেশের পার্লামেন্টের মতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসভার এই নাম—অনুবাদক।

ধরনের বক্তব্য দেওয়া আছে; লেখকদের মতে, ১৯১৭ সালে যেদিন থেকে রাশিয়ান বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে, সেই সময় থেকে: "প্রযুক্তিগত যে যুদ্ধ চালানো হয় সেটা একটা জাতির প্রযুক্তির সরাসরি ও ইচ্ছামূলকভাবে ভিত্তি থেকে আসে এবং তা থেকে রণনীতিগত ও রণ কৌশলগত লক্ষ্যে পেঁছানো যায়। এটা অন্য জাতীয় শক্তির আধারের সঙ্গে একসঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। এই ধরনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেমন সব ধরনের যুদ্ধের চেহারা দেখা যায়। শত্রুশক্তির পরে জাতীয় ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেওয়া; এই ভাবে যুদ্ধের লক্ষ্যকে, তার রণনীতি, রণকৌশল ও যুদ্ধ চালাবার পদ্ধতিকে বদলে দেওয়া; অন্য ধরনের লড়াই চালাবার কায়দাকে সাহায্য বা সমর্থন করা; সামরিক শক্তিকে আয়ত্ত করার জন্য প্রযুক্তির উন্নতিকে আরও বাড়ানো ও তাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো; খোলাখুলি যুদ্ধ যাতে না লাগে সেটা রোধ করা এবং শান্তির কায়দাকানুনকে চালু করতে সাহায্য করা যাতে সমাজের সৃজনশীল যে লক্ষ্যকে পূরণ করা যায়।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রভাবশালী চক্রের ইচ্ছা আছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে রেষারেষিতে যাতোদূর সম্ভব আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-সামরিক চরিত্র দেওয়া হবে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি থেকে; তাহলে সেটা আমেরিকান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যে ভালো সম্পর্ক দেখা দেবার সম্ভাবনা রয়েছে (যেমন দেঁতাত—অনুবাদক), তাতে সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্ক বাধ্য হয়ে দেখা দেবে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে সামরিক কর্তৃপক্ষের স্বার্থে রিসার্চ ও ঘটনাবলী বড়ো আকারেই ঘটে যাচ্ছে। সেদিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল রাষ্ট্রদের—সর্বোপরি বৃহৎ রাষ্ট্রদের ডাক দিয়েছে—যাতে গণধ্বংসী নতুন ধরনের ভীষণ মারণাস্ত্রগুলোকে বে-আইনী ঘোষণা করে চুক্তি সম্পন্ন করে শান্তির জন্য নতুন উদ্যোগ নেওয়া যায়। এই ধরনের চুক্তি সামরিক ক্ষেত্রে রিসার্চ ও উন্নতি সাধনের কাজকে সীমিত করতে পারে এবং তদ্বারা সামরিক

দেশগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক উত্তেজনাকে প্রশমন করার জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। ইউনাইটেড নেশনসে ২৩-শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ সালে গণধ্বংসকারী নতুন ধরনের ও ব্যবস্থাযুক্ত অস্ত্রকে নিরোধ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এক খসড়া চুক্তি পেশ করে।

রণনীতিগত অস্ত্রাদি সীমিতকরণের জন্য সোভিয়েত আমেরিকান যে কথাবার্তা চলে তাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন নতুন ধরনের আরও বিধ্বংসকারী অস্ত্রাদি পরিহার করার জন্য চুক্তি করতে আহ্বান জানায়। এই অস্ত্রগুলো ত্রিশূলাকৃতি ক্ষেপণাস্ত্র-বহনকারী ডুবোজাহাজ এবং বি-১ স্ট্রাটাজিক বোমারু বিমানগুলো, যেগুলো আমেরিকা ও সোভিয়েত, দুই রাষ্ট্রের কাছেই আছে।

ভূমধ্যসাগর থেকে পারমাণবিক অস্ত্রাদি যুক্ত (জলের উপরের) যুদ্ধজাহাজ ও ডুবোজাহাজ সরিয়ে নেওয়া হোক, এ সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা চুক্তি করার প্রস্তাব করে।

এই সোভিয়েত ইউনিয়নই পুরোপুরি ও সর্বাত্মকভাবে পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের জন্য চুক্তি সম্পন্ন করতে প্রস্তাব করেছিল এবং সেটা ইউনাইটেড নেশনসে সাধারণভাবে সম্মতিও পেয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫-শ কংগ্রেসে "গৃহীত শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সংগ্রামকে আরও জোরদার করার জন্য প্রোগ্রাম" যুদ্ধের বিপদকে ও অস্ত্রীকরণকে কমিয়ে দেবে এবং সেটা কাজে পরিণত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্র কাজ করছে।

৩৩-টি ইউরোপীয় দেশের নেতারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইউরোপে নিরাপত্তাও সহযোগিতা স্থাপিত করার কনফারেন্সকে একটা দিকচিহ্নস্বরূপ বলা যেতে পারে; এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাও যোগ দিয়েছিল। এই কনফারেন্সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফলগুলোকে যাচিয়ে বিচার করা হয়। গায়ের

জোর বা শক্তি দেখিয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সর্বনাশা নীতিকে বাতিল করার জন্য পুনরায় ঘোষণা করা হয় এবং ইউরোপে ও সারা দুনিয়ার মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের কথা সূচিত করে।

এই কনফারেন্সে যোগদানকারীরা প্রতিবেশীসুলভ ভালো সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক স্থাপনের জন্য পরিষ্কার রাজনৈতিক নির্দেশ দেয়। রাজনৈতিক দেঁতাতের (উত্তেজনা প্রশমনের) সঙ্গে এখানে নীতিসম্মতভাবেই যুক্ত রয়েছে সামরিক ক্ষেত্রে দেঁঅতের সমস্যা। যার জন্য অস্ত্রসম্ভারকে সীমিত করতে হবে।

নিরস্ত্রিকরণের সমস্যাটা পরিমণ্ডল রক্ষা করার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে বিচার করতে হয়, তার কারণ শুধুমাত্র জীবমণ্ডল রক্ষা করার জন্যই নয়, আমাদের গ্রহের প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করা যায় একমাত্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতেই। ব্যাপকভাবে গণবিধ্বংসী এবং প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ নষ্ট করে দেবার নানারকমের নতুন নতুন উপায় যখন রোজ আবিষ্কার করা হচ্ছে কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশে, তখন এই উপকরণগুলোকে বে-আইনী করে দেবার এবং তাকে ব্যবহার না করার সমস্যাকে যথাসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর রিসার্চের কাজকর্মকে সামরিক দিক প্রয়োগ ও নিয়োজিত করার ফল হচ্ছে এই যে, কয়েকটি ল্যাবোরেটারী ও কেন্দ্রে পরিমণ্ডলকে সীমিতভাবে ধ্বংস[৩৬]

---

৩৬ দারুণ বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্রাদি, যেমন এটম ও বিশেষ করে হাইড্রোজেন বোমা থেকে যে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি করে তাতে একটা দেশের পরিমণ্ডল একেবারে নষ্ট হতে পারে এবং সেটা অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। ধ্বংস হবে, একটা দেশের বাস্তব্য-চক্রকে নষ্ট করে দেওয়া হবে, যেমন ভিয়েতনামে আমেরিকা চেষ্টা করেছিল কিন্তু সীমিতভাবে কি করে হবে, সে সম্পর্কে রিসার্চ। —অনুবাদক

(destructive modification of the environment) করার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে। এইরকম সীমিতভাবে পরিমণ্ডলকে ধ্বংস করার সমস্যাটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনমত এবং বিজ্ঞানীরা দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন।

সাধারণভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্ররা নানা উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বহু রকমের উপায় অবলম্বন করে জীবমণ্ডলের যে ক্ষতিসাধন করতে চায় তার পরিধি ও চরিত্র নির্ধারণ করতে হবে।

আরও বিশেষভাবে বলতে হলে সমস্যাটা সামরিক কার্যকলাপের সংগে জড়িত—সেটা আসলে একেবারে সামরিক ক্রিয়াকলাপ (অপারেশান) বা সামরিক প্রস্তুতি, যাই হোক না কেন। সামরিক উদ্দেশ্যে পরিমণ্ডলকে সীমিতভাবে বদলে দেওয়া (বা ক্ষতি করার) বা ক্ষতি করাকে নাম দেওয়া "ভূ-পদার্থিক যুদ্ধ চালানো" (geophysical warfare)। কিন্তু গণবিধ্বংসী যে সকল অস্ত্রাদি উৎপাদন, পরীক্ষা এবং অযত্ন সহকারে গুদামজাত করলে পরিমণ্ডলকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, সেটা এই নামকরণের দ্বারা সম্পূর্ণ বোঝানো যায় না।

১৯৬০-দশকের প্রথমার্ধে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর সামরিক কারণে সীমিতভাবে পরিমণ্ডলকে ক্ষতি করার জন্য রিসার্চ শুরু করে তখন এই "ভূ-পদার্থিক যুদ্ধ চালানো"-র নামকরণটা চালু করা হয়।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত আমেরিকান পদার্থবিদ প্রফেসর গর্ডন ম্যাকডোনাল্ড বলেন যে, "শক্তি প্রয়োগ করে ভবিষ্যতে যে সকল জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে তার মধ্যে এই গ্রহে পরিমণ্ডলকে অদল বদল করার কতোখানি ক্ষমতা মানুষের আছে, সেই ক্ষমতার 'পরে সেটা নির্ভর করছে।" তাঁর মতে, পারমাণবিক অস্ত্রের সমতা যদি দুই পক্ষেই থাকে তাহলেও একটি রাষ্ট্রের পক্ষে 'ভূ-পদার্থিক যুদ্ধ' চালিয়ে আন্তর্জাতিক অবস্থার প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাকে এমনভাবে গড়ে তোলা যায় যাতে এই গ্রহের পরিমণ্ডলের ক্ষতি-

সাধন করা যায়। তিনি মনে করেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্ত্রাগারে যুদ্ধ চালাবার জন্য যে সকল উপকরণ মজুদ করা হবে তার মধ্যে ভবিষ্যতের "ভূপদার্থিক যুদ্ধের জন্য অস্ত্রাদি"-কে বাদ দেওয়া যাবে না।

ম্যাকডোনাল্ড বিশেষ করে বলতে চান যে, পরিমণ্ডলের অবস্থাতে "অনিশ্চয়তা" থাকার ফলে "ভূ-পদার্থিক যুদ্ধ" চালানোর অবস্থাদি পর পর কয়েকটি কারণের জন্য সম্ভব হয়েছে। এই "অনিশ্চয়তা"-তে সামান্য শক্তি প্রয়োগ করলেই প্রাকৃতিকভাবেই এমন বদল ঘটবে যাতে দারুণ বিধ্বংসী কাজ শুরু হয়ে যাবে।

১৯৭১-৭৩-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে পরিমণ্ডলের সীমিতভাবে ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনার কথা সামরিক দিক থেকে আলোচিত হয়। বিচার করে লক্ষ্য করা হয় (নোট করা হয়) যে, সামরিক উদ্দেশ্যে পরিমণ্ডলকে প্রধানত তিন ভাবে খানিকটা বদলে দেওয়া যায় ; (ক) ঝড় জলের বা বায়ুমণ্ডলের এবং ধাতুর কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে ; (খ) ভূমিকম্প শুরু করে দিয়ে এবং (গ) শেষ অবধি পৃথিবীর মহাসমুদ্রের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকে সরাসরি প্রভাবান্বিত করে (যেমন, সমুদ্রের স্রোতোধারার দিক পরিবর্তন অথবা বিশাল প্লাবনের সৃষ্টি করে দিয়ে)। এই তিন ক্ষেত্রেই পরিমণ্ডলকে যাতে সীমিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য ইউনাইটেড নেশনসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খসড়া কনভেনশন করার প্রস্তাব পেশ করেছে।

আর জীবমণ্ডলের কয়েকটি উপাদানকে, যেমন উদ্ভিদ ও জন্তু জগতকে, বায়ুমণ্ডলকে এবং নদীও হ্রদগুলোর জলকে দূষিত ও অন্যান্যভাবে প্রভাবান্বিত করে শত্রুপক্ষের সামরিক বাহিনীকে আঘাত করা এবং অর্থনীতির সাধারণ কাজকর্মকে এবং একটা দেশের জনসাধারণের জীবন ধারনের ও কাজকর্মের জন্য যা দরকার তা থেকে তাদের বঞ্চিত করার জন্য যে পন্থাগুলো উদ্ভাবন করা হচ্ছে, সেগুলো সকলেরই নজরে থাকা উচিত। এই ধরনের পন্থাগুলোকে সামরিক

ক্ষেত্রে অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহারের পদ্ধতি ও অস্ত্রসম্ভারের সংগে মিলিতে প্রয়োগ করা হয়। এই অবস্থায় কাজেই পরিমণ্ডলের সীমিতকরণের জন্য এমন উপায় সামরিক ক্ষেত্রে বা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে 'ভূপদার্থিক যুদ্ধ' চালানোর পদ্ধতির সংগে একই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সামরিক কলাকৌশলাদি এবং সামরিক বাহিনীর হাতে রাসায়নিক ও অন্যান্য ভাবে যুদ্ধ চালাবার ব্যবস্থাদি, যেটা পরিমণ্ডলে সরাসরি ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে (বা সমগ্র এলাকাতে) তার ব্যবহার হলে, বিশেষ ব্যবস্থাসম্পন্ন জোটবদ্ধভাবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘনীভূতভাবে আক্রমণ করে যার প্রভাব কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবেই পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত করে।

বিনা দ্বিধায় পরিমণ্ডলকে সীমিতভাবে ধ্বংস করার জন্য যে নানা ধরনের অস্ত্রাদি আছে তাদের অস্ত্র ব্যবস্থার তালিকার মধ্যে ধরতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যে সামরিক কাজকর্ম (অপারেশন) চালাতে গিয়ে দুনিয়ার বিরাট অঞ্চলে যে দারুণ ক্ষতি করা হয়েছে সেটা জনসাধারণের মানে বেশ তাজা রয়েছে।

"ভূপদার্থিক যুদ্ধ" চালানোর জন্য প্রধান ব্যবস্থাগুলোর এই ধরনের তালিকা করা যায়; শস্য ধ্বংসকারী ও জমির উর্বরতা নষ্টকারী, এমন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে যতটা গাছগাছড়ার ও তৃণশস্যের সবুজ জমিকে একেবারে নষ্ট করে দেয়; জংগল এলাকাতে 'আকাশ থেকে বোমা ফেলে খানিকটা এলাকা পরিষ্কার করা হয়, যেখানে হেলিকপটার নামতে পারে (জমি ১-২ মিটার উচ্চে এই বোমাগুলোকে ফাটানো হয়); জমির উপরের আস্তরণকে বুলডোজার দিয়ে এমন ভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, যেখানে এর পরে জমি চাষ করার অনুপযুক্ত হয়ে যায় (এবং নাম দেওয়া হয়েছে 'রোমক লাঙ্গল'); কৃত্রিমভাবে মেঘপুঞ্জ তৈরি করে সেই মেঘমণ্ডলকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় "দ্রবীভূত" করে বৃষ্টি ঝরানো হয়; বায়ুমণ্ডলকে এমন-

ভাবে এসিড দিয়ে আর্দ্র করে দেওয়া হয় যে, যখন তা থেকে বৃষ্টি নামবে তখন সেই বৃষ্টির জলের দ্বারা এসিডের মতো কাজ করবে, যাতে যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যেতে পারে; অগ্নির ঝড় তৈরি করা—রাসায়নিক পদার্থের ছড়িয়ে দিয়ে জঙ্গলে দারুণ দাবানলের সৃষ্টি করা; এবং জলের বাঁধ ও সেচের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাবলীকে নষ্ট করে দেওয়া।

বায়ুমণ্ডলে রাসায়নিক পদার্থ ঢুকিয়ে দিয়ে জলের পরিমাণকে (বা ভারসাম্যকে) বাড়িয়ে বৃষ্টিপাত করানো,[৩৭] আরও যেমন আবহমণ্ডলে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াকে বাড়িয়ে তোলা, বিরাট বিরাট 'সুনামী' ধরনের প্লাবন সৃষ্টি করা, বিরাট এলাকা জুড়ে উদ্ভিদ ও পশুপক্ষীদের নির্মূল করে দেওয়া—এ সবই পরিমণ্ডলের দূষিতকরণ করে তাকে শত্রুশিবিরের (hostile) পর্যায়ভুক্ত করে দেওয়া। সোভিয়েত ও আমেরিকার খসড়া কনভেনশনে এগুলোকে বে-আইনী ঘোষণা করে দেবার জন্য প্রস্তাব ছিল। তবে পরিমণ্ডলের সীমিতভাবে ধ্বংস করার যে "রণকৌশল-গত উপায়" অবলম্বন করা হয় তাকেও আইন-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা প্রয়োজন। নিশ্চয়ই কোনো আগ্রাসী শক্তিকে তৃণশস্য নষ্ট করে দেবার জন্য বিনা বাধায় শস্য ধ্বংসকারী ও জমির উর্বরতা ধ্বংসকারী বস্তুসমূহ ব্যবহার করতে দেওয়া যায় না। কিন্তু ভিয়েতনামে ঠিক এটাই করা হয়েছে। নিশ্চয়ই একটা রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অঞ্চলকে নিয়মিতভাবে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র-ব্যবহার করতে দেওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও ১৮৬৫ থেকে ১৯৭৩ সাল অবধি মোট ১ কোটি ১০ লক্ষ টি. এন্. টি. আকাশ থেকে বোমা এবং ২১ কোটি ১৭ লক্ষ কামানের গোলা—সর্বসাকুল্যে ওজনের দিক থেকে দাঁড়ায় ৭০ লক্ষ টন দক্ষিণ ভিয়েতনামে ফেলা হয়েছে; ফলে সেখানকার জমি নষ্ট হয়ে গেছে এবং ভূমিকে লোহা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজকের দিনের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে পরিমণ্ডলকে সাধারণভাবে ধ্বংস

---

৩৭. যে বৃষ্টির জলের সঙ্গে প্রয়োজনমতো এসিডও মেশে এসে প্রকৃত ক্ষতি সাধন করতে পারে—অনুবাদক

করার এবং বিশেষভাবে তাকে প্রভাবিত করে নষ্ট করার যে সকল উপায় আছে এবং আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহারকে বে-আইনী ঘোষণা করে সবটাকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে। নিরস্ত্রীকরণের অন্যান্য সমস্যা-বলীর সংগে সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর সম্পর্ক ও সমাধান করার চেষ্টা করেছে; এটা করতে পারলে প্রাকৃতিক ঐ ধরনের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়।

পরিমণ্ডলের সম্ভাব্য ক্ষতিসাধন করা থেকে বাঁচাবার জন্য আর এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে। গণ-ধ্বংস করার জন্য নতুন যে ধরনের অস্ত্রাদি আছে তাদের আরও উন্নত করার ব্যবস্থাকে, তাদের নির্মাণকার্যকে মজুদ করার ব্যবস্থাকে এবং তাদের "বাড়তি" যা হয়েছে—এই সবকে (তাদের সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করার পূর্বেই) আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা মনে রেখে বিদেশে যে সকল প্রগতিশীল বিজ্ঞানীরা রয়েছেন তাঁরা পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের এবং শান্তির জন্য পারমাণবিক যে সকল পরীক্ষা করা হবে সেগুলোকে কঠিন নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে হবে।

৩-রা জুলাই, ১৯৭৪ সালে জমির নীচে (পাতালে) পরিমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা সীমিতকরণ করার জন্য সোভিয়েত-আমেরিকাতে যে চুক্তি হয়েছে, সেই অনুসারে ৩১-শে মার্চ, ১৯৭৬-থেকে উভয় পক্ষের কেহই এমন কোনো পরীক্ষা করবে না যা থেকে ১৫০ কিলোটনের অধিক তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন হতে পারে।

১৯৭৪ সালে তাদের তৃতীয় শীর্ষ বৈঠকের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা জনিত বিস্ফোরণ না চালিয়ে যাবার জন্য তাঁদের সংকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করলেন। ইউনাইটেড নেশনের ৩০-শ এসেম্বলি (সাধারণ অধিবেশনে)-তে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষাকে সম্পূর্ণ এবং সর্বাত্মকভাবে নিষিদ্ধকরণের মহান উদ্দেশ্য সোভিয়েতের খসড়া চুক্তিতে ব্যক্ত হয়েছিল।

বিরাট এলাকা জুড়ে তার জনসাধারণ ও পরিমণ্ডলের প্রতি আসল বিপদ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় পাতালের পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষাদি। ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঞ্চলে পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটাতে বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর পরে কানাডার সীমান্তে মিনেসোটাতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য ১২-টি অঙ্গরাজ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক অবস্থার উন্নতি এবং সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্ক সাধারণ পর্যায় আসার সংগে সংগে পারমাণবিক অস্ত্রাদি সীমিতকরণের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে যে পূর্বশর্ত নেওয়ার গুরু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল এবং পরিমণ্ডলের ক্ষতিসাধন করার যা থেকে কমে যেতে পারে সেটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২৮শে মে, ১৯৭৬-এ স্বাক্ষরিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ দলিল স্বাক্ষর করার সময়ে লিওনিড ব্রেজনেভ বলেন: "জোর করেই বলা যায় যে, একটা বেশ ভালো প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হল। নতুন চুক্তিতে এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে পাতালে অস্ত্রপরীক্ষা, যেটা এর বিষয়বস্তু, যেন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে এবং একমাত্র শান্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা করতে যে গ্যারান্টি দরকার তা এতে আছে, সেটা হাতে-কলমে কাজে পরিণত হচ্ছে কি, না, সেটা দেখারও ব্যবস্থা আছে। সংগে সংগে এই চুক্তিতে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য, সেটা অন্য দেশেরও কাজে লাগবে, সোভিয়েত ও আমেরিকার মধ্যে সহযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে।

এর পূর্বে যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলি (পারমাণবিক) অস্ত্রনির্মাণ করাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আরও কয়েকটি পর পর ব্যবস্থা নিয়েছে, এবং এ থেকে সাধারণ ও সর্বাত্মক পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৬০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান এবং সোভিয়েত

ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, লিওনিদ ব্রেজনেভ তাঁর বক্তৃতাতে সোভিয়েত গভর্নমেন্টের নতুন প্রস্তাবের যে রূপরেখা দিয়েছিলেন তাতে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অস্ত্র—পারমাণবিক অস্ত্র—যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলোতে সকল রাষ্ট্রের দ্বারা পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করা যাতে একই সংগে বন্ধ করা যেতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেও পারমাণবিক সর্ব-রকমের বোমার বিস্ফোরণকে স্থগিত রাখা এবং একেবারে বে-আইনী ঘোষণা করে বন্ধ করা তা দাবি করা হয়েছে। ইউনাইটেড নেশন্‌সে এবং বহু দেশের জনসাধারণ সোভিয়েতের শান্তির জন্য এই প্রস্তাবকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছে। এই প্রস্তাবগুলোকে কাজে পরিণত করতে পারলে পরিমণ্ডল রক্ষার কাজেও নিশ্চয়ই সাহায্য হবে।

পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে এরোপ্লেন (বা বোমারু বিমান) যখন উড়ে যায় তখনও পরিমণ্ডলের ক্ষতি হবার ভয় থাকে; বিশেষ করে ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী এই ধরনের পরীক্ষামূলক উড়ার কাজ খুব ব্যাপকভাবে করেছে। এই ধরনের উড়োজাহাজে দুর্ঘটনা ঘটে বারবার "স্থানীয়ভাবে বাস্তব্য অবস্থার পক্ষে বিপদ" সৃষ্টি করেছে, এবং যা থেকে ভবিষ্যতের কয়েক প্রজন্মের 'পরে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে (স্পিটস্‌-বারগেন দ্বীপে, গোল্‌ডসবোরোতে এবং অন্যান্য কয়েক স্থানে)।

পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য গণ-ধ্বংসকারী অস্ত্রাদি এবং পরিমণ্ডলের খুব খারাপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন অস্ত্রাদিকে এমনভাবে মজুদ করে রাখতে হবে যাতে কোনো বিপদ না হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর ফ্লোরিডা উপকূলের কাছে স্নায়ু-গ্যাস ভর্তি আধার ডুবিয়ে দিচ্ছে, বে অফ্ বিস্কে-তে ইউরেটম (ইউরোপের যে-যে দেশে এটমীয় শক্তির ব্যবহার আছে—অনুবাদক) দেশগুলোর পারমাণবিক তেজস্ক্রিয় নির্গত দূষিত পদার্থগুলোকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং এন্টার্কটিকাতে একটি ছোট হ্রদের

বরকেতে দারুণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্নায়ুগ্যাস যে 'হারিয়ে' গেল তাতে সাম্প্রতিক দুনিয়া জুড়ে জনগণের প্রতিবাদ হয়েছে। (এলাকাতে হ্রদের তলাতে কয়েকবছরের জন্য আধারগুলো ফেলে রাখা হয়েছিল, তাতে এলাকার উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা ভীষণ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল)।

জীবমণ্ডলকে সামরিক প্রযুক্তির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে সামরিক-শিল্পগত নানারকম জটিল কাজকর্মের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুক্ত কার্যক্রম চিরাচরিত পথে এখন চলতে পারে; রণনীতিগত অস্ত্রাদিকে সীমিত করতে হবে, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার বন্ধ করতে হবে, রাসায়নিক, জীবাণু ও জৈবিক (বায়োলজিক্যাল) অস্ত্রাদিকে ইত্যাদি বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে। এই ধরনের যুক্ত কার্যক্রমের বিশেষজ্ঞদের কাজের ক্ষেত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগের দ্বারা ইউনাইটেড নেশনসে ও সোভিয়েত-আমেরিকার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিমণ্ডলগত অথবা আবহাওয়াতে কোনো বদল করা চলবে না।

অস্ত্র সীমিতকরণের এবং পরিমণ্ডল রক্ষার ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সাধারণ নাগরিকদের মানবিক ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছে, তাতে আমরা দেখি বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো-এর জন্য তিনটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলোকে কাজে পরিণত করতে পারে।

প্রথমেই, যেটা করা দরকার সেটা হল, মানুষের সংগে মানবিক ব্যবহার করতে হবে আন্তর্জাতিক আইনের এই নীতি মেনে নিয়ে কয়েকটি আনইগত ধারা বিস্তার করা প্রয়োজন। হগ ও জেনেভা কনভেনশনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল-গুলোতে নুরেমবার্গের[৩৮] নীতিগত দলিলে এবং ইউনাইটেড নেশনসের

৩৮. নুরেমবার্গ শহরে ১৯৪৫ সালের শেষে জার্মান নাৎসী বা ফ্যাসিস্তদের যুদ্ধাপরাধের যে আন্তর্জাতিক বিচারশালা বসে সেখানে এই দলিলগুলো গৃহীত হয়—অনুবাদক।

সাধারণ এসেম্ব্লিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই দলিলগুলোর মধ্যে ১৯৪৯ সালে গৃহীত গণহত্যা (জেনোসাইড) সম্পর্কে ইউনাইটেড নেশন্‌সে গৃহীত দলিলগুলো রয়েছে ; তাতে যুদ্ধোপরান্তও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে কয়েকটি নীতিগত ধারণাকে দলিল আকারে গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল—আমাদের গ্রহের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ও তার ভৌগোলিক এলাকাতে গণবিধ্বংসী নানারকমের মারণাস্ত্র পরীক্ষা করার ও তাদের প্রসার বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক আইনে যে সকল দলিল গৃহীত হয়েছে তাদের মেজে-ঘসে আরও ঠিকঠাক করার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা। এই ব্যাপারটার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯৫৯-এর কুমেরুর সম্পর্কে চুক্তি ও সমস্ত দলিলগুলোতে, বায়ুমণ্ডলে, মহাকাশে এবং সমুদ্রগর্ভে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য ১৯৬৩ সালে মস্কোতে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে, ১৯৬৭ সালে লাতিন আমেরিকাতে ত্লাতেলোল্‌কো চুক্তিতে পারমাণবিক অস্ত্র বে-আইনী ঘোষণা করাতে, এবং ১৯৭১ সালে সমুদ্রতলে ও মহাসমুদ্রের তলদেশে পারমাণবিক অস্ত্রাদি না-রেখে দেওয়ার চুক্তিতে (যেখান থেকে সুযোগ মতো তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে—অনুবাদক) এবং এই ধরনের আরও কয়েকটি দলিলে। পরিমণ্ডল ও বাস্তব্য-ব্যবস্থাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করার কাজ থেকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের দলিল ও চুক্তিদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি পদক্ষেপ বলে ধরা যেতে পারে।

শেষ অবধি জীবমণ্ডলের সাংঘাতিক ক্ষতি করতে পারে এই ধরনের বিশেষ রকমের ধ্বংসকারী মারণাস্ত্রদের বে-আইনী ঘোষণা করে দেওয়া এবং সেটা করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া দরকার। এটা করার জন্য গত শতাব্দীতে যে সকল দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাদের দিয়ে শুরু করা যেতে পারে ; ১৮৬৮ সালে "দমদম বুলেট" নিষিদ্ধ করার জন্য সেণ্ট পিটার্সবার্গের দলিল এবং হেগ কনভেনসনে যুদ্ধে এক ধরনের আগে-থেকে

আঘাত যাতে না করা হয় সেটাও বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। এর সঙ্গে ১৯২৫ সালে জেনেভাতে প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে যাতে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের ব্যবহার যুদ্ধে না করা হয়। ১৯২২ সালে ওয়াশিংটনে এবং ১৯৩০ ও ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে নৌযুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবহারকে সীমিত করা হয়েছে এবং ১৯৬৮ সালে পারমাণবিক অস্ত্রাদি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো জীবাণু যুদ্ধের জন্য অস্ত্রাদি বে-আইনী করার ও ত্যাদের নষ্ট করে দেবার জন্য একটা খসড়া দলিল পেশ করে তাতে স্বাক্ষর করে তাকে কাজে পরিণত করার জন্য ব্যবস্থা করেছে; এই দলিলটিকে বিশ্বজনমত ও বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কার্যত প্রথম নিরস্ত্রিকরণের দলিল বলে মনে করছে। রণনীতিগত অস্ত্রাদি সীমিত (strategic arms Limitation বা SALT-সল্ট- অনুবাদক) করার জন্য দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে সোভিয়েত আমেরিকান দলিলগুলোর দ্বারা এইদিকে বিশিষ্ট অবদান রাখা হয়েছে।

যেমন যেমন উপায়ে বর্ণিত তিনটি বিষয় সম্পর্কে সফল ভাবে কাজকর্ম শুরু করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুক্ত কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে, তেমনি গ্রহ পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। প্রকৃতি ও আবহাওয়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে যাতে ক্ষতি না করা যায় তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করা দরকার। আর পরোক্ষভাবে কাজ হল যাতে এই ধরনের ক্ষতিকারক অস্ত্রাদি নির্মাণকল্পে ও বিকাশ সাধনে যে প্রভূত টাকার ও সম্পদের ব্যয় করা হয় তাকে অন্য প্রচেষ্টার খাতে ব্যয় করা যায় যাতে আর্থনীতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাতে কাজ করা যায়: এই শেষোক্ত ব্যাপারের যুক্তিসম্মতভাবে প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে কাজ করার কথাও চিন্তা করতে হবে।

৫ম পরিচ্ছেদ

পরিমণ্ডলের রক্ষা ঃ সহযোগিতা নয় প্রতিদ্বন্দ্বীতা ?

পরিমণ্ডল সম্পর্কে নতুন করে যে খানিকটা ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে, সেটা কয়েকটি রাষ্ট্রের কাজকর্ম থেকে বুঝতে পারা যায় ; আমাদের গ্রহের সেইসকল অঞ্চলে যেখানে বায়ুমণ্ডলের ও জলের ক্রমাগত গুণগত অবনতি ঘটছে এবং কয়েক ধরনের তৃণসম্পদ, ভূমির উর্বরতা ইত্যাদি নষ্ট হতে চলেছে, সেখানে জীবমণ্ডল নিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে। মানুষের পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রে কোনো দেশগত ভেদাভেদ করা যায় না, এবং সেজন্যই প্রতিটি দেশের সম্পদের অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্রকে জোর করে কাজে নামাতে পারলেই (আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য—অনুবাদক), এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা ভালো করেই হতে পারে এবং জীবমণ্ডলকে ঠিকভাবে রক্ষা করা সম্ভব।

নিশ্চয়ই, পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন করতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক এবং মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে কিছুটা মুশকিল দেখা দেবে। তথাপি, জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার একমাত্র সঠিক উপায় হচ্ছে, পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং কারুকে বাদ না দিয়ে সকল দেশের অভিজ্ঞতাকে, তাদের ভৌগোলিক অবস্থানকে এবং তাদের সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের স্তরকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা, যাতে সেই অভিজ্ঞতাকে যুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে ইতিবাচকভাবে ঢোকানো সম্ভব হয়। অন্যভাবে বলতে হলে জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য যুক্ত কার্যক্রম সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা বিশিষ্ট উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্ভাব্য বিকাশ কি ঘটতে পারে তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরিমণ্ডল রক্ষা করার জন্য কাজ করতে হলে তার প্রভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আরও ঘনিষ্টভাবে "বাস্তব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা"-র জন্য কাজ করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা আরও ঐ ধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা করতে তাদের পরিকল্পনার তিনটি দিক আছে। প্রথম, সামান্য কয়েকটি অগ্রসর রাষ্ট্রের যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব আছে তাকে বজায় রাখা এবং অগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্যটাকে বাড়িয়ে তোলা। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, অগ্রসর দেশগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ বেড়েই যাবে, এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ বাতাবরণের অবনতি হবে এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংঘর্ষ বেড়ে যাবে। এর মধ্যে তৃতীয় দিকটাই সর্বাপেক্ষা আশাপ্রদ বলে তাদের মনে হয়। সেটা হল অগ্রসর দেশগুলোর দ্বারা সর্বাপেক্ষা আধুনিক উন্নততম প্রযুক্তির ব্যবহারকে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত কাজকর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা এবং একই সংগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে যে নতুন ধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়ে উঠে তার সম্পর্কে উত্তরোত্তর দায়িত্ব বোধ করা। এই ঝোঁকের দিকে লক্ষ্যরেখে অগ্রসর রাষ্ট্রগুলোকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রক্রিয়াগুলোতে পরিকল্পনা মাফিক বিশেষ হিসেব করে অবিরত এবং তাদের বিকাশের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো থেকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিবর্তন সাধিত করতে হবে (যদিও এই সকল কাজের জন্য সবসময়ে ঠিকমতো সময় পাওয়া যাবে না)।

আমেরিকার ও পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যান্য সংকটাকুল সমস্যার সংগে জড়িয়ে পরিমণ্ডলের রক্ষার সমস্যাকে প্রায়শই বিচার করা হয়। সেগুলো হল : শক্তির সমস্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচা মালের খরচ হয়ে যাওয়া এবং পৃথিবীর মহাসমুদ্রের সম্পদ রাশিকে কাজে

লাগানোর চেষ্টা করা। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর পার্টনার (বা সহযোগী) বলে ধরে নেওয়া হয়। যে দেশগুলো নিজেরা তাদের নানারকমের সংকটের সমাধান করতে পারে। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগে তাদের সম্পর্ক ব্যাপকতর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, আর শেষোক্তরাও তাদের দিক থেকে নানারকমের কাঁচা মাল সরবরাহ করার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে. এবং প্রায়শই বহুজাতিক করপোরেশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দূষিত করে এই ধরনের শিল্পের রপ্তানি হচ্ছে।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশেষ বিশেষ এলাকাতে ও সারা দুনিয়া জুড়ে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত যে কর্মসূচীগুলো বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা হিসেবে নিয়েছেন, তাতে একটা প্রধান ঘাটতি আছে। যদিও স্বীকার করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পরিমণ্ডল রক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে, তথাপি যে তথ্যটা কোনক্রমেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না, সেটা হল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ও আজকের রাষ্ট্রগুলোর সমস্যার মধ্যে যে মৌলিক বিরোধ রয়েছে।

পারস্পরিক বিরোধী সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলো যখন দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে অথবা ইউনাইটেড নেশনসের চৌহদ্দির মধ্যে এবং বিশিষ্ট ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতা করে, তখন তাদের যুক্ত আর্থ-নীতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কাজকর্মকে বিস্তার করতে সাহায্য করে, যা থেকে বিনা ব্যতিরেকে সকল রাষ্ট্রেরই সুবিধা হয়। তবে এই সহযোগিতা থেকে আমাদের কালের বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর প্রধান প্রধান রাজনৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক সমস্যাবলীকে বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই করা যায় না।

পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গীর পরীক্ষা করে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, সহযোগিতার ব্যাপারটা ভালো ভাবেই

ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বিভিন্ন পরিমাণেও পরিধিতে এর সংগে রাজনৈতিক সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে, যদি অগ্রসর নেতৃস্থানীয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

"বাকী জগতের কাছে" সর্বোপরি উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে এই রাষ্ট্রগুলো ভবিষ্যতকে যুক্তিসম্মতভাবে তৈরি করার যথাযোগ্য উপায় হিসেবে এমনভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করে যাতে মনে হতে পারে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সাহায্যেই পরিমণ্ডলের সমস্যাবলীর সমাধান করাও সম্ভব। তারা ইচ্ছে করেই এই তথ্য ভুলে যেতে চায় যে, বায়ুমণ্ডলকে ও তীরবর্তী জলভাগের (inland waters) ও বায়ুমণ্ডলের গুণাগুণকে বিশ্লেষণ করে দেখার যন্ত্র এবং দূষিতকরণ কতোখানি হচ্ছে সেটা আগে থেকে নির্ধারণ করার প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে করা হয়েছে ঠিক এই কারণই যে, তারাই প্রথমে পরিমণ্ডলকে একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে নিয়ে গেল।

কয়েকজন আমেরিকান বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদরা বলতে চান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত যে সম্ভাবনা আছে, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সাম্প্রতিক জগতের একমাত্র নেতা হিসেবে দাবি করতে পারে। 'স্যাটারডে রিভিউ' পত্রিকাতে এ সম্পর্কে এই রকম বলা হয়েছে: "নিজের সমস্যা সম্পর্কে অন্য কোনো দেশকে এতো বেশি ভাবতে হয় না। আমাদের দেশে যথেষ্ট মস্তিষ্কশক্তি (ব্রেন-পাওয়ার) রয়েছে; গণশক্তিও রয়েছে; প্রযুক্তিও আমাদের করায়ত্ত। যেটা আমাদের নেই এবং যা আমাদের পুনরায় পেতে হবে, সেটা হল—আমাদের নিজেদের পরে আস্থা, আমাদের ইতিহাসে ভরসা এবং চিন্তার জয় হবে এই বিশ্বাস।"

উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কেবলমাত্র তাদের দুষ্টক্ষত ও সংকটজনিত রোগগুলো-কেই সারিয়ে দেবে না, পরন্তু নানারকমের আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে সেটা (এই প্রযুক্তিগত উন্নতি), যার

মধ্যে পরিমণ্ডলও রয়েছে, আকাঙ্ক্ষিত অংশীদার করে তুলবে। নেতৃস্থানীয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়া এই ধরনের সহযোগিতার ফলপ্রসূও কাজের হবে না।"

কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের থিওরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে সেটা পরীক্ষা করলে এটা বোঝা শক্ত নয় যে, ১৯৭০ সাল থেকে সারা ভূগোলক সম্পর্কে (যার মধ্যে বাস্তব্য-সমস্যাবলীও রয়েছে) বিচার এবং মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি হবে সে সম্পর্কে লক্ষ্য নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতির রিসার্চ করার লেখকদের কাছে এবং আমেরিকার শাসন-ব্যবস্থার কর্মসূচী-সংক্রান্ত পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত দলিলগুলোর প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারা দুনিয়ার ভূগোলক জুড়ে তার সমস্ত জটিল সমস্যাবলী সমগ্র মানবজাতির সামনে এসে হাজির হয়েছে, তা নিয়ে যে সকল আমেরিকান পণ্ডিতরা সক্রিয়ভাবে কাজ (বা রিসার্চ) করছেন, তাঁরা গোড়াতেই এবং প্রাথমিক যে সূত্ররূপ/মুখবন্ধ ধরে নিয়ে কাজ শুরু করেন, সেটা হল—আজকের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের চেহারাটা দেখা দিচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে। আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই যে এই বিপ্লব অন্যান্য ধনতান্ত্রিক বা উন্নয়নশীল দেশছাড়া প্রথম অতিউচ্চ পর্যায়ে বিকাশিত হয়েছিল, তা থেকে আমেরিকান তাত্ত্বিকরা দাবি করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত ও আর্থনীতিক সম্ভাবনা অনেক বিষয়ে মানুষের পক্ষে সারা বিশ্বের সমস্যার সমাধান পক্ষে একটি অনন্য হাতিয়ার। তাদের যুক্তি অনুসারে কাজেই, এই সম্ভাবনা অন্যান্য যে সকল রাষ্ট্র তাদের নিকট ভবিষ্যতে এতো জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে চায় তাদের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে বাধ্য।

সারা মানবজাতিকে নিয়ে যে সকল সমস্যাবলীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করার জন্য খুঁটিয়ে কাজ করতে হলে সারা ভূগোলোকের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও

সামাজিক বিকাশের জন্য নানারকমের মডেল এবং সিনারিও[৩৯] তৈরি করে নিতে হয়, সেগুলোকেও এর মধ্যে ধরতে হবে। এই ধরনের 'মডেল' ও 'সিনারিও'-র একেবারে ঠিক ঠিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা দৃষ্টান্তপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে তাদের "বৃদ্ধির" সঙ্গে সঙ্গে যেমন উচ্চতর বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও আর্থনীতিক স্তরে পেঁছেছে, তেমনি তাকে আধুনিকীকরণ "মানবিকীকরণ", গণতন্ত্রীকরণ এবং অন্যথা ধনতন্ত্রকে নিখুঁত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এই ধরনের সিনারিও ও মডেলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে এইভাবে দেখা যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ধনতন্ত্র এক বা অন্য ভাবে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন গুলোতে তার প্রভাব বিস্তার করছে। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে এমন কোনো একটি সিনারিও নেই, যেখানে ধনতন্ত্রের পরিবর্তে তার চেয়ে কোনো উচ্চতর পর্যায়ের সামাজিক আর্থনীতিক গঠনকে আনবার কথা বলা হচ্ছে।

এই ধরনের কাজ কর্মের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার জনমতকে বোঝানো যে, যেমন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব অগ্রসর হবে, তেমনি ধনতন্ত্রের যেখানে সম্ভাবনা আছে এবং গোড়াতেই ও প্রাথমিক ভাবে নিশ্চয়ই তার নেতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এবং একমাত্র আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই কয়েকটি আশু সমস্যা সমাধানের প্রযুক্তিগত সম্ভবনার তাত্ত্বিক ধারণাসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাজেই ভূগোলোকের বিকাশের নতুন তত্ত্ব সম্পর্কে একমাত্র গ্যারান্টি হিসেবে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রধান দায়িত্বশীল পদে থাকতে চায়। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো এ সম্পর্কে আনকোরা অনন্য তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও আর্থনীতিক সম্ভাবনা টানতে চায়, যদি অবশ্য এই রাষ্ট্রগুলো

---

৩৯. অর্থাৎ, যেমন ছবি আঁকতে হলে বা সিনেমা তুলতে হলে আগে থেকে ভেবে চিন্তে একটা মডেল বা সিনেমা ছবির দৃশ্যপটে ও কথোপকথন (সিনারিও) লিখে দিতে হয়, সেইরকম—অনুবাদক।

নীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অসম ভাগাভাগি করে দায়িত্ব নেয়, অর্থাৎ যেন রাজনৈতিকভাবে "খেলার নিয়মানুযায়ী" নিয়মকানুন মেনে নেয়।

সমগ্র মানবজাতিকে প্রভাবিত করতে পারে এই ধরনের ভৌগোলিক সমস্যার সর্বাত্মক ও প্রায়োগিক চরিত্র, যার মধ্যে রয়েছে পরিমণ্ডল রক্ষা, খাদ্য উৎপাদন, প্রাকৃতিক সম্পদের সামগ্রিক হিসেব করে তার যুক্তি সম্মত ব্যবহার, শক্তির উৎপাদন এবং মহাকাশ ও মহাসমুদ্রের পর্যটন ক'রে নতুন সম্পদ আবিষ্কার করা—এ সবই সকল রাষ্ট্রের দ্বারা সমাধান করা প্রয়োজন. হয় স্বতন্ত্রভাবে আর নয়তো দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে উন্নত বিকাশমান রাষ্ট্রগুলোর পুরো সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে।

নতুন অবস্থার বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে না পেরে কয়েকজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের (প্রধানত এঁরা প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে কাজ করেন) কাছে আমেরিকান প্রযুক্তি তার সামাজিক অর্থনীতিক তত্ত্বগুলো ও ম্যানেজ-মেন্ট (কাজ চালাবার) প্রয়োগ কৌশলগুলো এবং গভর্নমেন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কয়েকটি বড়ো একচেটিয়াদের কয়েকটি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা এ সবই যেন স্বতঃসিদ্ধ এবং অন্য রাষ্ট্রগুলোর ভৌগোলিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে যে করণীয় আছে এটা তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চান না।

আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে যেমন শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের বদল হচ্ছে এবং অন্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি সামরিক কাজকর্মের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে কমে যাচ্ছে, তেমনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতারা ও তাত্ত্বিকরা অন্য রাষ্ট্রগুলোকে নতুন কায়দায় প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। কাজেই অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে নতুন প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহার এবং অতীতে গৃহীত তড়িঘড়ি ভেবে-ঠিক-করা, আশু প্রায়োগিক প্রয়োজনের দিক চোখ রেখে প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্ত করা—এ সবই আগেকার দিনের মতো করা হচ্ছে।

মার্কিন বিজ্ঞানের সাধারণভাবে সারা ভূগোলক ব্যেপে প্রযুক্তিগত

সমস্যার অনুধাবন করার এটা একটা বৈশিষ্ট্য। বাঁধা সড়কের বাইরে একটু খাপছাড়া (unconventional) তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের রূপায়ণ করার জন্য অনুধাবন করা হচ্ছে এবং সেটা তখন অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একটা পদ্ধতিগত ভিত্তি হিসেবে পেশ করা হবে সেটাই তখন হয়ে দাঁড়াবে "ভূগোলকের প্রযুক্তিগত কাঠামো" ("global technostructure") অর্থাৎ, তাতে থাকবে অগ্রসর প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলো ; এর ফলে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা, পরিমণ্ডলের গুণগত দিক থেকে ঠিক রাখা, সম্পদের সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করা, এবং মহাকাশ ও মহাসমুদ্রকে ব্যবহার করা—এ সবই তখন সম্ভব হবে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের দশকগুলোতে এই নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে রূপান্তরণের কথা ভাবা হচ্ছে—মার্কিন তাত্ত্বিকদের কাছে তাহলে "ভূগোলকের প্রযুক্তিগত কাঠামো" তৈরি করার কাজটা শেষ করা সম্ভব হবে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই এর চাবিকাঠিটি থাকবে।

আমেরিকার রাজনৈতিক নেতারা এবং কয়েকজন কর্তৃত্বসম্পন্ন তাত্ত্বিকদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অবিচ্ছেদ্য উপাদান হল আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা। কাজেই, "গৃহজীবনের জন্য প্রয়োজনীয়" (সিভিলিয়ান) বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্য রয়েছে, যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে ব্যবহার করলে বাস্তব মূল্যবোধের ক্ষয় হয়ে যাবে এবং জনসংখ্যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার অগ্রসর উপাদানগুলোকে একটি বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, যাতে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার সমস্যার মোকাবেলা করা যেতে পারে, যার দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের, তার মধ্যে মহাসমুদ্রও থাকবে, যুক্তিসম্মত ব্যবহার করা যেতে পারে, শক্তির সূত্রগুলোকে সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা যেতে পারে, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা যেতে পারে, আবহাওয়ার

পূর্বাভাষের অফিসের কর্মক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার কতোখানি কি হবে তার ঠিক ঠিক হিসেব করা যেতে পারে এবং মহাকাশ প্রযুক্তির ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করার জন্য সম্ভাবনাকে আরও বাড়ানো যেতে পারে।

পররাষ্ট্রনীতিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলাফলের ব্যবহার করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণভাবে কি করতে চায় সেটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বাণীতে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে পলিসিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়। ১৮-ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০-তে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বাণীতে বলা হয়েছে, যে-অবস্থাতে মানুষের "হাতে স্বর্গকে (আকাশকে) পর্যটন করতে এবং মর্ত্যকে (পৃথিবীকে) শ্মশানে পরিণত করার ক্ষমতা এসেছে", তাতে শান্তির জন্য বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির সাফল্যকে নিয়োজিত করতে হবে এবং সকল রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলাফল তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পররাষ্ট্রনীতিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলাফলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি মনোভাব নিয়ে দেখবে সে সম্পর্কে ১৯৭১-এর প্রেসিডেন্টের বাণীতে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। যেমন, প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন,' "একমাত্র ব্যাপকভাবে খবরা-খবরের (বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি থেকে—লেখক) আদান প্রদান থেকেই মানবজাতির স্বার্থকে রক্ষা করা নিশ্চিত হতে পারে, আর দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখলে এই ধরনের আদান-প্রদানে অন্য যে কোন জাতির মতো আমরাও লাভবান হবো।" তারপরে বাণীতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি ভূমিকা হবে সে সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা হচ্ছে : ..."অন্য অনেকের অপেক্ষা আমরাই নতুন জ্ঞানকে সর্বাপেক্ষা বেশি আয়ত্ত করে ব্যবহার করতে পারি।" যথেষ্ট সম্ভবনাপূর্ণ সুবিধা থাকার জন্য ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত খবরাখবরের বেশি বেশি আদান-প্রদানের জন্য আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল।"

১৯৭৩ সালের পররাষ্ট্রনীতির পলিসির বাণীতে এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সুবিধাগুলো কি করে ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে 'শান্তি সম্পর্কে ভূগোলক জুড়ে চ্যালেঞ্জ' নাম দিয়ে একটা অংশ আছে। এই অংশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব সম্পর্কে সারা ভূগোলক জুড়ে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কি মনোভাব হবে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে, যাতে বলা হচ্ছে, "বিশ্বের ও সারা দুনিয়ার মানুষের স্বার্থে তাদের একজোটে কাজ করতে হবে।" আমেরিকান পণ্ডিতদের তাত্ত্বিক লেখাপত্রের মতোই এই সরকারী দলিলেও রাষ্ট্রগুলোর বিকাশের সামাজিক-আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলোকে দেখার চেষ্টা হয়েছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতাদের মতে এই সকল সমস্যাই জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থের ও মতাদর্শগত গণ্ডির ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি ভূগোলকের প্রযুক্তিগত সমস্যার রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারি অফ স্টেট্ খাদ্য, শক্তি, পরিমণ্ডলের রক্ষা, মহাকাশ পর্যটন এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ সমস্যাবলী নিয়ে বিভিন্ন বিবৃতির মারফত তাঁদের বক্তব্য ও মন্তব্য বারবার পেশ করেছেন।[৪০] যেমন, ১০-ই এপ্রিল, ১৯৭৫ সালে আমেরিকান কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে জেনারেল ফোর্ডের বক্তব্যকে নাম দেওয়া হয়েছে "দুনিয়ার অবস্থা" (প্রেসিডেণ্টের "আমেরিকার

---

৪০. আজকের দিনের চালু কাজ করার পদ্ধতিকে লক্ষ্য করা দরকার, যেখানে আজকের দুনিয়ার সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রধান দলিলগুলো রচনা করা হয় বুর্জোয়া পদ্ধতিগত ও মতাদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে, যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। এই ধরনের কাজ করার রেওয়াজ থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাম্প্রতিক জগতের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলোর বুর্জোয়া সমাজ বিজ্ঞানের বাঁধা ধরা ছকের মধ্যে ফেলে বিশ্বজনমতের সামনে তাকে উপস্থিত করা।

যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা" শীর্ষক বাণীর অনুকরণে)। তাতে প্রেসিডেন্ট বলতে চেয়েছেন : "আমাদের দেশ আজ যে পথ ধরে এগোবার চেষ্টা করছে আজকের দুনিয়ার পক্ষে আমাদের জাতি ও সমগ্র মানবজাতির পক্ষে সেটার তাৎপর্য এর চেয়ে বেশি আর কখনও ছিল না।" আমাদের কালের সারা ভূগোলকের সমস্যাকে ব্যাখ্যা করে সেক্রেটারি অফ্ স্টেট্ হেনরি কিসিংগার একটি বক্তৃতাতে এরই অনুসরণ করে বলছেন : "আমাদের কূটনৈতিকতার মধ্যমণি হচ্ছে এই গ্রহে আমাদের পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা। শক্তি, সম্পদসমূহ, পরিমণ্ডল, জনসংখ্যা, মহাকাশ ও মহাসমুদ্রকে ব্যবহার করা—এই সব সমস্যাগুলো থেকে যে লাভ ও ভার বইতে হয় তা জাতিগত সীমানাকে উত্তরণ করে। আগামী দিনের প্রজন্মের কাছে রাজনৈতিক সংঘাতের বীজ তারা ধরে রেখেছে, আন্তর্জাতিকভাবে মানবগোষ্ঠীর সামনে নতুন ধরনের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও কূটনৈতিকতার তারা দাবি করে।" এই বক্তৃতাতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে ধারণাকে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, যেন সমপর্যায়ে ও পারস্পরিক সাহায্য হতে পারে এইরকম সহযোগিতার একটি বিকল্প হিসেবে এটাই বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

এই ধারণার ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিকাশপ্রাপ্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো একটা নতুন "আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ব্যবস্থা" গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করে, যে ব্যবস্থার মধ্যে তারা তাদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে ওয়াশিংটনে "প্যাসেম্ ইন্ টেরিস চতুর্থ"[41] কনফারেন্সে ইউ. এন. ই. পি-র এক্‌জিকিউটিভ ডিরেক্টার, মরিস স্ট্রং এই ধরনের ব্যবস্থাপনার কি প্রয়োজন তা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন : "এর প্রয়োজন আসছে প্রযুক্তিগত সভ্যতার অন্তর্নিহিত চরিত্র এবং পারস্পরিক নির্ভরতার জটিলতা থেকে। ধরে নিতে পারেন যে, একটা পুরো ভূগোলক

---

৪১ ৩৯. পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের জন্য পোপ কর্তৃক আহুত বা সংগঠিত খ্রিস্টান ধর্ম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কনফারেন্স—অনুবাদক।

জুড়ে আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে যদি হাতে-কলমে চালু করে বাস্তব করতে হয় তাহলে তার অপরিহার্য অংগ হচ্ছে প্রযুক্তিগত সভ্যতাকে কার্যক্রম করতে হবে।"

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের, অর্থনীতির পাল্টা দিকটাকে সাকল্য-সূচকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে কাজে লাগাবার সম্ভাবনাকে বিচার করে, এবং যেখানে রিসার্চ ও বিকাশের প্রক্রিয়াকে আরও বেশি জটিলতর করে যার জন্য শ্রম ও সম্পদ প্রয়োজন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ আর্থ-নীতিক সমস্যাকে সমাধান করার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই রিসার্চের সম্ভবনাকে বাড়িয়ে তুলছে না, পরন্তু অন্য রাষ্ট্রের উপরেও তার রাজনৈতিক প্রভাবের পরিধি প্রচুরভাবে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

১৯৭০ দশকে আমেরিকার "প্রযুক্তিগত কূটনীতি" কোনো কোনো ক্ষেত্রে "পারমাণবিক কূটনীতি"-কে এবং "বৃহৎ শক্তির দাঙাবাজি করার মানোবৃত্তি-সূচক কূটনীতি" (diplomacy of the Big Stick)-কেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর ভিত্তি হচ্ছে, এই বাস্তব সত্যকে আমেরিকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিক থেকে স্বীকার করে নেওয়া যে, ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বাধীন-ভাবে রিসার্চ চালাতে পারে না অথবা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে প্রোজেক্ট (বা পরিকল্পনা) প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে অক্ষম (কমপিউটার, এ্যাটমীয় শক্তি রকেট প্রক্ষেপণের কৌশল জীবদেহের আণবিক গঠন সংক্রান্ত, মহাকাশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পৃথিবীর সম্পদশালীর দূর নিয়ন্ত্রণমূলক যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা)। ঐ থেকে আশা করা যায় যে, আগামী দশকগুলোতে দুনিয়া জুড়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের জন্য, যাতে অন্য রাষ্ট্রদের টানা যায়। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র নিজেকে যেন এই প্রক্রিয়ার "কেন্দ্রবিন্দু" ("centre of gravity") বলে মনে করতে পারে। একই সময়ে বৈজ্ঞানিক অথবা প্রযুক্তিগত ঝোঁকের এক বা অপর দিক অথবা অর্থনীতিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাকল্যের দিকটা (এবং এই

সাফল্যের অনেকখানিই নিয়ন্ত্রণ করবে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র) অনেক রাষ্ট্রকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন প্রযুক্তিগত বিদ্যা দান করতে যে রাজনৈতিক শর্তটুকু আরোপ করতে চায় অথবা একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যাকে সমাধান করতে যে যুক্ত কার্যক্রমের কথা বলে—সে সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে।

"প্রযুক্তিগত কূটনীতি"র নীতিসমূহ যেটা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, একেত্রে অসম দ্বিপাক্ষিক অথবা বহুপাক্ষিক পরিমণ্ডলগত প্রোগ্রাম সংগঠিত করার ব্যবস্থা করছে। তাতে যারা যোগ দেবে তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এবং ধনতান্ত্রিক জগতের অন্য কয়েকজন "প্রযুক্তিগত নেতার" পক্ষে যার এমন কতকগুলো বাধ্যতামূলক শর্ত আরোপ করবে ; বায়ু ও জল দূষিত করণের বিরুদ্ধে ও উচ্ছিষ্ট ফেলে-দেওয়া দ্রব্যকে পুনরায় কি করে কাজে লাগানো যায়, সে সম্পর্কে এই নেতাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা অগ্রসর প্রযুক্তির জ্ঞান রয়েছে।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আর এক ধরনের চাপ দেওয়া হয় যেটাতে "প্রযুক্তির কূটনীতি"-কে সামরিক রাজনৈতিক ব্লকের চৌহদ্দির মধ্যে ফেলে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পরিমণ্ডল-সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং এই ভাবে এই ধরনের মুমূর্ষু আগ্রাসী গ্রুপগুলোকে নতুন জীবন দান করা হয়। বিশেষ করে ন্যাটোর মধ্যে কাজ করে "আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্য কমিটি" ১৯৭৪-৭৫ সালে পরিমণ্ডল রক্ষা, শক্তি, ভূগোলকে জনসংখ্যার বিন্যাস, খাদ্য ও কাঁচা মাল সংক্রান্ত ব্যাপারে কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পরিকল্পনার (প্রোজেক্টের) কথা ভেবেছে। তা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনাগুলো থেকে সত্যকার উপকার আশা করা প্রায় যায় না, (কারণ) আগ্রাসী সামরিক ব্লকের সভ্য হবার নীতির উপরে ভিত্তি করেই তাতে অংশগ্রহণ করা কি না করা নির্ভর করে।

নিশ্চয়ই সোভিয়েত-ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর

সংগে সহযোগিতার প্রশ্নে এই-ধরনের 'চাপ সৃষ্টির কৌশল' কাজে লাগে না ; এই দেশগুলোর নিজেদেরই যথেষ্ট আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা রয়েছে, যেটা আমেরিকার থেকে কোনো অংশে খাটো নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ২৪-শ পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টে এই সমস্যাসম্পর্কে ভালো করেই রূপায়ণ করা হয়েছে : "পরিমণ্ডলের রক্ষা, শক্তির ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশ, পরিবহণও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সর্বাপেক্ষা বিপদজনকও ব্যাপক রোগের থেকে রক্ষার ও তাদের নির্মূল করার ব্যবস্থা, এবং মহাকাশ ও মহাসমুদ্রে পর্যটন করা ও সে ব্যাপারে আরও উন্নত ব্যবস্থা করা—এ সকল ক্ষেত্রেই আমাদের দেশ অন্য রাষ্ট্রগুলোর সংগে একজোটে কাজ করতে প্রস্তুত।" ২৫-শ কংগ্রেসে কর্মসূচী সংক্রান্ত এই প্রস্তাবগুলোকে আরও বিকশিত করা হয়েছে।

লেনিনীয় পররাষ্ট্রনীতি, যেটা সমানাধিকারের ভিত্তিতে অন্য দেশের জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা স্বীকার করার এবং বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিমণ্ডল রক্ষা করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা সেই মূল নীতি থেকে পৃথক করে দেখা যায় না।

১৯২০ ও ১৯৩০ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ করে যে চুক্তিগুলো তার ভৌগোলিক প্রতিবেশিদের সংগে করেছিল এই মৌলিক নীতিগুলো থেকেই তার উৎপত্তি ও তাতেই সেগুলো পাওয়া যাবে।

১৯২২ সালে রাশিয়ান সোস্যালিস্ট ফেডারেশন অফ সোভিয়েত রিপাবলিক[৪২] ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে জলের ব্যবহার ও মাছ ধরার শর্ত নিয়ে এবং ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তুরস্কের মধ্যে চুক্তি হয়। ১৯২০ দশকের শেষ দিকে ক্যাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণাংশে যুক্তভাবে মাছ ধরার ও চাষ করার

৪২. আমরা সাধারণভাবে যাকে রাশিয়া অথবা রুশ জাতির দেশ বলে জানি, সেই রুশিয়াতে প্রথম ১৯১৭-এর নভেম্বরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবার পরে তার বিরাট অঞ্চলের

ব্যাপারে ইরানের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়। অন্য শর্তের মধ্যে বিশেষ করে বিস্ফোরক বা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে মাছ ধরার বিরুদ্ধে—কঠিনভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মাছ ধরার ব্যাপারে চুক্তি করা ছাড়া মঙ্গোলিয়ান পিপ্‌লস রিপাবলিক ও চীনা পিপলস্ রিপাবলিকের সংগে বনেতে দাবানল নিবারণের ব্যাপারেও চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। সোভিয়েত-পোলিশ সহযোগিতায় জটিল ধারা-উপধারার মধ্যেই প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার ব্যাবস্থাদি রয়েছে। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ফেডারাল রিপাবলিক অফ্ জার্মানি (পশ্চিম জার্মানি), গ্রেট ব্রিটেন, জাপান ও অন্যান্য অনেক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সংগে পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে যুক্ত পরিমণ্ডল সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়।

ইউরোপে নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা পরিমণ্ডল সংক্রান্ত যুক্ত কার্যক্রমের অন্যতম অংগ হিসেবে ইউরোপীয় দেশগুলো প্রচুর নজর দিচ্ছে। বিশেষ করে, স্ক্যান্‌ডিনোভিয়ান[৪৩] রাষ্ট্রগুলোর কাজকর্ম সম্পর্কে—বিশেষজ্ঞরা প্রচুর প্রশংসা করেছেন, তারা তাদের ভৌগোলিক অঞ্চলের চৌহদ্দির মধ্যে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য যুক্ত কার্যক্রম চালু করেছে।

ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা স্থাপনের জন্য কনফারেন্সে যে সকল

কিছু কিছু উপজাতিদেরও নিয়ে রাশিয়ান সোস্যালিস্ট-ফেডারেশন অফ্ সোভিয়েত রিপাবলিক গঠিত হয়।

১৯২২ সালে এই রাশিয়ার সঙ্গে পূর্বতন জার সাম্রাজ্যের পদানত অন্য দেশগুলোতে বিপ্লব হলে, যার মধ্যে আজুরবাইজান প্রভৃতি পাঁচটি মধ্য-এশিয়ার রিপাবলিকও আছে,—এদের সকলকে নিয়ে ইউনিয়ন অফ্ সোসালিস্ট সোভিয়েত রিপাবলিক (বা ইউ, এস্. এস্. আর) বা ছোট কথায় সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হল।

রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিক বা আর, এস্. এফ. এস্. আর ১৯২২-এর পর থেকে সংবিধান অনুসারে বৃহত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি অঙ্গ রাজ্য—অনুবাদক।

৪৩. অর্থাৎ ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনকে নিয়ে উত্তর ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো —অনুবাদক।

রাষ্ট্র যোগ দিয়েছিল তারা সহযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। কনফারেন্সের শেষ বয়ানে বলা হয়েছে, "দেশে দেশে জনসাধারণের ও বিভিন্ন দেশগুলোর আর্থনীতিক বিকাশের জন্য অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে, পরিমণ্ডলের রক্ষা ও তার উন্নতি সাধন করা, ঐকই সঙ্গে প্রকৃতিকে রক্ষা এবং তার সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহার করতে হবে।" আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রতিটি যোগদানকারী রাষ্ট্রই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেবে এবং দেখবে, যাতে তার আর্থনীতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কাজকর্ম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কোনোও ক্ষতিসাধন না করে।

শেষ বয়ানের বিশেষ অংশ দেখানো হয়েছে, "নিরোধীসূচক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেই পরিমণ্ডলের ক্ষতি হওয়া এড়ানো সম্ভব।" কাজেই যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলোর অভিলাষ যে, "প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে বাস্তব্য ভারসাম্যকে রক্ষা করে।" "যুবকদের বিশেষ করে এবং সকলকে ক্রমাগত ও খুঁটিয়ে শিক্ষা" দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তারা স্বীকার করে তারা বুঝিয়ে দিতে চায় কি করে পরিমণ্ডলের গুণাগুণ রক্ষা ও উন্নত করা যেতে পারে।

যোগদানকারী রাষ্ট্ররা মেনে নিয়েছে যে, "পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে প্রতিটি সুযোগ-সুবিধাকে তারা ব্যবহার করবে" এবং প্রধান প্রধান বিষয়গুলোতে বিশেষ করে, যেমন : বায়ু ও জলের দূষিতকরণকে নিয়ন্ত্রণ; টাটকা পরিষ্কার জলের ব্যবহার; সমুদ্রগর্ভের (বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরের) সম্পদকে রক্ষা; জমির দূষিতকরণকে বন্ধ এবং ভূমির যুক্তিসম্মত ব্যবহার (যাতে তার উর্বরত্ব নষ্ট না হয়); প্রকৃতিকে রক্ষা করা ও তার সম্ভাব্য সম্পদকে (রিজার্ভকে) নষ্ট না হতে দেওয়া; মানুষের বসতির ক্ষেত্রে পরিমণ্ডলের অবস্থার উন্নতি সাধন করা; মৌলিক রিসার্চ ক'রে পরিমণ্ডলের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, তাকে আগে থেকে বুঝতে পারা, এবং তার যাচাই করা এবং আইন ও শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপায় উদ্ভাবন করতে গিয়ে সাম্প্রতিক ইউনাইটেড নেশনসে ও অন্যান্য সংগঠনে সাম্প্রতিক যা কিছু বলা হয়েছে তার প্রায় সবটাই শেষ বয়ানের প্রধান দলিলগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলো ঘোষণা করেছে যে, "মানুষের পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য স্টকহোলমে যে ঘোষণা (Stockholm Declaration on the Human Environment) করা হয়েছে, সেই অনুসারে পরিমণ্ডল রক্ষার ব্যাপারে তারা অগ্রসর হবে, তারা ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল এসেমব্লির সাধারণ সভার এবং পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য প্রাগ সিম্পোসিয়ামে ইউনাইটেড ইউরোপীয় নেশনসের আর্থ-নীতিক কমিশনের দলিলগুলোও বিচার করে দেখবে।"

যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলো নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজের ধারার ও সহযোগিতার কাঠামোর তালিকা তৈরি করেছে বৈজ্ঞানিকও প্রযুক্তিগত তথ্যের আদান-প্রদান ; বিশেষজ্ঞদের কনফারেন্স, আলোচনাসভা ও মিটিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে ; বৈজ্ঞানিকদের, বিশেষজ্ঞদের ও শিক্ষার্থীদের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ; কর্মসূচীগুলোকে কাজে পরিণত করার জন্য যুক্তভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য নানারকমের সমস্যার অনুধাবন করে তাদের সমাধানের জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে ; পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য ব্যবস্থাদির মানগুলো যাতে পরস্পরের সংগে সংহতি সাযুজ্য রেখে চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে ; পরিমণ্ডলের রক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশেষ করে আন্তর্জাতিকভাবে তার ফলাফল কি হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ করতে হবে।

ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংক্রান্ত কনফারেন্স সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সংগে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের দেশগুলোর দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার কাজটা গুণগতভাবে নতুন স্তরে নিয়ে গেছে।

ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপক কর্মসূচী করার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে, বাল্টিক সমুদ্রে যুক্তভাবে যা করা হচ্ছে। ১৯৬৯ সালে পোলাণ্ড, জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক, ফেডারাল রিপাবলিক অফ জার্মানি, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বাল্টিক সমুদ্রকে দূষিতকরণ না-করার জন্য প্রোটোকল (বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা সংকলিত কূটনৈতিক দলিল—অনুবাদক) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তখন থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে একজোটে কাজ করা হচ্ছে। বাল্টিক সমুদ্রকে দূষিতকরণ কমাবার জন্য কি ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে, সেটার মূল্যায়ন করার জন্য সমুদ্রগর্ভের (বা সামুদ্রিক) দূষিতকরণকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিজ্ঞতা অনুধাবন করে বহুপাক্ষিক কাজকর্ম চালু করতে হবে। কাজেই, বাল্টিককে রক্ষা করতে যে সকল দেশ সহযোগিতা করছে তারা নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষ্ণ ও এজভ সাগরের গর্ভ নিয়ন্ত্রণ করার অভিজ্ঞতা থেকে প্রচুর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে বিশেষ করে জলের সম্পদকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, যা থেকে যথেষ্ট পরিমণ্ডল রক্ষা করার ব্যাপারে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে একমাত্র ১৯৭৩ সালেই লিউনা রাসায়নিক পুরো ব্যবস্থাপনাতে বায়ু ও জল দূষিতকরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৮-টি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সেচজুট-এ তৈল শোধনাগারের যে পুরো ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে তাতে নির্গত পদার্থের তিনস্তরের পরিশোধনের ব্যবস্থা রয়েছে, এবং তার ফলে ওডার নদীতে নিষ্কাশিত পদার্থ সমূহ পরিশুদ্ধ হয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। নির্গত দূষিত পদার্থ সমূহকে পুনরায় পরিশুদ্ধ করে নেবার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক কাজ করেছে এবং তা থেকে কোনো ক্ষতি না হয়ে তারা নষ্ট হয়ে যায়। যুক্ত কার্যক্রমের জন্য জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের কার্যক্রমকে অনুধাবন করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক পরিধি নিয়ে সমুদ্রের ও মহাসমুদ্রের দূষিতকরণের সমস্যা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবেও কাজ করা হচ্ছে। ৮০-টি দেশের প্রতিনিধিরা ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে দুইসপ্তাহ ব্যাপী কনফারেন্সে লণ্ডন শহরে মিলিত হয়েছিলেন। নির্গত বর্জিত (waste)·ও অন্যান্য পদার্থ ফেলে যাতে সমুদ্রের জল সম্পদকে দূষিত না করা হয় তার জন্য এই কনফারেন্সে একটি আচরণ-বিধি, যা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু মোটামুটি সবাই মেনে চলবে[৪৪]। সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে বিপজ্জনক শিল্পজাত ময়লা ফেলা চলবে না, বিশেষ করে যে সকল বর্জিত পদার্থের তেজঃস্ক্রিয় পদার্থসমূহ আছে, যেমন পারা, ক্যাডমিয়াম—এই মর্মে কনভেনশন থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। আর এক ধরনের নিষ্কাশিত আবর্জনা, যাকে বিশেষভাবে পরিশোধনের ব্যবস্থা করে সমুদ্রে ফেলা চলে; সেগুলো এমন ধরনের বস্তু, যার মধ্যে রয়েছে জিংক, তামা, সীসা প্রভৃতি। তৃতীয় ধরনের পদার্থ, যা কনভেনশনে তালিকাভুক্ত রয়েছে তার মধ্যে এমন ধরনের আবর্জনা রয়েছে যা সাধারণভাবে সমুদ্রে ফেলা যায়, কিন্তু বিশেষভাবে তার শর্তগুলো মেনে চলতে হয়, যার মধ্যে ক্ষতিকারক বস্তুসমূহের ঘনত্ব কতোখানি, কোথায় ফেলা হবে এবং অন্যান্য সাবধানতা নিতে হবে। এই কনভেনশনের ধারাগুলো গৃহীত হলে বলটিক সাগরের পরিবেশের গুণাগুণও উন্নীত হবার মতো অবস্থার সৃষ্টি হবে।

ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে পরিবেশের রক্ষায়, পরিবহণের ও শক্তির ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য ইয়োরোপের দেশগুলো নিয়ে কংগ্রেস এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কনফারেন্স করার যে ধারণা লিওনিদ ব্রেজনেভ দিয়েছিলেন, তাকে কাজে পরিণত করতে পারলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর সহায়তার 'পরে ভিত্তি করে ব্যাপক সমস্যার সমাধানের পথে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব।

---

৪৪. ইংরেজিতে যাকে বলা হয় "কনভেনশন"—convention বা conventional behaviour ইত্যাদি। কনভেনশনের আর একটি প্রয়োগ আছে, যার অর্থ কনফারেন্সের প্রায় সমার্থক, সেই অর্থে নয়—অনুবাদক।

বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইউরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির কনফারেন্সে আখেরে গৃহীত প্রধান দলিলে সোভিয়েতের এই উদ্যোগকে আরও বিকশিত করে বলা হয়েছে; "আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোরদার করে নিরস্ত্রীকরণের জন্য প্রায়োগিক দিক থেকে হাতে-কলমে তাকে কাজে পরিণত করতে পারলে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের সঠিক ন্যায়সংগত সমাধান করে শান্তি সুরক্ষিত করার জন্য ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন। নতুন ও ন্যায়সংগত সমানাধিকারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্যও এই সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। দুনিয়াতে ক্ষুধা ও নিরক্ষরতা দূর করতে, পরিমণ্ডলকে রক্ষা করতে, বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রের দূষিতকরণ বন্ধ করতে এবং যারা নতুন শক্তির উৎসের বিকাশ সাধন করতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে এড়াতে এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক রোগগুলো বন্ধ করতে ও সারাতে চায়—তাদের পক্ষে এই সকল জটিল ও মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে এই ধরনের সহযোগিতা কার্যকরী।

সি. এম্. ই.-এ সভ্য রাষ্ট্রগুলোর যুক্ত কার্যক্রমের দ্বারা আজকের আন্তর্জাতিক অবস্থাতে পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য অগ্রসর ধরনের ন্যায়সংগত সমানাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করার যেন একটা নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং (পরিকল্পনা) ও ম্যানেজমেণ্ট (প্রশাসন-ব্যবস্থা) করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করার কাজটা আরও কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে। পরিমণ্ডল রক্ষার ও তাকে বাড়াবার জন্য কাউন্সিল (Council for Environmental Protection and Enhancement), যেখানে সভ্য-রাষ্ট্রগুলোর কার্যক্রমের জন্য সি. এম. ই-এ-র পাকাপাকি আন্তঃগভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠান রয়েছে; তারা রিসার্চের প্রধান ঝোঁককে নির্ধারণ করে এবং যুক্ত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের যোগান দেয়।

সি. এম. ই-এ অন্তর্ভুক্ত সভ্য-দেশগুলোর এবং যুগোস্লাভিয়া পরিমণ্ডল

রক্ষা করার ও তাকে বাড়াবার জন্য যুক্তভাবে বিস্তারিত সহযোগিতার প্রোগ্রামের এবং অক্টোবর ১৯৭৪ সালে গৃহীত প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহারের জন্য সি. এম্. ই.এ-র একজিকিউটিভ কমিটির ১৫৯টি বিষয় নিয়ে কাজ করেছে। সি. এম্. ই. এ সভ্য-দেশগুলোর ও যুগোস্লাভিয়ার ৬৬০টি নকসা (ডিজাইন) ও রিসার্চ করার ইনস্টিটিউট রয়েছে।

এই সহযোগিতার প্রথম ফলাফল ইতিমধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; সি. এম. ই. এ-র সভ্য-রাষ্ট্রগুলোর হাতে ৫০-টি ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণ খুঁজে বার করার জন্য, শিল্প থেকে নির্গত গ্যাস পরিষ্কার করার জন্য, এবং আরও অনেক নতুন ধরনের উপকরণের ও যন্ত্রপাতির। ইন্টারগ্যাজোচিৎস্কার মতো নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক রিসার্চ ও উৎপাদনের সংগে যুক্ত ব্যবস্থাদি রয়েছে যাতে নির্গত গ্যাস পরিশোধন করা যায়, এবং ইন্টারভোদোচিৎস্কা রয়েছে যাতে জলকে পরিশুদ্ধ করা যায়—এগুলো এখন বসানো হচ্ছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক সমস্যা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বহুধরনের সহযোগিতা মৌলিক সমস্যা নিয়ে রিসার্চের ব্যবস্থাও করছে। যেমন, জার্মান গনতান্ত্রিক রিপাবলিকে, মহাসমুদ্র ও বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে যুক্তভাবে কাজ (রিসার্চ) করা হয়েছে, যার ফলাফল সমুদ্র যাত্রা করতে এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রভৃতি জানাতে কাজে লাগে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোলাণ্ড নোংরা বর্জিত জল থেকে যে পলিমাটি পড়ে তাকে ঘন করে ও জমির সারের জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের সংগে যুক্তভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন গৃহস্থবাড়ি থেকে নির্গত পদার্থদের বিষমুক্ত করে তাকে পুনরায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক ও চেকোস্লাভ্যাকিয়া যুক্তভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে এমন উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকেই পরিমণ্ডলের

রক্ষার জন্য তাদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারলে তবেই একমাত্র আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপিত হতে পারে—এ রকম মনে করা ভুল হবে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো প্রকৃতি সম্পর্কে কাজ করতে গিয়ে কি কি ভুল করেছে, সেটাকেও হিসেবের মধ্যে নিলে তবেই উন্নয়নশীল দেশগুলোও শুধু যে নিজেদের কাজকর্মকে যুক্তিসম্মতভাবে সংগঠিত করতে পারবে, তাই নয়, পরন্তু দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা স্থাপন করার ফলপ্রসূ পন্থা উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাঠামোর মধ্যেই পরিমণ্ডলগত সমস্যার সম্পর্কে মৌলিক পন্থা অবলম্বন করতে পারবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিমণ্ডলের অবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, এমন কি যেখানে আর্থনীতিক বিকাশের স্তর এবং ভৌগোলিক অবস্থা সমপর্যায়ে রয়েছে, সেখানে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থাবলীতে লক্ষণীয় ভাবে বিভিন্ন ধরনের জল পাওয়া যায়। যে সকল দেশে গভর্নমেণ্টরা বিশেষ যত্ন নিয়ে ব্যবস্থাদি নেবার চেষ্টা করে, সেখানে পরিমণ্ডলের অবস্থা খারাপ হওয়া দূরে থাক নানাভাবে আরও উন্নত হয়। যেমন মালয়েশিয়াতে, ১৯৭২-এর মাঝামাঝি একটা কমিটি করে সেখানে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়। তাতে গভর্নমেণ্টের মন্ত্রীমণ্ডলীর এবং অন্য ডিপার্ট-মেণ্টের অফিসাররা ব্যক্তিগত মালিকানায় করপোরেশনের প্রতিনিধিরা এবং আর্থনীতিক প্ল্যানিংয়ের (পরিকল্পনার) ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আছেন। এই খসড়া শেষ অবধি আইনে পরিণত হয়। মানুষের স্বাস্থ্যের, জন্তুজগতের এবং উদ্ভিদজগতের ক্ষতি করতে পারে—এই সবকে নিয়েই এর কার্যকলাপ প্রসারিত হয়েছে। প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য যতো রকমের নিয়মকানুন আছে, তার সব রকমের শিল্পগত কাজকর্মের প্রধান প্রধান এলাকাগুলোকে এবং কোনো-না-কোনো ভাবে অন্য দেশগুলোর পরিমণ্ডল সংক্রান্ত কাজ-কর্মকেও হিসেবের মধ্যে ধরে এই আইনকে চালু করা হয়। শিল্প থেকে বর্জিত পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা এতে করা হয়: ধূলি, তেলের শিল্পের দূষিত

পদার্থ, এবং ফ্যাক্টরির ধোঁয়া ; গাড়ি থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস, এবং অন্যান্য দূষিতকরণ যা হয়, এবং পরিমণ্ডলকে ক্ষতি করতে পারে এই ধরনের যাবতীয় উপাদানগুলি।

আজকের দিনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চরিত্র এমন, যাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দ্বারা যুক্তভাবে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত কাজকর্ম করার দরকার হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমতা ও পারস্পরিক লাভের নীতির ভিত্তিতে এক্ষেত্রে বহুলাংশে ফলপ্রসূ সহযোগিতা স্থাপন করা সম্ভব।

দুনিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রের যারা পরিমণ্ডল-সংক্রান্ত সহযোগিতা স্থাপন করতে উৎসুক এবং বিশ্বাস করে যে, এই ধরনের সহযোগিতা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী নয়,—তাদের কাউকে বাদ না দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজনীয়। এই ধরনের যোগাযোগ উচ্চতম পর্যায়ে অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশনসের কাঠামো এবং বিশিষ্ট ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যেই ফলপ্রসূ। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকেই বিশেষজ্ঞরা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার একটা বিস্তৃত পরিধি বার করেছেন, যেখানে ইউনাইটেড নেশনসের কাঠামোর মধ্যে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।

এই ধরনের সমস্যাগুলোর প্রথম গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ; খবরাখবরের আদান-প্রদান ; কয়েকটি বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে তথ্যকে জড়ো করা এবং বিশ্লেষণ করা ; পরামর্শ করার জন্য ব্যবস্থাদি ঠিক করা এবং সংশ্লিষ্ট গভর্নমেন্টরা চাইলে পরে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মূল্যায়ন করে দেওয়া ; জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক, ও আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামগুলোকে রূপায়িত ও কার্যে পরিণত করা ; আন্তর্জাতিক কাজকর্মকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া এবং যুক্তভাবে পরিকল্পনা ও তার জন্যে টাকার প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয় গ্রুপের মধ্যে পড়ছে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে সঠিক মানের গুণাগুণ ঠিক করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় কাজের (সার্ভিসের)

ব্যবস্থা করা ; পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রোগ্রামকে কার্যে পরিণত করার জন্য, গভর্নমেন্ট ও শিল্পগত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্মের জন্য নিয়মকানুন ঠিক করে দেওয়া এবং তার জন্য খরচপত্র ও আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

তৃতীয় গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত মান এবং নিয়মকানুন চালু করার জন্য এবং ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার পন্থা ঠিক করে ; বিশেষ ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধা করে দিয়ে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন প্রয়োগ ক'রে ব্যবস্থা করে ; নতুন, আরও অগ্রসর ধরনের পরিমণ্ডলের গুণাগুণের মানের প্রবর্তন ক'রে তাকে কার্যকরী করতে প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করতে হবে ; ঝগড়াঝাটি (বা দ্বন্দ্ব) মেটাবার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং তার জন্য আপীলের ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনের ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

আখেরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন করার প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাদি অবলম্বনের, লক্ষ্য সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহারের এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্য দেবার জন্য নানারকমের সমস্যাবলী আছে।

পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রে ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপনের সমস্যাটা জড়িয়ে রয়েছে কার্যক্রম চালু করার প্রযুক্তিগত কি ব্যবস্থা আছে তা থেকে যে সম্পদ পাওয়া যায় তার যুক্তিসম্মত ব্যবহার এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যের 'পরে। আন্তর্জাতিকভাবে বড়ো কয়েকটি আলোচনার ক্ষেত্রে (ফোরামে) ও কনফারেন্সে পরিমণ্ডলের ব্যাপারে ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে, আর তা থেকে সকল রাষ্ট্রগুলোতে সঠিক নির্দেশ ও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ১৯৭২ সালের স্টক্‌হোলম্‌ কনফারেন্স্‌, যাতে মানুষের পরিমণ্ডল সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রস্তাব নেওয়া হয়.(১১৩-টি রাষ্ট্র এই কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব করে), ১৯৭১ সালের ইউরোপ সম্পর্কে ইউনাইটেড নেশনসের আর্থনীতিক কমিশনের পরিমণ্ডল

সম্পর্কে প্রাগের সিম্পোসিয়াম এবং ইউরোপ সম্পর্কে নিরাপত্তার ও সহযোগিতার কনফারেন্স। পরিমণ্ডলের রক্ষা নিয়ে ইউনাইটেড নেশনসের সাধারণ অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব পাস হয়েছে।

এর অপেক্ষাও অধিক আন্তর্জাতিকভাবে কর্তৃত্বভার রয়েছে ইউনাইটেড নেশনসের পরিমণ্ডল সংক্রান্ত প্রোগ্রামের (United Nations Environmental Programme—UNEP) জন্য নির্দিষ্ট, ইউ. এন. ই-পি. নামে এক সংস্থার হাতে, যার খরচ করার জন্য বিশেষ মজুদ ফাণ্ড রয়েছে প্রায় ১০ কোটি ডলার। বহু রাষ্ট্রের কার্যক্রম নিয়ে পরিমণ্ডল রক্ষার সমস্যা বিচার করা দরকার এটা বুঝে ইউ. এন. ই. পি. সাতটি এলাকাতে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং এর ভিত্তিতে তার সক্রিয় প্ল্যান (Active plan) এগোচ্ছে: ১। মহাসমুদ্র, ২। প্রকৃতি, জন্তুজগৎ এবং প্রাণের উৎস যেখানে রয়েছে, ৩। পরিমণ্ডল ও তার বিকাশ, ৪। মানুষের বসতি, ৫। জনস্বাস্থ্য ও পরিমণ্ডলের গুণাগুণ, ৬। শক্তি এবং ৭। প্রাকৃতিক বিপদসমূহ।

সক্রিয় প্ল্যানে এই ধরনের বড়ো পরিধিতে সমস্যাগুলোকে ঢোকানো হয় কারণ উন্নয়নশীল ও উন্নত, উভয় রাষ্ট্রই এটাকে ছকে দেয়। এপ্রিল ১৯৭৫ সালে ইউ. এন. ই. পি-র বাৎসরিক অধিবেশনে দেখা গেল যে, উপস্থিত প্রায় ২৫০-টি নানা রকমের প্রকল্পকে চালু করার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে বিশেষ করে নগরের পরিবেশের সমস্যা সম্পর্কে, শক্তির সংকটের আর্থনীতিক ও বাস্তব্য দিকগুলো সম্পর্কে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

১৯৭৫ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেশ একটা বড়ো অংশ মানুষের বসতি স্থাপন করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক ফাণ্ড স্থাপন করার প্রস্তাব দেয়, যেটার টাকার যোগান দেবে ইউ. এন. ই. পি। প্রথম দফাতে এই ফাণ্ডে খরচ করার জন্য থাকবে ৪০ লক্ষ ডলার। মানুষের বসতির ব্যবস্থাকে উন্নত করতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দেবার জন্য এই টাকাকে ব্যবহার করা হবে।

সক্রিয় প্ল্যান ছাড়া সাম্প্রতিক যে কাজগুলো করতে হবে তার মধ্যে তিনটি প্রায়োগিক কর্তব্য ধরা হয়েছে : সারা ভূগোলক জুড়ে পরিমণ্ডলের গুণাগুণ বিচার করতে হবে, সময়মতো ও প্রয়োজন-মাফিক ঠিক ঠিক যোগান হচ্ছে কি, না, যার মধ্যে খবরাখবর ও বিশেষজ্ঞদের ট্রেনিং (বা প্রশিক্ষণ) এবং ব্যাপকভাবে বোঝাবার কাজ করতে হবে।

পরিমণ্ডলের গুণাগুণ বিচার করতে হলে ভূগোলক জুড়ে নিয়ন্ত্রণের (মনিটরিং-এর) ব্যবস্থা করতে হবে, তার মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কি কি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে এবং কি কি মজুদ রাখতে হবে এবং ফেরৎ পাবার ব্যবস্থা করতে হবে, সে সম্পর্কেও ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। "সামগ্রিক"ভাবে বহুরাষ্ট্রে পরিকল্পনা (বা প্ল্যানিং) এবং বিকশিত করার ব্যবস্থাকে চালু করে পরিমণ্ডলের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যার মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ কতো আছে সেটা বুঝে আর্থনীতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য পরিমণ্ডলগত তাৎপর্য কি দাঁড়াবে, তার বিচার করতে হবে।

ইউ. এন. স্কো পরিমণ্ডলের সমস্যার ব্যাপারে অনেক কাজ "জীবমণ্ডল ও মানুষ" নাম দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে করে থাকে। উষ্ণ ও নাতি-উষ্ণ বন-জংগলের বাস্তব্য-ব্যবস্থাতে মানুষের কাজকর্মের ফলে কতোখানি প্রভাব পড়ছে; না-গরম না-ঠাণ্ডা (মডারেট) অঞ্চলের ও ভূমধ্যসাগর এলাকার বনানীতে জমির নানারকমের ব্যবহারের ফলে বাস্তব্য অবস্থাতে কি প্রভাব পড়বে; সভানাতে[৪৫] জমির ব্যবহার এবং অন্য নানাভাবে গোচারণ ভূমিতে এবং তুন্দ্রা[৪৬] অঞ্চলে; আর্দ্র এবং আধা-আর্দ্র অঞ্চলে বাস্তব্য-ব্যবস্থার চলনশীলতার

৪৫. আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে বিরাট অঞ্চলে দিগন্তবিস্তৃত ভূমি পাওয়া যায়, যেখানে কিন্তু একটিও গাছ নেই—অনুবাদক।

৪৬. উত্তর রাশিয়ার বিরাট অঞ্চলে আদিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি রয়েছে, যেখানে একটিও

(dynamics-অর্থাৎ ক্রমাগত পরিবর্তন যেটা হচ্ছে, তাকেই বোঝানো হচ্ছে —অনুবাদক); ত্রুন, জলাভূমি, নদী, বদ্বীপ, নদীর মোহনা এবং তীরবর্তী অঞ্চলে; পার্বত্য অঞ্চলে; দ্বীপগুলোর যুক্তিসম্মত ব্যবহারে; প্রাকৃতিক অঞ্চল রক্ষা করার এবং তাদের জৈবিক সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখা; কৃষিকে ধ্বংসকারী পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে এবং জমিকে উর্বর করার জন্য জমি ও জলের যুক্তিসম্মত ব্যবহারে; ইন্‌জিনিয়ারিং ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত প্রধান প্রধান কাজকর্মের মানুষ ও তার পরিমণ্ডল সম্পর্কে; শিল্প ও মানুষের বসতিতে শক্তির প্রয়োগের ফলে বাস্তব্য-সমস্যা সম্পর্কে; ভৌগোলিকভাবে জনসংখ্যার বিন্যাসে ও জৈবিক প্রক্রিয়াতে পরিমণ্ডলের পরিবর্তনের ফলে কি ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়; এবং পরিমণ্ডলের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ধারণাগত ব্যবস্থাপনা কি হবে—এ সবই মানুষের মোট কার্যকলাপের প্রভাবে পরিমণ্ডলে ও বাস্তব্য-চক্রে কি পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তা নিয়ে ১৩-টি রিসার্চ প্রকল্প কাজ করছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation-WHO), বিশ্ব আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাবার সংস্থা (World Meteorological Organisation-WMO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organisation-FAO), এবং ইউনাইটেড নেশনসের শিল্প বিকাশের সংস্থা (United Nations Industrial Development Organisation—UNIDO)—এদের সকলের কার্যক্রমেই পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার এবং বিভিন্ন অঞ্চলে তার গুণাগুণকে বিচার করার ব্যাপারটা ক্রমশই বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক কাউন্সিল (International Council of scientific Unions) যেটা বিশেষ করে পরিমণ্ডলের সমস্যা

গাছ নেই। সভানার সঙ্গে তফাৎ এই যে, তুন্দ্রা অঞ্চল প্রায় মেরুবৃত্তের মধ্যে পড়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আর সাভানা হচ্ছে উষ্ণ আমেরিকার অঞ্চলে অবস্থিত—অনুবাদক।

সম্পর্কে একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক কমিটি প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তার সংগে কাজ করছে ট্রেনিং ও রিসার্চের জন্য ইউনাইটেড নেশনসের ইনস্টিটিউট।

বিশ্ব আবহাওয়ার পূর্বাভাস (WMO) এর ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য কাজ করছে, যার মধ্যে রয়েছে বিশেষ যন্ত্রপাতি-যুক্ত কৃত্রিম উপগ্রহরা যারা মহাসমুদ্রের কয়েকটি অঞ্চলকে বিশেষ করে ভূমধ্যসাগর, বলটিক ও ক্যারিবিয়ান সাগরের জলের সম্পদ ও দূষিতকরণের জন্য যে বিপদ এই অঞ্চলগুলোতে দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে কাজ করছে। পৃথিবীর সমুদ্রজলের ওপরে যে দূষিত আবর্জনারূপ পদার্থ জমছে এবং সামুদ্রিক প্রাণীজগতের কাছে বিষাক্ত পদার্থ কি কি যাচ্ছে তার বিশ্লেষণ করার সম্পর্কে যে ব্যবস্থাপনা (মনিটরিং) আছে তাতে যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। খাদ্য-সংস্থা (FAO), বায়ুর পূর্বাভাস (WMO) অফিস, খাদ্যতে কি ভেজাল থাকছে এবং কতোখানি রাখা যেতে পারে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করার চেষ্টা করছে।

আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে মরুভূমি ও আধা-মরুভূমি অঞ্চলে বাস্তব্য ব্যবস্থার দিক থেকে যুক্তিসম্মত বিকাশের জন্য বিশ্ব খাদ্য-সংস্থা তার কর্মসূচীতে জোর দিচ্ছে, এবং বিশ্ব সমুদ্রের জৈবিক সম্পদকে বজায় রাখা, রক্ষা করা এবং বিকাশ করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবস্থাবলী নিচ্ছে (এর সংগে যুক্ত রয়েছে মাছ ধরার ক্ষেত্রে আন্তঃগভর্নমেন্ট কমিটি)। তাছাড়া প্রকৃতিকে জন্তুজগতকে এবং জৈবিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচী তৈরি করা হচ্ছে। জন্তুজগতের সম্পদসমূহকে, এবং তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের বাস করার ব্যবস্থাকে যাতে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, এর জন্য প্রোগ্রামে খবরের আদান প্রদানের ব্যবস্থা আছে; এর মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে বাস করার (দুর্গম স্থানে ছুটি উপভোগ করার এক রকমের ব্যবস্থা—অনুবাদক) এবং ভ্রমণসুখের ব্যবস্থাও থাকবে। জাতীয় পার্ক ও অন্যান্য চিত্ত বিনোদনের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পরিমণ্ডল সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কমিটি (The Scientific committee on Problems of the Envinonment—SCOPE) উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের আর্থনীতিক স্তর ও তাদের পরিমণ্ডলের গুণাগুণ উন্নত করতে যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে বিচার করে দেখার জন্য কয়েকটি আঞ্চলিক কনফারেনস্ করছে।

পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শক্তির সমস্যা বিকট আকারে দেখা দেওয়ার পরে আর্থনীতিক সহযোগিতা ও বিকাশের জন্য সংগঠনের (Organisation for Economic cooperation and Development—(OECD) যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম ইউরোপের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, কানাডার, জাপানের, অস্ট্রেলিয়ার ও নিউজিল্যাণ্ডের দেশগুলোকে একত্র করে ধরা হচ্ছে—তাদের সাম্প্রতিক বছর গুলোতে পরিমণ্ডলের গুণাগুণ শক্তির উৎপাদনের ফলে নানা রকমের প্রভাবের সম্পর্কে বিশেষ করে বিচার করতে হয়েছে এবং কাঁচা মাল ও নির্গত আবর্জনা সমূহকে কি করে পুনরায় উদ্ধার করে আর্থনীতিক দিক থেকে লাভজনক করা যায় তার জন্য বাস্তব দিক থেকে নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

সারা গ্রহ জুড়ে পরিমণ্ডলের পরিধির আরও বিকাশ নিশ্চয়ই সারা ভূগোলকের কথা মনে রেখেই করতে হবে—এটা করা হবে ইউনাইটেড নেশনসের ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে। তবু ইউনাটেড নেশনসের প্রধান কার্যক্রমকে—যেটা আমাদের দিনের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত—তাকে হেয় করা নিশ্চয়ই ভুল হবে। বাস্তবিকই, যেখানে ইউনাইটেড নেশনসের বিভিন্ন এজেন্সিতে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, আর্থনীতিক ও স্বাস্থ্য সমস্যাদি নিয়ে পূর্বাপেক্ষা বেশি নজর দেওয়া হয়েছে, তা থেকে তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাত অথবা বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি চালু করতে হলে ইউনাইটেড নেশনসের কার্যক্রমকে ঠেলে

পেছনে সরিয়ে রাখতে হবে। দেঁতাতের (উত্তেজনা প্রশমনের—অনুবাদক) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যাতে পুনরায় বদলে দিয়ে রদ না করা যায় তার জন্য সারা দুনিয়া জুড়ে তাকে প্রয়োগ করে মানুষের সামনে আজকে আরও যে সকল সমস্যা আছে তার সমাধান করা সম্ভব।

মস্কোতে অনুষ্ঠিত ১৯৭৩ সালের শান্তি কংগ্রেসে পরিমণ্ডলের ও অন্যান্য ভৌগোলিক সমস্যার সমাধানের জন্য ঠিক এই গুরুত্বপূর্ণ সর্তটিই লিওনিদ ব্রেজনেভ প্রতিনিধিদের বলেছিলেন; মানুষের সারা ভবিষ্যতের সংগে জড়িত রয়েছে আজকের দিনের শান্তি স্থাপনের জন্য প্রধান সমস্যার সমাধান এটাই তাঁর বক্তব্যে শান্তির জন্য ডাক দিয়ে বলেছিলেন। মস্কোতে শান্তির শক্তির জন্য বিশ্বকংগ্রেসের ঘোষণাতে জোর করে বলা হয়েছে, পরিমণ্ডলের অবনতি ও অবক্ষয়ের ব্যাপারে মানবজাতি ক্রমশই আরও বেশি করে অবহিত হয়ে উঠছে। যে পৃথিবী আমাদের সকলের বাসভূমি, তার সম্পাদক রক্ষা করার জন্য দুনিয়ার জনগণ বিশেষভাবে সচেষ্ট।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন দেশের গভর্নমেন্টের দ্বারা যে যুক্ত কার্যক্রম আমরা দেখছি তাতে ন্যায্যভাবেই এই আশা আমরা পোষণ করতে পারি যে, আমাদের গ্রহের জীবমণ্ডলের রক্ষার মহান দায়িত্ব আমরা সাফল্যের সংগেই পালন করবো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিমণ্ডল সম্পর্কে সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রধান প্রধান যে কোনো ঘটনাই ধরা যাক না কেন—তা সে কনফারেনস্, প্রদর্শনী (বা এক্‌জিবিশন) অথবা বিশেষজ্ঞদের সেমিনার (বা আলোচনা সভা) যাই হোক না কেন—তাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিশেষজ্ঞরা থাকবেনই, কারণ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির জন্য এই দুই দেশকেই নেতা বলে ধরা হয়। এই দুই দেশের বৈজ্ঞানিক ও এন্‌জিনিয়ারদের সভ্যতার প্রগতিতে প্রধান অবদান রাখার কৃতিত্ব আছে, যেমন—প্রাথমিক পারমাণবিক পদার্থ তাঁরাই আবিষ্কার করেছেন, নতুন ভাবে শক্তির উৎপাদনের পদ্ধতির বিকাশও তাঁরাই করেছেন, মাইক্রো (বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র) ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা আমাদের জৈবিক দেহে জীবকোষ সমূহ কিভাবে বিন্যস্ত (জেনেটিক কোড্) আছে, তাকে আবিষ্কার করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক সাধারণ স্বার্থ রয়েছে এবং উভয়ের বিশেষজ্ঞরা তাদের প্রচেষ্টাকে যৌথভাবে একই উদ্দেশ্যের জন্য জড়ো করে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য বহুমুখী অবস্থা বহুদিন ধরে বর্তমান রয়েছে। তবে বহু বছর ধরে দুই দেশের বৈজ্ঞানিক ও এন্‌জিনিয়ারদের মধ্যে সন্দেহের বাষ্প ও পারস্পরিক টক্কর দিয়ে চলবার মনোবৃত্তি থেকে যুদ্ধোত্তর যুগে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে চিড় খাবার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায়

পা থেকেই একই সমস্যা নিয়ে আলাদা আলাদা কাজ করতে হয়েছে। একমাত্র সাম্প্রতিক তাদের যুক্ত কাজের পরিধি মৌলিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের এবং আরও কয়েকটি প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও বেশ ভালোভাবে বাড়াবার সম্ভাবনা দেখা গেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেঁতাত (উত্তেজনা প্রশমন) এবং সোভিয়েত আমেরিকান সম্পর্কতে সমতা (বা সমানাধিকার), পারস্পরিক লাভ ও পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি সম্মান দেখানোর ভিত্তিতেই সফলভাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা গড়ে তোলবার প্রধান উপাদান পাওয়া যাবে। আজকের আন্তর্জাতিক সম্পর্কতে এই পুরানো বস্তা-পচা ধারণা বাতিল করার দরকার যুক্তির দিক থেকে, যাতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবস্থা থেকে এই ধারণা আগে ভাগে ধরে নেওয়া হতো যে, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে যা সুবিধাজনক, সেটাই যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হতেই হবে।

নভেম্বর ১৯৭৫ সালে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে সোভিয়েত-আমেরিকার সহযোগিতা সম্পর্কে মার্কিন কংগ্রেসে যে বিতর্ক (ডিবেট) হয়, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশনের (U. S. National Science Foundation) ডিরেক্টর, ডঃ গাইফোর্ড স্টেভার সন্তোষের সংগে লক্ষ্য (নোট) করেন যে, মস্কো ও ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত দুই গভর্নমেণ্টের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে ১৫০-টি যুক্ত প্রকল্পে সফলভাবে কাজ করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের মতে এই সহযোগিতার পরিধি ও সম্ভাবনা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

রসায়ন, শক্তি, কৃষি, জলের সম্পদ এবং ব্যবস্থাপনাতে (ম্যানেজমেণ্ট) কম্পিউটারের ব্যবহার—এই রকমের ২৫-টি যুক্ত প্রকল্পে সোভিয়েত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা শুরু হয়েছে। ২৪-শে মে ১৯৭২ সালে মস্কোতে স্বাক্ষরিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতার

জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেটাকে কাজে পরিণত করার জন্য যুক্ত কমিশনের প্রথম মিটিংয়ে সেটা গৃহীত হয়। তখন থেকে সোভিয়েত-আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা থেকে অনেক ভালো ফল পাওয়া গেছে, যার মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। কিয়েভের প্যাটন ইন্‌স্‌টিটিউট থেকে তার তৈরি করার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা প্রযুক্তিগত প্রণালীতে ওয়াশিংটনের কাছে কেমেট্রন রিসার্চ কেন্দ্রে কাজ শুরু হয়েছে। আমেরিকার টেকসাস্ এলাকার সিন্‌ডার-এ যে কারখানা আছে, সেখানে আমেরিকান ম্যাগ্‌নেসিয়াম কোম্পানির পরিমণ্ডল সংক্রান্ত মান বজায় রাখার আইনকে লঙ্ঘন করার জন্য তাদের প্ল্যান্টকে বন্ধ করে দেওয়া হতো, কিন্তু তারা সোভিয়েতের তৈরি ম্যাগ্‌নেসিয়াম গলাবার যন্ত্রপাতি কিনে বেঁচে গেল। মার্চ ১৯৭৬ সালে সোভিয়েত ও আমেরিকার শল্য-চিকিৎসকরা সোভিয়েত ও আমেরিকার তৈরি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড অপারেশন করে বসিয়ে দেন।

জুলাই ১৯৭৫ সালে সয়ুজ-এপলো[৪৭] যৌথ মহাকাশ-অভিযানের জন্য ব্যাপক ভাবে যে প্রস্তুতি করা হয়, তার সম্পর্কে এবং তার সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য করে বলে যে, দুই দেশের মহাকাশচারীরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, দুনিয়াটা গত কুড়ি বছরে কতো বদলে গেছে এবং দেঁতাতের এটা একটা মূর্ত প্রকাশ।

এক দেশের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত ও আর্থনীতিক প্রচেষ্টাগুলো অন্যদেশে পুনরায় কপি করে সময় ও শক্তি খরচ না হলে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হবে। এই ধরনের সহযোগিতা উভয় দেশের ও সমগ্র মানবজাতির স্বার্থেই নিয়োজিত। যৌথ কার্যক্রমের

৪৭. সোভিয়েতের তৈরি মহাকাশযান তার নাম সয়ুজ আর আমেরিকার তৈরি এপোলো—এই দুই মহাকাশযানকে মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত কক্ষপথে জোড়া লাগিয়ে কয়েকটি একস্‌পেরিমেন্ট (বা পরীক্ষা নিরীক্ষা) একসঙ্গে করা হয়—অনুবাদক।

ফলে যাতে অন্য রাষ্ট্রগুলোরও ভালো হয় তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সর্বশক্তি দিয়ে সুফল পাবার চেষ্টা করছে, তাদের অর্থনীতিকে আগু বাড়াবার চেষ্টা করছে এবং সমাজে ও প্রকৃতিতে যাতে বড়ো ক্ষতি না হয় সে সম্পর্কে ভুলভ্রান্তি এড়াবার চেষ্টা করছে।

২৩-শে মে, ১৯৭২ সালে পরিমণ্ডলের জন্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে সোভিয়েত আমেরিকান চুক্তি নতুন অগ্রসর কৃৎকৌশল (টেকনিক)-এর ব্যবহার ও যৌথ ভাবে তার বিকাশ সাধন করার জন্য কয়েকটি গভর্নমেন্টের মধ্যে বিশেষ চুক্তি সম্পন্ন হয়। এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, সোভিয়েত-আমেরিকার সম্পর্কের চুক্তির জন্য এটাই প্রথম দলিল। আমাদের কালের আমাদের ও ভবিষ্যৎ পুরুষের জন্য পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার অন্যতম প্রধান সমস্যার সমাধান হবার উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে রাজনৈতিক দেঁতাতের দ্বারা।

এই চুক্তিতে কাটাকাটা কথা থাকলেও এতে যুক্ত কার্যক্রমের বিশেষ বিশেষ এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার ও তার উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ এলাকাগুলোতে চিহ্নিত করা যেতে পারে; যেমন—বায়ু ও জলের দূষিতকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে; কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের ব্যবস্থা এতো নিপুণতার সংগে করতে হবে যাতে জমির উর্বরতা নষ্ট না হয়; নাগরিক পরিবেশকে উন্নীত করতে হবে; সংরক্ষিত এলাকা করে প্রায় বিলুপ্ত অতি দুষ্প্রাপ্য গাছগাছালি ও জন্তুদের রক্ষা করতে হবে; সামুদ্রিক প্রাণীদের ক্ষতি হওয়া বন্ধ করতে হবে; পরিমণ্ডলের দূষণ থেকে জৈবিক ও বংশপরম্পরায় কি ক্ষতি হতে পারে সেটা দেখতে হবে; ভূমিকম্প হলে আগে থেকে জানান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে; মেরুপ্রদেশের ও অর্ধ-মেরুদেশের বাস্তব্য অবস্থায় বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং সেখানকার পরিমণ্ডলের অবস্থা ভালো রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের যাবতীয় কাজকর্ম সহযোগিতার ভিত্তিতে চালাবার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে: সোভিয়েত-

আমেরিকার যুক্ত কমিশন, যেটা একবার মস্কো একবার ওয়াশিংটন, এইভাবে বদলে বদলে বৈঠক করবে।

তার প্রথম কয়েকটি মিটিংয়ে কমিশন ত্রিশটি বা ততোধিক প্রকল্প দিয়েছে, যাতে যুক্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত বিনিময় হচ্ছে। ১৯৭২ সালের শরৎকালে পরিমণ্ডল রক্ষার নানা দিক দেখবার জন্য আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের প্রথম বিরাট দলটি সোভিয়েত ইউনিয়নে যায়। মন্ত্রীমণ্ডলীর ও গভর্নমেন্ট এজেন্সির, বিভিন্ন অঞ্চলের ও জেলার পরিমণ্ডল সংক্রান্ত কাজকর্মকে কেন্দ্রীয় ভাবে চালনা করতে পারার ফলে কতো সুবিধা হয় আমেরিকা থেকে আগত অতিথিরা বেশ ভালো করেই সেটা দেখতে পেলেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর ও এজেন্সির নেতাদের সঙ্গে আলোচনাতে এবং সোভিয়েতের রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করার সময় পরিমণ্ডল সংক্রান্ত যুক্ত কার্যক্রমের কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে আরও পরিষ্কার বোঝাবার সুযোগ আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা পেলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়েকটি রিসার্চ গ্রুপ যৌথভাবে কাজ করছে তাদের কর্মসূচীতে আরও কিছু যোগ দিতে পারলেন। আমেরিকান প্রতিনিধি দলের নেতা, ডঃ রাসেল ট্রেন্‌ সোভিয়েতের পরিমণ্ডল সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মিটিং করতে পারাটা সহযোগিতার অন্যতম একটা বিশিষ্ট নিদর্শন বলে মনে করেন। সুপ্রীম সোভিয়েতের চতুর্থ অধিবেশনের (সেসনের) যে মিটিংয়ে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত ব্যাপারের ভালো করে আলোচনা হয়েছিল, তিনি তাতেও উপস্থিত ছিলেন। একটা সাক্ষাৎকারে সোভিয়েতের মন্ত্রীমণ্ডলীর কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান, ভি. এ. কিরিলেনের রিপোর্টের তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, ন্যাশনাল প্ল্যানিং (জাতিগত ভাবে যোজনা)-এর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে পরিমণ্ডল যে একটা উপাদান এটা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পরিমণ্ডলের সুশাসন সম্পর্কে কাউন্সিলের

(Council on Environmenal quality) বাৎসরিক রিপোর্টে সোভিয়েত আমেরিকার পরিমণ্ডল সম্পর্কে সহযোগিতার জন্য প্রাথমিক কাজগুলোর মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২৩-শে মে, ১৯৭২ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাকে পরিমণ্ডল সম্পর্কেও রাজনৈতিক ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই চুক্তির কর্তাধীনে কার্যক্রমের প্রথম বছরকে খবরাখবর, বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং কৃৎকৌশলের আদান প্রদানের জন্য ধার্য করা হবে। তাছাড়া প্রত্যেক পক্ষই অন্য পক্ষের কর্মসূচীর ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হতে চায়। যৌথ কর্মসূচী তৈরি করার ব্যাপারে এই আদান প্রদানকে একটা ভিত্তিস্বরূপ ধরা হয়। দ্বিতীয় বছরকে যৌথভাবে কাজ করার পরিকল্পনার এবং এতে নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মীদের আদান প্রদানের জন্য ধার্য করা হবে। এতে দীর্ঘমেয়াদী আদান প্রদান এবং সংযোগকারী যৌথ প্রকল্প নেওয়া হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েতের পরিমণ্ডল-বিশেষজ্ঞরা কাজ করবেন বলে জানানো হলে, 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা তাদের আগমনকে শুভ অভিযান রূপে স্বাগত জানিয়ে দেখিয়ে দিলো যে, এই সহযোগিতার একটা স্থায়ী চরিত্র আছে এবং এ থেকে বরাবরের মতো বিশেষজ্ঞদের দেওয়া-নেওয়া হবে।

ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে পরিমণ্ডলের রক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য যুক্ত কমিশন (Joint Commission on Cooperation in the Field of Environmental protection) তাদের তৃতীয় অধিবেশন করে তাদের কাজের সময় লক্ষ্য করা গেল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে একত্র করে এই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে এবং দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও আগু বাড়িয়ে নিয়ে গেল।

অক্টোবরের ১৯৭৫ সালে ওয়াশিংটনে তাদের চতুর্থ অধিবেশন বসে। এর কাজ করতে গিয়ে দুই পক্ষই সন্তোষের সংগে লক্ষ্য করে যে, সহযোগিতার

জন্য কর্মসূচীকে কাজে পরিণত করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক ভালো ফল পাওয়া গেছে। সোভিয়েত আমেরিকান চুক্তির মধ্যে ১১-টি বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং ৩৯-টি যুক্ত পরিকল্পনার তালিকা তৈরি করার পর কার্যকরী গ্রুপের (working groups) একশ-র বেশি অধিবেশন বসেছে, একটা একটা বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের বৈঠক বসেছে এবং তাদের কাজের বিনিময়ও ঘটেছে। রিসার্চ জাহাজ নিয়ে অনেকগুলো অভিযান চালানো হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (বা একস্পেরিমেণ্ট) করা হয়েছে, এবং পরস্পরের গবেষণাগারে ও অন্যান্য সংগঠনে বিশেজ্ঞদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থাও হয়েছে। যুক্ত প্রোজেক্টের ফলাফল পরীক্ষা নিরীক্ষা, অভিযান এবং অনুসন্ধান—এ-সবগুলোই যে একটা নতুন উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেছে, এ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা একমত হলেন।

সহযোগিতা করতে গিয়ে যা কিছু খবরাখবর পাওয়া গেল তা দু'পক্ষের জন্যই প্রয়োজনীয় ও উপকারী। কয়েকটি ক্ষেত্রে এটা অন্য দেশের পরিমণ্ডল-বিশেষজ্ঞদের এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের উৎসুক্য জাগরিত করেছে। দু'পক্ষই সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষ কাঠামোকে বাড়ানো ও গভীরতর করার জন্য তাদের প্রত্যয়কে আবার জারি করলেন; সহযোগিতার বিষয়ের এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলো হল; যুক্ত বিকাশের পরিকল্পনা; প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতির পরীক্ষা করে তাকে নিখুঁত করা; পরিমণ্ডল সংক্রান্ত সদ্য-উত্থিত ও বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য পদ্ধতিকে উন্নত করা; বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে আদান প্রদান করা এবং আলোচনা-সভার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা। পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য সোভিয়েত-আমেরিকান সহযোগিতার ক্ষেত্রে কাজ কতোখানি এগিয়েছে, তার রিপোর্ট করতে গিয়ে দু'পক্ষই একমত হলেন যে, আন্তঃগভর্নমেণ্টের এই দলিলে বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই ব্যাপকভাবে সহযোগিতার ক্ষেত্র পাওয়া যাবে, যেটা পরে সেই সকল প্রজেক্টের পারস্পরিক যোগাযোগের বিস্তার ও গভীরতার মাধ্যমে প্রধানত

বিকাশ প্রাপ্ত করবে ; যাতে আর্থনীতিক দিক থেকে ফলপ্রসূ হয় এবং পরিমণ্ডল রক্ষার ও তাকে বাড়াবার জন্য পারস্পরিক উপকারক ফলপ্রসূ হতে পারে এবং এইভাবে দুই সহযোগী দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহার হতে পারে।

পরিমণ্ডলের রক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য মস্কো চুক্তির কাজ কিরকম হচ্ছে, সেটা এবারে বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

জল দূষিতকরণ বন্ধ করার গুরুত্ব কেবলমাত্র দুই দেশের স্বার্থেই নয় এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরে এবং তার জন্য কি কি পদ্ধতি ও পন্থা নিতে হবে সেটা বিচার করে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা নদীর গতিপথ ও হ্রদগুলোতে দূষিতকরণ কি করে হয় সেইটা অনুধাবন করে তাদের কাজ শুরু করেছেন। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সকল নদীর ও হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে বা উপকূলে অথবা জলাধারে শিল্পগত নির্মাণকার্য শুরু করা হয়েছে সেই নদী ও হ্রদগুলো আগে বেছে নিয়েছেন। নদী ও হ্রদের বাস্তব্য-ব্যবস্থাতে দূষিত করণ কি প্রভাব পড়ে বিশেষজ্ঞরা সেটা অনুধাবন করছেন তাঁরা কতো বেশি দূষিতকরণ করা চলতে পারে সেটা বিচার করে দেখছেন, এবং দূষিতকরণ নিয়ন্ত্রণ করার কতোদূর অবধি সম্ভব তার জন্য সুপারিশ তৈরি করছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ধরনের অনুমোদিত হ্রদ হল বাইকাল হ্রদ ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেটা হল মিচিগান হ্রদ সমস্ত হ্রদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্রদ।

দূষিত পদার্থগুলো থেকে যাতে রাসায়নিক, জৈবিক, যান্ত্রিক ও অন্যান্য আবর্জনা আলাদা করে ফেলা যায় তার যুক্তিসম্মত উপায় উদ্ভাবন করতে আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে উৎসুক। এই ক্ষেত্রে যুক্তভাবে রিসার্চ করতে পারলে সাধারণের জলের সম্পদকে দূষিতকরণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

যুক্ত কাজের আর একটা ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়াতে জলের ব্যবহার কমাবার জন্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করা এবং শিল্পেতে একই জলকে

শোধন না-দিয়ে বারবার ব্যবহার করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করতে হবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জলের সম্পদের গুণাগুণ রক্ষা করার সমস্যাটি বিশেষভাবেই তীব্র। ফেডারাল জল দূষিতকরণ নিয়ন্ত্রণের আইন (Federal Water Pollution Control Act)-এর লক্ষ্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলের সম্পদের রাসায়নিক, পদার্থগত, এবং জৈবিক তথা তার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করা। এই আইনের সংশোধিত ধারার (এ্যাক্টের) অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জলেতে আবর্জনা ছাড়া বন্ধ করতে হবে। ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি কয়েকটি জলাধারে আরও ভালো পরিষ্কার জলের সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে, যেটা জৈবিক প্রক্রিয়াকে সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে এনে দেবে এবং খেলাধুলোর জন্য এই জলাধারগুলোকে বেশ ভালভাবে ব্যবহার করা যাবে। আজকের নতুন আইনের ধারা আগেকার আইন থেকে বদলে গেছে এইভাবে যাতে অগ্রসর প্রযুক্তিগত সুবিধাদি নিয়ে কর্মসূচী কাজে রূপায়িত করতে যা করা দরকার তা করা যায়; আর এটা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালো করে করা যায়।

সারা পৃথিবীর ভূগোলকের তিন ভাগের দুই ভাগ হল জল (বা সমুদ্র), যা থেকে আমরা আর্দ্রতা ও অক্সিজেন পেয়ে থাকি এবং আবহাওয়া তৈরি করার ব্যবস্থা যেখান থেকে হয়; সেই পৃথিবীর মহাসমুদ্রের জলরাশির দূষিতকরণ যাতে না হয় তার জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে। এই জলেতে (১৯৭০-দশকের মাঝামাঝি সময়ের হিসাব অনুসারে) মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক পদার্থ থেকে শতকরা ১০ ভাগ প্রোটিন পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা দুনিয়ার মহাসমুদ্রকে রক্ষা করার জন্য তিন রকমের প্রধান প্রধান জরুরী সমস্যার তালিকা করেছেন। প্রথমত, সমুদ্রে ভেসে-থাকা এক রকমের শ্যাওলা জাতীয় তৃণ (তার নাম প্ল্যাংকটন), যেটা কারবন ডাই-অক্সাইড শুষে অক্সিজেন গঠন করে এবং জলের উপরিভাগ (বিশ্ব জলমণ্ডল) পরিষ্কার করতে সাহায্য করে থাকে এবং তার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের

ঝুলে লেনদেন চলে। দ্বিতীয়ত, মহাসমুদ্রের আসল জৈবিক সূত্রকে রক্ষা করার সমস্যা রয়েছে, যাতে সমুদ্রের গভীরে খাদ্য-সরবরাহের যোগাযোগ-ব্যবস্থা (যেন চেন বা শেকলের মতো, এক থেকে অন্য হয়—অনুবাদক) বজায় রাখা চলে। এবং তৃতীয়ত, মহাসমুদ্রে বাস্তব্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার এবং যুক্তিসম্মত-ভাবে তার সম্পদরাশিকে আবাদ করার প্রয়োজন আছে।

পৃথিবীর মহাসমুদ্রকে দূষিতকরণের থেকে রক্ষার করার প্রচেষ্টাতে এবং যুক্তিসম্মত ভাবে তার জৈবিক ও ধাতুগত সম্পদরাজিকে পুনরুৎপাদনের জন্য সোভিয়েত ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পতে কাজ করছেন, যেমন জাহাজ চলাচলের দ্বারা সামুদ্রিক পরিবেশের এবং সমুদ্রের জন্তুদের যাতে ক্ষতি না হয়, সেটা দেখা। ১২-ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে সামুদ্রিক পরিবেশকে দূষিতকরণ থেকে রক্ষা করার জন্য সকল কাজকর্মের সারাংশ করে সোভিয়েত-আমেরিকান কার্যকরী গ্রুপরা। প্রটোকলে বলা হয়েছে, এই এলাকাতে যুক্ত কার্যক্রম ভালো করেই চলছে ; দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা তৈল, জৈবিক-ক্লোরাইনের জটিল পদার্থ (Organo-chlorine compounds), তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও অন্যান্য বিষাক্ত অথবা বিষাক্ত হতে পারে এমন বিপজ্জনক বস্তুদের থেকে সমুদ্রের ও মহাসমুদ্রের দূষিতকরণ নিয়ন্ত্রণ করার ফলপ্রসূ পন্থা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে সমুদ্রে গবেষণা চালাবার জন্য পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজগুলো থাকাতে, যাতে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর বৈজ্ঞানিক উপকরণাদি রয়েছে, এই ক্ষেত্রে সোভিয়েত-আমেরিকার সহযোগিতার ক্ষেত্র ভালো করে বিস্তৃত হতে পেরেছে। বৈজ্ঞানিক জগতে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের কাজের খুবই তারিফ করা হয়েছে।

আখেরে মহাসমুদ্রের রিসার্চের ক্ষেত্রে সহযোগিতার যে চুক্তি করা হয়েছে তার উল্লেখ করতে হয়। ওয়াশিংটনে ১৯-শে জুন, ১৯৭৩ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়েছে,

যেমন—শিল্প-মহানগরের উৎপাদনের কি হচ্ছে সেটা অনুধাবন করা, এবং সারা জৈবিক জগতে এবং তাদের আলাদা আলাদা করে কি ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে।

বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণ হলে পরিমণ্ডলের ক্ষতি বেশ ভালো ভাবেই দেখা দেবে। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা এখন সোভিয়েত ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের যুক্ত প্রচেষ্টার বিশেষ লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণের সমস্যাটা কয়েকটি বিশেষ প্রকল্পের সাহায্যে হাসিল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যার ফলাফল সম্পর্কে ঔৎসুক্য কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নেই, পরন্তু অন্য দেশেও রয়েছে। এই প্রকল্পগুলোতে বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণের নকল (বা মডেল) তৈরি করে শিল্প ও পরিবহণ থেকে বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত কমিটির প্রথম বৈঠকে আমেরিকার সেণ্ট লুইস শহর এবং সোভিয়েতের লেনিনগ্রাদ শহরের দূষিতকরণ অনুধাবন করার ব্যবস্থা করা হল। দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা এই শহর দুটিতে বায়ুমণ্ডলের দূষিতকরণ কতোখানি হচ্ছে তার হিসেব করে কিভাবে প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি (মনিটর) করা হয় এবং নানারকমের অশুদ্ধ আবর্জনার উপাদান কি কি এবং তাদের কিভাবে ফেলে-দেওয়া সম্ভব, তা নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করছে। তারা বায়ুমণ্ডলে আবর্জনা কতো বেশি ফেলা যেতে পারে তার সীমানা নির্ধারণ করে আবহমণ্ডলে কি কি বিপদ দেখা দিতে পারে এবং বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকারক অশুদ্ধ বস্তুর পরিমাণ বাড়লে এবং তার ঘনত্ব বৃদ্ধি হলে কি ক্ষতি হতে পারে, সেটা আগে থেকে বলে দেবার চেষ্টা করছে।

গাড়ি থেকে যে আবর্জনারূপ ধোঁয়া ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, এবং বায়ুকে দূষিত করণের সেটা একটা মোটা অংশ, তাকে পরিশুদ্ধ করে

নেওয়ার জন্য যুক্তভাবে যার অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিশেষজ্ঞরা তার সম্ভাবনাকে আশাপ্রদ বলে মনে করেন। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে হিসেব করে দেখা গেছলো প্রতি বছরে প্রায় ২৮.কোটি টন নির্গত দূষিত পদার্থের মধ্যে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টনের কিছু বেশি আবর্জনা পরিবহণ ব্যবস্থা থেকে আসছে। ধোঁয়া নির্গত করে না। গন্ধক ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ বেরোয় না, এইরকমের বাস্তব্য ব্যবস্থার দিক থেকে পরিষ্কার জ্বালানী পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কিভাবে করা যায়; এইভাবে কঠিন ও তরল জ্বালানিকে গ্যাসে রূপান্তরিত করার ফলপ্রসূ নতুন পদ্ধতি কি হতে পারে এবং প্রথামতো পন্থার বাহিরে শক্তি উৎপাদনের কায়দা (যেমন প্লাবনের শক্তিকে অথবা ভূগর্ভস্থিত উত্তাপকে, অথবা সৌরশক্তিকে "জড়ো করে" তাকে বদলানো)—এই সকল সমস্যার প্রতি বিশেষজ্ঞরা নজর দিচ্ছেন।

বায়ুমণ্ডলকে নানারকমের দূষিতকরণের পদার্থ, যার মধ্যে গাড়ি থেকে নির্গত গ্যাস ও অন্যান্য বস্তুরাও রয়েছে, তার থেকে রক্ষা করার একমাত্র কার্যকরী পন্থা হতে পারে, যদি আবহমণ্ডলের গঠন (বা কি কি উপাদান দিয়ে গঠিত—অনুবাদক) এবং তার দূষিতকরণের স্তর কতোখানি (অর্থাৎ কতোটুকু হয়েছে—অনুবাদক) এটা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্ররা করে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বায়ু দূষিতকরণের মাত্রা নির্ধারণ করার পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে "৭৬ সালের পরিষ্কার বায়ু" সম্পর্কে আলোচনা সভা (সেমিনার) সোভিয়েত-আমেরিকা যুক্ত উদ্যোগে হয়েছে—সেটাকে চালু করেছিল সোভিয়েত হাইড্রোমেটিওরোলজিক্যাল (বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা পরিমাপক) সোসাইটি এবং ব্যবসা ও শিল্প এর চেম্বার; যে সকল আমেরিকান শিল্প-প্রতিষ্ঠান যন্ত্রগুলো ও অন্যান্য উপকরণ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল তারাও বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকারক আবর্জনা কতোটুকু জমা হয়েছে, সেটা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

আলোচনা-সভাতে যোগদানকারীরা বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার পরিমাপ ও

তার বিভিন্ন দিক নিয়ে পেপার পড়ে ও শোনে এবং পরীক্ষা করার জন্য যন্ত্রপাতি নিয়ে হাতে-নাতে খানিকটা কাজ করে। "৭৬ সালের পরিষ্কার বায়ু" সমিতি থেকে কাজেই দুই দেশের বিশেষজ্ঞরাই লাভবান হন এবং সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই অনুধাবন করার জন্য এই অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগে। তাছাড়া এই ধরনের যুক্ত ব্যবস্থা সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার জন্য অবদান রাখবে এবং সারা ভূমণ্ডল জুড়ে পরিমণ্ডলের ব্যবস্থাকে সফল করে তুলবে।

সকল রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে খামার থেকে উৎপাদনের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলাফলের প্রয়োগ তাকে আরও বেশি উৎপাদনক্ষম করে তোলে। একই সময়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের নিবিড় ব্যবহার ভূমিতে বেশ লক্ষণীয় ভাবে "চাপ"[৪৮] সৃষ্টি করছে, কারণ ভালো করে বিবেচনা না করে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে ভূমিতে অবস্থিত বীজাণুরা (ব্যাকটেরিয়া), অতি-ক্ষুদ্র জৈবিক পদার্থরা (মাইক্রো-অরগানিজম্) এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থরা নষ্ট হয়ে যায়।

রাসায়নিক সারবস্তুগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে এবং কি ধরনের রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়াতে শস্যকে রক্ষা করতে হবে; কিভাবে ভূমিকে ক্ষয় থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করবার জন্য পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে; ভূমির উর্বরতা রক্ষা করার ও তাকে বাড়াবার জন্য কি উপায় নেওয়া দরকার এবং কৃষিক্ষেত্রের আবর্জনাকে নতুন কি প্রক্রিয়াতে পুনরায় উৎপাদন ব্যবস্থাতে আনা সম্ভব—এ সবই সোভিয়েত আমেরিকার সহযোগিতার কাঠামোতে রয়েছে।

ধ্বংসকারী বীজাণুদের দ্বারা শস্য যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য নানারকমের

---

৪৮. ইংরেজিতে বলা হয়েছে 'strain'। আসলে খুব বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে জমির যে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত খাদ্য-ব্যবস্থাপনা আছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে—অনুবাদক।

বীজাণুধ্বংসকারী ঔষধের ও অন্যান্য রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার (তার মধ্যে ডিডিটিও পড়ে) করলে তার ফল বহুদূরপ্রসারী হতে পারে। এ সম্পর্কে পুরো অনুসন্ধান এখনও করা হয়নি। জন্তু ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে জটিল বাস্তব্য ব্যবস্থাতে কি রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়, এ সম্পর্কে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিশেজ্ঞরা গভীরে যাবার চেষ্টা করছেন এবং সেই ভিত্তিতে পরিমণ্ডলের ক্ষতি না করে যুক্তিসম্মত কতো রকমের রাসায়নিক, জৈবিক ও অন্যান্য দুষ্ট বীজাণু ধ্বংসকারী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তার জন্য সুপারিশ করছেন।

গোচারণ ক্ষেত্র দূষিতকরণ হলে, বায়ু বয়ে যাওয়া থেকে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে, বনসম্পদে ও খাদ্যশস্যে বীজাণু-প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবহার হলে কি ফল হবে—এ সবই ওয়াশিংটনে ১৯শে জুন, ১৯৭৩ কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত চুক্তিতে অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু বলে ধরা হয়েছে। গাছপালা বৃদ্ধি পাবার ব্যাপারে, যার মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদের জৈবিক গঠনতন্ত্রের (plant genetics) ব্যাপার, তাকে নির্বাচন করা ও রক্ষা করা, ভূমির চরিত্র সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধান চালানো, তার মধ্যে আবার ধরতে হবে জল, গ্যাস, ভূমি ও তাপ চলাচল ভূমিতে কি ভাবে হয়, এবং রাসায়নিক সার ও অন্যান্য কৃষিসংক্রান্ত রাসায়নিক বস্তুসমূহ কি ভাবে ব্যবহার করা হবে—এ সবই সোভিয়েত-আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের চুক্তিতে রয়েছে।

সোভিয়েত-আমেরিকান সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রে সরাসরি সংশিষ্ট রয়েছে পরিবেশকে গড়ে তোলার জন্য যুক্ত কার্যক্রম। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এই দুই দেশেই অধিকাংশ মানুষ নগরবাসী।

যে সকল সমস্যাদি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন তার পূর্ণ তালিকা এখানে দিতে না পারলেও নগরের পরিকল্পনা (বা প্ল্যানিং) ও বিকাশ সাধন করা, নগরের সুবিধাগুলো যদিও জটিল তবু তাকে আরও বাড়ানো এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির সাহায্যে এবং নগরের জমির "সহজাত"

কয়েকটা স্বাভাবিক সুবিধা থাকার জন্য তার জীবনযাত্রা ও খেলাধূলার ব্যবস্থাকে সাধারণ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষজ্ঞরা এখন কাজ করছেন। যেহেতু দুই দেশই সুমেরুপ্রদেশে নতুন শহর গড়ে তুলতে চায়, সেজন্য সারা বছর তুষারাবৃত অবস্থার মধ্যে কি কায়দায় নির্মাণকার্য করা যায়, সে সম্পর্কে গভীর অনুধাবন করা হচ্ছে।

নগরবাসীদের কাছে কানের অসুখ তাদের নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্য ও সাধারণ জীবন ধারণের পক্ষে দৈনন্দিন একটা বিড়ম্বনা। কাজে কাজেই সোভিয়েত ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা নাগরিক এলাকাতে স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যুক্ত কর্মসূচী ও কার্যক্রম নিয়েছেন। আওয়াজকে কি করে নিয়ন্ত্রণ বা কমানো যায়, তার সর্বাপেক্ষা ভালো উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করা ছাড়া, এই গ্রুপটি নগরের জায়গাগুলো কি করে ব্যবহার করা হবে, খেলাধূলার অঞ্চলে কিভাবে ব্যবস্থা করা যাবে এবং ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের বা ঐতিহ্যসম্মত বস্তুদের কি করে বাঁচানো যাবে, তার জন্য প্ল্যানিং করছেন। যুক্ত কার্যক্রমের জন্য এই গ্রুপটি বেছে নিয়েছে পুরানো ও নতুন, দুই ধরনের শহরই। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ধরনের শহর রয়েছে লেনিনগ্রাদ, তোগলিয়াত্তি[৪৭] একাদেমগোরোদক, নোভোসিবিরস্ক-এর কাছে একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে সানফ্রান্সিসকো, আটলাণ্টা, কলাম্বিয়া ও রেস্টন।

সোভিয়েত-আমেরিকান চুক্তিতে কেবলমাত্র নাগরিক পরিবেশের কথাই ভাবা হচ্ছে না, আরও অনেক কিছু এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে সহযোগিতার চুক্তি, যার মধ্যে উন্নত ধরনের রেল, বিমান ও মোটরগাড়ির পরিবহণের ব্যবস্থাদি রয়ে গেছে, শক্তির ক্ষেত্রে বাড়ি ও অন্যান্য নির্মাণকার্যেও সহযোগিতার চুক্তি কাজ করছে।

---

৪৭. ইতালিয়ান কমিউনিস্ট-পার্টির বিগত সাধারণ সম্পাদকের নামে সোভিয়েতের একটি নতুন শহর গড়া হয়েছে—অনুবাদক

২৮শে জুন, ১৯৭৪ সালে শেষোক্ত চুক্তিটি মস্কোতে স্বাক্ষরিত, তাতে অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে (inter alia) বলা হচ্ছে যে, ভূকম্পের অবস্থা যে সকল এলাকাতে বিদ্যমান, সেখানে সেখানে ভূপদার্থিক অবস্থার কথা মনে রেখে যেন ইনজিনিয়ারিং ও বাড়ি নির্মাণের কাজ করা হয় এবং শুষ্ক কাঠ-ফাটা মরুসদৃশ এলাকাগুলোতে ও এই ধরনের অন্যান্য কঠোর আবহাওয়ার অঞ্চলগুলোকে উন্নত করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে হিসেবের মধ্যে ধরে শহরাঞ্চলকে গড়বার কথা ভাবতে হবে।

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার জন্তু ও উদ্ভিদ জগতের প্রতি মানব সমাজের অগ্রগতির প্রভাব ইতিমধ্যেই এমন ভাবে পড়ছে যে, অগ্রগমন প্রকৃতিকে বদল করে দিচ্ছে। বেশ কয়েকটি জন্তু ও পক্ষী জাতীয় জীবেরা মানুষের "আগ্রাসন"-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছে বলে জানা আছে। প্রকৃতি ও সম্পদকে রক্ষা করার আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন বেশ কয়েকটি দলিল খসড়া করেছে যাতে আমাদের গ্রহের বনবাসকারী জন্তুদের ভাগ্যে কি আছে তা ভেবে দেখার মতো খোরাক আছে। এটা হল লাল বই। যাতে মানুষের রক্ষাকামী জন্তুদের কয়েকটি শ্রেণীর খুঁটিয়ে তালিকা করা হয়েছে। এই দলিল ভালো করে অনুধাবন করলে বোঝা যায়, ২২০-টির অধিক নানা শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবদের রক্ষা করার প্রয়োজন আছে (তার মধ্যে রয়েছে এশিয়ার হস্তী ও কালো গণ্ডার থেকে ভারতের উড়ন্ত খেঁকশিয়াল এবং মরুভূমির ক্যাঙারু), ২৭০-রকমের পাখি (আরব দেশের অস্ট্রিচ থেকে কয়েক-ধরনের চড়ুই পাখি), ৭০-এর অধিক নানা রকমের মাছ (স্টারজন থেকে কয়েক ধরনের পার্চ), ৭০-এর অধিক সরীসৃপ এবং ২০-র অধিক নানা রকমের উভচর প্রাণীরা।

একমাত্র সকল রাষ্ট্রগুলোর এই জন্তুজগতকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাকে জড়ো করে সম্মিলিত করতে পারলেই এই বিয়োগান্ত প্রক্রিয়াকে রুখে দেওয়া শুধু সম্ভব নয়, কয়েকটি প্রাণীর শ্রেণীগত বৃদ্ধি করাও সম্ভব।

সোভিয়েত আমেরিকার পরিমণ্ডলগত সহযোগিতামূলক চেষ্টা করা হচ্ছে

যাতে স্বাভাবিক বাস্তব্য-ব্যবস্থাকে এবং বর্তমান প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে অনুধাবন করে রক্ষা করা যায়। এইদিকে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল—প্রকৃতির হাতে এদের রক্ষা করার যে সকল ব্যবস্থাদি আছে তাকে সংগঠিত করা, যাতে দুষ্প্রাপ্য ধরনের জন্তু ও উদ্ভিদদের রক্ষা করা ও সযত্নে লালিত করা সম্ভব। আজকের দিনের প্রকৃতিগত রক্ষার ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় পার্ক—এই দুটোই করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে—এরা হল চমৎকার প্রাকৃতিক গবেষণাগার যেখানে জীবন্ত ও প্রাণহীন-প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ককে অনুধাবন করা সম্ভব। সহযোগিতার এই কর্মসূচীতে অন্যান্য অনেক ব্যাপারের সঙ্গে ককেসিয়ান রাষ্ট্রে প্রকৃতিগত রক্ষা এবং ইয়োলোস্টোন জাতীয় পার্ক—এই দুই স্থলে নানারকমের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। সোভিয়েত আমেরিকার একটি কার্যকরী গ্রুপ বিশ্বের যে সকল তৃণশস্য বিপদের মুখে তাদের রক্ষার জন্য একটি কনভেনশন করছে, যার মধ্যে বিশেষ করে যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যেন আসা-যাওয়া করে[৫০] তাদের ধরা হয়েছে। জন্তুদের ও উদ্ভিদদের বংশগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার জন্য বাস্তব্য ভারসাম্যকে বজায় রাখার জন্য এবং গাছপালা, জন্তুদের ও মানুষদের জৈবিক গঠনের উপরে দূষিতকরণের প্রভাব লক্ষ্য করার জন্য সোভিয়েত আমেরিকান সহযোগিতাতে বেশ সম্ভাবনাপূর্ণ অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। তুন্দ্রা অঞ্চলে বাস্তব্য-ব্যবস্থাকে অনুধাবন করার জন্য আর একটি কার্যকরী গ্রুপ দুই দেশের বহু অঞ্চলের দায়িত্ব নিয়েছে।

তৃতীয় শীর্ষ সোভিয়েত আমেরিকান বৈঠক পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য এই অঞ্চলে সহযোগিতার পথে এগোচ্ছে।

ইউ. এন. স্কো-র উদ্যোগে "মানুষ ও জীবমণ্ডল" সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে দুই-পক্ষই আলোচনাতে বসে মেনে নিয়েছেন যে জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার ক্ষেত্র হিসেবে তাদের নিজস্ব এলাকাতে কয়েকটি অঞ্চলকে তারা

৫০. অর্থাৎ এক দেশের তৃণশস্যকে মাঝে মাঝে অন্যদেশে পাওয়া যায়—অনুবাদক।

বেছে নেবে। এই রক্ষিত অঞ্চলগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্ভিদ ও জন্তুদের কয়েকটি ধারাকে বংশগত দিক থেকে রক্ষা করতে হবে, তাদের বাস্তব্য ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে হবে এবং ভূগোলক জুড়ে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত কাজকর্মকে আরও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে রিসার্চ চালাতে হবে। সোভিয়েত-আমেরিকান কমিশনের হাতে এই নতুন প্রকল্পের ভার দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অঞ্চল এমন যাতে উভয়কে সুমেরু অঞ্চলে নানা রকমের কাজ চালাতে হয়।

মেরুপ্রদেশের বাস্তব্য ব্যবস্থা নিয়ে যে সকল সমস্যা, তার মধ্যে প্রথম ও প্রাথমিক হল: পারমাফ্রস্টের[৫১] অবস্থা ভালো করে অনুধাবন করা, বরফের এবং ঢাকা তুষারের ঔজ্জ্বল্য দেখা, খুব নীচু তাপমাত্রাতে জলের ওপরভাগে কতো গ্যাস শুষে নেয়, জন্তু ও মাছের বিকাশ (বা রিবর্তন) ও তাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল এবং তার বৈশিষ্ট্য, এবং মেরুপ্রদেশের তৃণশস্যের বৈশিষ্ট্য। আর এটাও নিশ্চয়ই ভুলে যাওয়া যায় না যে, সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলেই শক্তিশালী বায়ুমণ্ডলের প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যেটা বাস্তব্য-অবস্থাকে এবং আবহমণ্ডলকে সারা ভূগোলক ব্যেপে প্রভাবান্বিত করে। ১৯৭৩ সালের অপারেশন বেরিংয়ের আসল ব্যাপারে ছিল: বেরিং সমুদ্র এবং চুকোট্‌কা উপসাগরে এবং এলাসকাতে সোভিয়েত ও মার্কিন বিশেষজ্ঞরা মেরু ও অর্ধ-মেরু অবস্থায় বাস্তব্য-ব্যবস্থার বহুবিধ ভাবে বিচার করে দেখার চেষ্টা করে সেখানে মহাসমুদ্রে ও বায়ুমণ্ডলের সংঘাত কিরকমের এবং মহাসমুদ্রের ওপর ভাগে কতো বরফ জমে আছে। অভিযানের সামনে যে সকল জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার মোকাবেলা করার জন্য সর্বাপেক্ষা অগ্রসর যন্ত্রপাতি, হেলিকপ্টার ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি নিয়ে দুটি সুসজ্জিত

---

৫১. মেরু অঞ্চলে প্রচণ্ড তুষার পাতের ফলে জমির ওপরে উঁচু শক্ত বরফ জমে যায় শীতকালে এবং পরে গ্রীষ্মকালে বরফ খানিকটা গলে গেলে জমিটা খানিকটা তুলতুলে নরম হয়ে যায়—অনুবাদক

জাহাজ ও বিমান পাঠানো হয় প্রয়োজনমতো মহাকাশের প্রান্তভাগে যাবারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দুই দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতার বলে আরও কয়েকটি জটিল প্রাকৃতিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে বিচার করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কুরস্ক অঞ্চলের যুক্ত সোভিয়েত-আমেরিকান পরীক্ষার ফলস্বরূপ এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে, ১৫-২০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের যে স্তর আছে, সেটা আগে যা ভাবা গিয়েছিল তা থেকে অনেক বেশি আবহাওয়াকে নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার দূষণ এবং তাতে কারবন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব কতো বেশি —সেটাকে অনুধাবন করা বেশ ঔৎসুক্যের ব্যাপার। কারণ অনেক বিশেষজ্ঞের মতে সেটা (অর্থাৎ কারবনডাই-অকসাইডের[৫২] ঘনত্ব—অনুবাদক) যেন একটা 'গ্রীন হাউস'-এর মতো কাজ করবে, অর্থাৎ পৃথিবী-গাত্রে তাপমাত্রা জমা হওয়াটা বেড়ে যাবে অথচ মহাকাশে তেজঃবিকীরণ হয়ে যাওয়াটাকে বন্ধ করে বা আটকে দেবে। সোভিয়েত ও মার্কিন বিশেষজ্ঞরা রাজি হয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই যুক্তভাবে ভূকম্পনের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের কাজ সান্ এনড্রিয়াস ফল্ট (কালিফোর্নিয়া) এবং গুরাম দুসাম্বে (তাজিক সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক)-তে করছেন, আর হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও কামচট্কা উপদ্বীপে সুনামী নামে বিরাট প্লাবনের খবর যাতে আগে থেকে দেওয়া যেতে পারে তার জন্য কাজ হচ্ছে।

---

৫২. কলকাতার বটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে যেখানে উদ্ভিদদের রাখা আছে তার ভেতরটা গরম। তার কারণ উদ্ভিদগুলি থেকে যে তাপমাত্রা নির্গত হয়, সেটা উদ্ভিদ-ঘরের কাচের কাছে আটকে যায়। একে বলে-গ্রীন হাউস এফেক্ট। তেমনি পৃথিবীর উপরের বায়ুমণ্ডলে যতো কারবন্ ডাই অক্সাইড জমা হবে, সেটা এই কাচের ছাদের মতো ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্গত তাপরশ্মিকে (যেটা সূর্যালোকে উত্তপ্ত হয়) আটকে দেবে। কাজেই উপর আকাশের বায়ুমণ্ডলে কারবন্ ডাই অক্সাইড কতোটুকু জমা হচ্ছে, তার উপর পৃথিবীর জমিতে তাপ নির্ভর করে—অনুবাদক।

নভেম্বরে ১৯৭৪ সালে ওয়াশিংটনে বনসম্পদের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য সোভিয়েত আমেরিকা প্রোটোকলে প্রকৃতিকে রক্ষা করাও একটা বিষয় বলে ধরা হয়েছে। সোভিয়েত ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাপারে যা-কিছু জানা দরকার সেই জ্ঞানের আদান-প্রদান করছেন এবং বনকে ধ্বংসকারী জীবাণু, অসুখ এবং আগুন (বা দাবানল) থেকে বাঁচাবার জন্য রিসার্চ চালাচ্ছেন। ঠিক ঠিক ভাবে বন থেকে সম্পদ আহরণের জন্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ কি হতে পারে সে সম্পর্কে প্রোটোকল কাজ করছে এবং বনভূমিতে বৃক্ষাদি রোপণ করার কাজও করছে।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে সোভিয়েত আমেরিকান কার্যক্রমের ফলাফল সম্পর্কে পরিমণ্ডলের গুণাগুণের ব্যাপারে কাউনসিলের রিপোর্ট বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে এটা পারস্পরিক সুবিধাজনক সহযোগিতার এবং খবরাখবর আদান প্রদানের ও প্রকল্পের একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। 'তার চতুর্থ বাৎসরিক রিপোর্টে কাউন্সিল বিশেষ করে বলা হচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর লাভবান হতে পারে। সহযোগিতা আরও বাড়লে পরিমণ্ডল সম্পর্কে সাধারণ সমস্যার সমাধানের আরও বেশি সম্ভাবনা দেখা দেবে।

দূষিতকরণের স্তর কতোটা (অর্থাৎ কতোটুকু হয়েছে) সেটা নির্ধারণ করার জন্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহ, নোংরা আবর্জনাসমূহকে পুনরায় ফেরৎ পাবার জন্য ব্যবস্থাপনা, বাস্তব্য দিক থেকে পরিষ্কার প্রযুক্তি এবং আবর্জনামুক্ত উৎপাদন—এ সবই বেশ সংযত কারণেই "সর্বাপেক্ষা আধুনিকতম বস্তু ও প্রযুক্তি" অর্থাৎ সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির নিদর্শন বলে বর্ণিত হয়েছে। সর্বাধুনিক জিনিসপত্র ও প্রযুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে "বদল" অর্থাৎ তাদের বিক্রির কথাটা, ধারে কিংবা অন্যভাবে দেওয়া হবে, এ দিয়ে ১৯৭০ সালের গোড়ার দিক থেকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বিতর্কের একটা প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; সেটা করা হচ্ছে

র্সভাতের পলিসি থেকেই যাতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আদানপ্রদান, পারস্পরিক সরবরাহ করা এবং যুক্ত প্রকল্প একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে সহযোগিতা স্থাপন করার যারা বিরোধী তারা এটাকে দেখাতে চায় এমন ভাবে যাতে মনে হবে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আদানপ্রদানের সম্ভাবনা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেন কোনো লাভই হয়নি।

ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক পলিসির কাউন্সিলের রিপোর্ট' কংগ্রেসের কাছে পেশ করতে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট বলেন যে, শিল্পকে আরও উৎপাদনক্ষম ও কার্যক্রম করতে জিনিসপত্র ও প্রযুক্তি হল অন্যতম উপাদান এবং অন্য রাষ্ট্রগুলোতে তাদের পাঠানো হলে সেটা আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্পর্কের 'পরে প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে। এটা নোট করা হল যে, অন্য রাষ্ট্রগুলোতে সর্বাধুনিক জিনিসপত্র ও প্রযুক্তি পাঠিয়ে দিলে সেটা মোটামুটি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষেই কাজ করবে, আমেরিকাও অন্য রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যের সঙ্গে পরিচিত হলে তা থেকে বেশ ভালোভাবেই লাভবান হবে। পরিমণ্ডলের রক্ষায়, মহাকাশে পর্যটনের, মহাসমুদ্রের সম্পদরাশিকে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রাকৃতিক সম্পদের বহুবিধ তথ্যানুসন্ধান চালানো, উপরন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে আরও অনেক কিছু, যাতে অন্য দেশের লোকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাতে প্রায় পারেই না—এ সকল ক্ষেত্রেই সাফল্যগুলোকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে। এই সকল ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার একচেটিরাজ বজার রাখে এবং অন্যদেশগুলোকে প্রযুক্তির প্রায়োগিক ব্যবহারের মাত্র কয়েকটি দিকের মাধ্যমে তাদের পূর্ণ আমেরিকান কর্তৃত্বের মধ্যে আনতে চায়।

নিশ্চয়ই এভাবে দেখাটা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে কয়েকটি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা স্থাপনে উৎসুক, এটাকে কয়েকজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ মনে করেন, প্রধানত তার উৎপাদনের কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেখানে সে (অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন) এখনও বিশ্বমানে পৌঁছতে পারে নি সেইজন্য। তারা দাবি করে যে, (প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে) এই ধরনের উন্নতি করতে পারলে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থনীতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হতে পারে এবং দুনিয়ার বাজারে তার স্থান এখনও সুরক্ষিত হয়নি।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর যুগে সোভিয়েতের আর্থনীতিক সাফল্যের কথা অস্বীকার না করে অনেক আমেরিকান বিশেষজ্ঞ তা সত্ত্বেও মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সংগে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত সহযোগিতার দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিজের শিল্পায়নের সমস্যাকে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি ও সফলভাবে করে ফেলতে সক্ষম হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বাধুনিক জিনিসপত্র ও প্রযুক্তি "পাচার" বা "পাঠিয়ে দেওয়ার" চলে কি, না আমেরিকান কংগ্রেসে, ব্যবসায়িক চক্রগুলোতে এবং গভর্নমেণ্টের প্রশাসনিক বিভাগে এই তর্ক চালাতে তিনটি প্রধান গ্রুপকে খুঁজে বার করা সম্ভব, যারা সোভিয়েত অ্যামেরিকান সম্পর্কের ব্যাপারে সাধারণ ভাবে এবং বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য বিশেষ করে বিশিষ্ট মতবাদ প্রকাশ করেছিল।

প্রথম গ্রুপের মধ্যে প্রধানত কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরের সেই ধরনের রাজনীতিবিদরা রয়েছেন যাঁরা সোভিয়েত আমেরিকান-সম্পর্কতে দেঁতাতের প্রক্রিয়াকে তুলে দিতে চান। তাঁদের মনোভাব খুব পরিষ্কার। তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে বৃহত্তর সুবিধা আদায় করতে চান এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র যাতে আধিপত্য করে তার নিশ্চিত ব্যবস্থা চান। সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বাধুনিক জিনিসপত্র ও প্রযুক্তি "পাচার" করার ব্যাপারে এই গ্রুপ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার বিপক্ষে যেসকল যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলোই ব্যবহার করতে

চান। তারা প্রমাণ করতে চান যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তার "বিপক্ষ"-কে জোরদার করা বিপদজনক এবং যতোদিন না সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শ ও আভ্যন্তরীণ সামাজিক ব্যবস্থার বদল হয়ে খানিকটা "উদারনৈতিকতা" দেখা যায় ততোদিন সোভিয়েত ইউনিয়নকে "বিপক্ষ" বলেই গণ্য করতে হবে।

তবু এই গ্রুপের মুখপাত্ররা, তাদের নেতা সেনেটর সভ্য, হেনরি জ্যাকসন, ব্যবসায় আইন তৈরি করতে গিয়ে যে অবস্থান নিয়েছিলেন, তা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বাধুনিক জিনিসপত্র ও প্রযুক্তি "পাচার" করার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করতে গিয়ে কিছুটা ভিন্ন অবস্থায় দাঁড়ালেন। ১৯৭৫ সালের শুল্ক বৎসরে দেশরক্ষার জন্য কি কি কেনা দরকার সেই আইন (Defence Procurement Act) সম্পর্কে জ্যাকসনের সংশোধনী প্রস্তাবে-এর প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

এই প্রস্তাবে শেষ অবধি যা বলা হল তা হল যে, রপ্তানির লাইসেন্স দিতে গিয়ে উচ্চতম কর্তৃত্ব আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষার সচিবকে ঠিক করতে হবে ঐ ধরনের জিনিসপত্র বা প্রযুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে অথবা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে দেওয়া হবে কি, না, এবং কংগ্রেসকে কিছুদিন পর পর তাদের কাজের কথা জানাতে হবে। "ঐ ধরনের জিনিসপত্র ও প্রযুক্তি পাচার করলে ঐ সকল দেশের সামরিক ক্ষমতা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেড়ে যাবে কি, না,"—সেটা বিচার করে তবে দেশরক্ষা সচিবের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যে ভাষায় জ্যাকসনের সংশোধনী এসেছিল, সে ভাবে কংগ্রেস তাকে গ্রহণ করেনি: সেনেটের সভ্য এডওয়ার্ড কেনেডি, ওয়াল্টার মনডাল এবং অন্যরা এই ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে দায়ী করলেন। তা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবাপন্ন রাজনীতিবিদরা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঐ ধরনের বিরোধিতা করতে পারেন।

দ্বিতীয় গ্রুপে রয়েছে দেশরক্ষা বিভাগের সেই ধরনের সরকারী ব্যক্তি (অফিসিয়াল) ও বিশেষজ্ঞরা, এবং সামরিক-শিল্প করপোরেশনের মালিকরা

যারা "জাতীয় নিরাপত্তার"-র সংগে "পাচার"-এর সমস্যাকে জড়িয়ে দেখে৷ "পাচার" সমস্যার সম্পর্কে দেশরক্ষা মন্ত্রকের মনোভাবটার রূপরেখা করলেম, প্রথমে, জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে ম্যালকম কুরী প্রতিরক্ষার দপ্তরে প্রতিরক্ষা রিসার্চ ও ইন্‌জিনিয়ারিং বিভাগের ডিরেকটার। জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের (Industrial Association in Defence of National Security) এক আলোচনা সভাতে বক্তৃতা প্রসংগে তিনি "উচ্চ প্রযুক্তি-কে রপ্তানি করার বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করার জন্য দাবি করে যুক্তি দেখান যে, দীর্ঘ মেয়াদী সূত্রে দেখতে গেলে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা নির্ভর করছে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা কোন স্তরে পে"ীছেছে তার পরে। কুরীর মতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে চালু করার জন্য অনেক সময় প্রচেষ্টা ও টাকা খাটানো প্রয়োজন। তিনি আরও দেখালেন যে, যুক্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রোগ্রামে আমেরিকার অনেক পার্টনারই (যে সকল দেশ আমিরিকার সংগে যুক্তভাবে কাজ করছে—অনুবাদক) আমেরিকান বৈজ্ঞানিকও প্রযুক্তির সম্ভাবনার জ্ঞানলাভ করতে দীর্ঘও প্রভূত সম্পদ খরচ করতে হয় এরকমের রিসার্চ ও অন্যান্য কাজ করা থেকে বে"চে গেছে। উৎপাদনে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় এমন ধরনের প্রযুক্তিগত কায়দাকানুনের স্বল্পমেয়াদী সুবিধা, তাঁর মতে, দুনিয়া জুড়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতর চেহারা নিলে তার থেকে বেশি বিপদ দেখা দিতে পারে।

দেশরক্ষার ডিপার্টমেণ্টের নেতৃত্ব শক্তির ক্ষেত্রে বিরাট অণুর জৈবিক গঠনতন্ত্রে (molecular biology)[৫৩] এবং শান্তির জন্য মহাকাশ অভিযানের ব্যাপারে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের যুক্ত রিসার্চ চালানোর জন্য আপত্তি করেন না। কিন্তু ম্যালকম কুরী দাবি করেছিলেন যে, আমেরিকার

৫৩. যে বিজ্ঞানের বিভাগ অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ এবং প্রাণের উৎপত্তি ও গঠণতন্ত্র নিয়ে রিসার্চ করে—অনুবাদক।

উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের সুযোগ পেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন শক্তি সঞ্চারের সুযোগ পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্যকলাপে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, এর উদ্দেশ্য নাকি শিল্প-সংক্রান্ত প্রযুক্তির সাহায্যে পূর্ণ-উৎপাদন করে পালটা সামরিক জিনিসপত্র তৈরি করা।

রবার্ট সিম্যান যখন ন্যাশনাল একাদেমি অফ ইন্‌জিনিয়ারিংয়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন অনুরূপ ধারণা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। আমেরিকার খবর ও বিশ্ব রিপোর্ট (U. S. News and World Report) পত্রিকাতে তিনি বলেছিলেন: "ভবিষ্যতের জন্য প্রযুক্তিই হচ্ছে আমাদের প্রধান সম্পদ। সর্বত্রই একে সম্মান জানানো হয়। এটা এমনই একটা ব্যাপার যা বেশির ভাগ দেশ নকল করতে চায়। অন্য দেশের সঙ্গে দরাদরি করতে হলে এটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তুরুপের তাস আমাদের হাতে।" বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিকাশ করতে সিমান সাবধান হতে অনুরোধ করছেন, বিশেষ করে এখন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "অনেক সম্পদই দুষ্প্রাপ্য" এবং "প্রযুক্তি দেশের পক্ষে অন্যতম একটা প্রধান সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

শেষ অবধি 'পাচার'এর বিতর্কতে (ডিবেটে) যে সকল ব্যবসায়ীচক্র ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে উৎসুক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আদানপ্রদান চায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এবং এর জন্য আরও বেশি সুযোগ সুবিধা দিতে চায়, তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে তৃতীয় গ্রুপ। তাদের মতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে প্রযুক্তিগত আদান প্রদানের ব্যাপারটা কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকান শ্রেষ্ঠত্ব, শুধু এই একটি দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখলে চলবে না। তারা বিশ্বাস করে যে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত যোগাযোগ করতে হলে উভয় দিক থেকে করতে হবে (এক তরফা নয়) এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতাকে নাকচ করা যায় না এমন নীতিগত

ভিত্তিতে, যাতে তার বিরুদ্ধে বাছাবাছি করা হয়ে যায়। তারা স্থির বিশ্বাস করে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন একক ভাবে (অথবা অন্য রাষ্ট্রের সংগে সহযোগিতা করে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে।

কণ্ট্রোল ডেটা করপোরেশনের (তথ্য নিয়ন্ত্রণের করপোরেশন) প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (চিফ একজিকিউটিভ) উইলিয়াম. সি. নরিস যেমন বলেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে যুক্তভাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা (প্রোজেক্ট) চালু করতে পারলে কয়েকটি ব্যাপারে তাড়াতাড়ি ও অনেক ফলপ্রসূ এবং কম খরচে কাজ করার সম্ভাবনা দেখা যায়। তাছাড়া আমেরিকার কয়েকটি শিল্প করপোরেশনের নেতারা সেভিয়েত আর্থনীতিক ম্যানেজমেণ্টের 'কেন্দ্রীয়ভাব পরিকল্পনার ও সিদ্ধান্ত করার ব্যবস্থার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভাবে যোগ্য পার্টনার বলে মনে করে কারণ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মসূচী (বা প্রোগ্রাম) চালু করার জন্য আমেরিকাতে নির্মিত কমপিউটারকে তারা পেশ করতে পারেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক বিভাগের (ডিপার্টমেণ্ট অফ্ কমার্স) বিশেষজ্ঞদের মতে কয়েকটি ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের এমন কয়েকটি জিনিস পত্র ও প্রযুক্তি আছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই এবং যা আমেরিকা কিনলে তার সুবিধাই হবে। ধাতু পরীক্ষার এবং শিল্পে ব্যবহৃত প্ল্যাসটিকসের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের এবং দূরপাল্লার বিদ্যুৎশক্তি চালনার এবং পরিমণ্ডল রক্ষা করার ও শিল্প থেকে নির্গত দূষিত পদার্থসমূহ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কয়েক ধরনের প্রযুক্তি ও পদ্ধাতে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাতে প্রভেদ এবং দেঁতাতের শত্রুরা বিরুদ্ধা-চরণ করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জীবমণ্ডল রক্ষা করার ব্যাপারে সফলভাবে সহযোগিতা করে দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে কয়েকটি

ক্ষেত্রে আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের স্তর থেকে উদ্ভূত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর সমাধান হতে পারে।

সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্ক সাধারণ অবস্থায় আনতে পারলে কেবলমাত্র পরিমণ্ডলের ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোই নয় পরন্তু সারা ভূমণ্ডল জুড়েই যে তার সুফল হতে পারে এতে অনেক আমেরিকানরাই সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন।

জুন ১৯৭২ সালে প্রথম মস্কোতে দীর্ঘ-বৈঠকের অব্যবহিত পরেই জনৈক হ্যারিস পল গণভোটে উল্লেখ্য ফল পাওয়া গেল: যে আমেরিকানদের ভোট নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে শতকরা ৯২জন আবহমণ্ডল ও জল দূষিতকরণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের যুক্ত কাজের জন্য সম্মতি প্রকাশ করেন। আজকের দিনের অধিকাংশ আমেরিকানদেরও একই মত। মহাকাশে সহযোগিতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত খবরা খবরের আদান প্রদানের ব্যাপারে বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এবং পরিমণ্ডল সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য যৌথ প্রচেষ্টাকে একত্র করে কাজে লাগানোর জন্য সোভিয়েত-আমেরিকান সহযোগিতার যাতে আরও বিকাশ সাধন হয়, এর জন্য আমেরিকান জনসাধারণের বিশেষ ঔৎসুক্য আছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য রাজনৈতিক দেঁতাতকে সামরিক ক্ষেত্রে অনুরূপ দেঁতাতের পলিসি (উত্তেজনা প্রশমনের পলিসি) প্রয়োগের জন্য এবং পারস্পরিক মর্যাদা স্থাপনের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারলে এই সহযোগিতা আরও বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে।

৭ম পরিচ্ছেদ

রোমের ক্লাবের ভ্রান্তিগুলো

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নতি হলে শিল্পতে উৎপাদনের ভালো সম্ভাবনা দেখা দেয় আরও নিবিড়ভাবে চাষ করা যায়। আরও ভালো সামাজিক সম্পর্ক এবং সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সুসম সম্পর্ক গড়ে উঠে। তবে সমাজের সকল মানুষের জন্য গঠনমূলক মানবিকতাসম্পন্ন সমস্যার সমাধানের ফল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব থেকে সকল দেশের পক্ষে পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; দেখা যায় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সামরিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাতে তার সৃজনশীল দিকটা যথেষ্ট ব্যাহত হয় এবং আশু লাভের জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের সম্ভাবনাপূর্ণ ঝোঁককে হেয় করা হয়।

এই সকল কারণের জন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে নানারকমের টেকনিক্যাল (প্রকৌশলগত) ধারণার সৃষ্টি হয়। নেতৃস্থানীয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অধীনে যে প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা আছে তাকে সমাজের সকল অমংগলের জন্য দোষী করা হচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের নেতিবাচক ফলাফল-গুলো যে বাড়ছে এটা তো জীবন থেকেই প্রমাণ করা যায়; এর জন্য বুর্জোয়া বিজ্ঞানীদের ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি গ্রুপের বিশেষজ্ঞরা মানুষের ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্পর্কে ভাবতে প্ররোচিত করে এবং সারা ভূগোলক

জুড়ে নানারকমের ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করে। এই ধরনের কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য হল সাম্প্রতিক সভ্যতার সারা ভূগোলক ব্যেপে কি সমস্যা দাঁড়াবে সেটা দেখানো; বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ফলাফলের পুরোপুরি কি ধরনের ব্যবহারিক প্রয়োগ হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে নষ্ট করে দেওয়া হবে এবং নেতিবাচক ঝোঁক কোনো কোনো রাষ্ট্রে দেখা দিয়েছে সেগুলো খুঁজে বার করতে হবে।

আগামী দশকগুলোতে মানুষের সামনে কি কি সমস্যা দেখা দেবে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করার লক্ষ্য নিয়ে বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত কয়েকজন রোমের ক্লাব নাম দিয়ে তার উদ্যোগে তথ্যগুলো প্রচার করা হচ্ছে; ১৯৬৮ সালে এই নামে একটি বেসরকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ৭০ জন এবং ২৫ টি দেশের বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত শিল্পপতি এবং রাজনীতিবিদ্‌দের নিয়ে। এই ক্লাবের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে দীর্ঘ-মেয়াদী ভবিষ্যতের এবং সামাজিক পরিকল্পনার ব্যাপক ব্যবহার করে বিকাশের সমস্যার সমাধান করা।

এর প্রতিষ্ঠাতাদের ধারণানুসারে রোমের ক্লাবের কোনো মতাদর্শগত আনুগত্য নেই। এর প্রথম কয়েক বছরে সমগ্র মানুষের সামনে সারা ভূগোলককে জুড়ে পর্যালোচনা করে যেমন বল্গাহীন নিরঙ্কুশ জনসংখ্যার বৃদ্ধি, পরিমণ্ডলের দূষিতকরণের হার, খনিজ ও অন্যান্য পদার্থ নষ্ট করে ফেলা ইত্যাদি থেকে পরিণাম কি হবে—এই সকল সমস্যা নিয়ে তাদের কার্যকলাপ চলেছে। ক্লাবের নেতাদের মতানুসারে সারা দুনিয়ার সমস্যাকে প্রথমে বুঝে তারপর কখন ঠিক কোন্ ধরনের বিশেষ সমস্যাকে সমাধানের চেষ্টা করার আশু প্রয়োজনীয়তা, সেটা নির্ধারণ করতে হবে। ক্লাব সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ করে কয়েকটি পরিকল্পনাতে রিসার্চের কাজ শুরু করে দেয় এবং তারপর যে সকল লোকেরা এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারে তাদের কাছে পূর্ণ ফলাফলটি পৌঁছে দেয়।

ক্লাবের প্রথম রিসার্চের বিষয় ছিল, "বৃদ্ধির সীমানা" (Limits to Growth)—ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি-তে যারা কাজ করেছে সেই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটা রিপোর্ট। এদের কাজ করার পদ্ধতির একজন লেখক হচ্ছেন, এম্. আই. টি-র স্লোয়ান স্কুল অফ্ ম্যানেজমেণ্টের প্রফেসার জেয়, ফরেস্টার; ডিজিটাল কমপিউটার নিয়ে কাজ করার জন্য তাঁর পরিচিত এবং গতিবিদ্যার পদ্ধতিতে তাঁর কাজ করার ব্যবস্থার বহুল ব্যবহার হয়েছে। শিল্পে গতিময়তা (Industrial Dynamics, ১৯৬১), পদ্ধতির নীতিসমূহ (The system principle, ১৯৬৮), শহরের গতিময়তা (Urban Dynamics, ১৯৬৯) এবং দুনিয়াতে গতিময়তা (World Dynamics, ১৯৭১)—ফরেস্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সকল পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন।

ফরেস্টার যে ধরনের পদ্ধতিগত গতিময়তার প্রয়োগ করেছেন, সেটা জটিল সামাজিক ব্যবস্থাতে প্রক্রিয়ার একটা নকল মডেলের মতো তৈরি করে কম্পিউটারের সাহায্যে ব্যবহার করা হয় এবং সেটা করতে পদার্থগত, সামাজিক ও মানষিক পরিবর্তনশীল উপাদানগুলোকে (variables) হিসেবের মধ্যে ঠিক ঠিক ধরা হয়। জটিল ব্যবস্থাতে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের সাম্প্রতিক অবস্থা বোঝার জন্য পদ্ধতিগত গতিময়তার ব্যবস্থা করা হয়। একটা বিশেষ ধরনের আন্তঃসম্পর্ক প্রথমে বিশেষজ্ঞরা গণিতের সাহায্য ছাড়াই বিশ্লেষণ করে থাকেন, তারপরে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলোকে রূপায়িত করা হয় অর্থাৎ কম্পিউটার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গণিতের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

যখন মানুষ কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে সেটা ঠিক করে এবং তাদের বিবর্তনের মূল ঝোঁকগুলোকে বিশ্লেষণ করে তখন ক্লাবের কাজের প্রথম পর্যায়ে তাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকে নজর দিতেই হয়। আর যদিও তারা তাদের এই উন্নতিকে সমস্যাবলীর মূল কারণ বলে অভিহিত করে না, তথাপি এই সকল সমস্যাবলীর কেবলমাত্র তালিকা তৈরি করলেই দেখা যায় যে, ঐ ধরনের উন্নতি থেকেই এই ঘটনাগুলোর

উৎপত্তি এবং ব্যাপকভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক ফলাফল তার উপরে নির্ভর করে।

আজকের দিনের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর বিকাশের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক-সম্পদকে ক্ষয় করে ফেলা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আস্থা হারানো, খাপছাড়া ভাবে নাগরিক বিকাশ (বা নগর গড়ে ওঠা) এবং আর্থনীতিক দিক থেকে নানারকমের মুশকিল। এই পর্যালোচনা যাঁরা করছেন এবং সে সম্পর্কে লিখছেন, সেই লেখকরা কিন্তু তার উল্লেখ করেন "সারা দুনিয়ার মানুষের" সমস্যা বলে এবং সমস্যাবলীর "দুনিয়া জুড়ে তালিকা" তৈরি করেন, যাতে তাঁদের মতে তার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো পারস্পরিক কাজ করে এই ধরনের প্রযুক্তিগত, সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক উপাদানসমূহ।

সেদিক থেকে প্রচুর ব্যাপক নানারকমের তথ্যাদি থেকে দীর্ঘ-মেয়াদী দুনিয়ার সমস্যাবলী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই ধরনের পদ্ধতি (system) স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সারা দুনিয়ার বিকাশের একটা বর্ণনামূলক মডেল মতো রূপায়ণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার[৫৪] উপযোগী বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের থেকে উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা একেবারে গোড়াতেই অকার্যকরী (বা ফেল) হতে বাধ্য।

"বৃদ্ধির সীমানা" (Limits to Growth) বইয়ের আসল এই দুর্বলতার কথাটা ধরা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এবং কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশেরও কয়েকটি সমালোচনাতে।

এটাও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, ফরেস্টার ও তাঁর সহকর্মীদের কাজের মূল্য কেবলমাত্র এবং শুধু তার "প্রযুক্তিগত" কারণেই নয়। যেটা আরও

৫৪. অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক, অগ্রসর ধনতান্ত্রিক, উন্নয়নশীল দেশগুলির বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থার—অনুবাদক

তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হল—আজকের আমেরিকাকে তোলপাড় করছে যে ধরনের প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলী সে সম্পর্কে তাঁদের পক্ষপাতহীনভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা; যদিও এটা তাঁরা খুব সাধারণভাবে এবং অনেক সময়েই দোটানা মনোভাব নিয়ে করে থাকেন; তা থেকে স্বীকৃত হয় যে, আমেরিকাতে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের নিরংকুশ বিকাশ থেকে যে ভাবে আমেরিকান অর্থনীতিতে চাপ ও বক্রতা দেখা দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে তাঁরা অপারগ। এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, ফরেস্টার-এর মতো এমন বিশিষ্ট অনুসন্ধানকারীও প্রশ্ন তুলেছেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তার পররাষ্ট্রনীতির বা আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানের জন্য তার প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার পরে নির্ভর করতে পারে কি, না? আরও যেটা দেখা দরকার সেটা হল ফরেস্টার তাঁর পেপারগুলোতে একটা নির্দিষ্ট "দিক পরিবর্তনের" প্রস্তাব করেছেন; তাঁর মতে যে সকল সমস্যার সমাধানের কোনো পথ খোলা নেই (যেন কানাগলির মধ্যে ঢোকা হয়েছে) সেখানে তিনি বলছেন, ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত চরিত্র থেকে সমস্যাগুলোর উদ্ভবের প্রাথমিক কারণগুলো খুঁজে বার করতে হবে। "সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও ভালো করে বোঝার পূর্বে" তিনি সিদ্ধান্ত করছেন, "কোনোরকমের সংশোধনকামী কর্মসূচী গ্রহণ করার চেষ্টা করলে আমাদের হতাশ হতেই হবে বলে তিনি মনে করেন"।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সামনে বেশ পর পর কয়েকটি জটিল সমস্যাবলীর উদ্ভব হলে তার সমাধান করতে এই রাষ্ট্রগুলোকে কি মনোভাব নিতে হবে এবং কেমন করে তাকে দেখতে হবে, ফরেস্টার তার পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "বন্য জন্তু যেমন শিকারীদের দ্বারা তাড়িত হয়ে ফেরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সেইরকমের। আমাদের এখনও খানিকটা জায়গা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও চাষের জমি খালি পড়ে রয়েছে। যে প্রাচুর্যের সম্পদকে ধরে রাখার জন্য প্রকৃতি এখনও আমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট রক্ষণাগার রেখেছে তাতে আশ্রয় নিতে পারলে আমরা ক্রমবর্ধমান

জনসংখ্যার এখনও মোকাবেলা করতে পারি। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, সেই রক্ষণাগারের পরিমাণ সীমিত। যতোক্ষণ পর্যন্ত পালাবার পথ আর না থাকে ততোক্ষণ বন্য জন্তুকে পেড়ে ফেলতে না পারলে সে পালাতেই থাকে। তারপরে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়তে থাকে যদিও তখন তার এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে আত্মরক্ষা করার আর পথ থাকে না। খোলা জায়গায় থাকাকালীন সেখানে দাঁড়িয়ে লড়লে পরাজয় (বা ধ্বংস) মেনে নেবার এবং তাকে এড়াবার যতোটা উপায় তার ছিল, এখন তার সেটা থাকছে না। সামাজিক চাপ যেমন যেমন গড়ে ওঠে তেমনি তেমনি তার সুরাহা করার চেষ্টা করে সে (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুবাদক) দীর্ঘ-মেয়াদী ক্ষতি থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু আমরা যদি এর আসল কারণগুলোকে দূর করার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র লক্ষণটি নিয়েই ব্যাপৃত থাকি তাহলে ফল হবে, চূড়ান্ত যে বিপদ রয়েছে তার সম্ভাব্যতাকেই কেবল বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং যখন আমাদের আর পালাবার কোনো জায়গা থাকছে না, সেই অবস্থায় প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার ক্ষমতাকে আমরা কমিয়ে দেবো।"

ক্লিভল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. মেসারোভিক এবং হ্যানোভার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ই. পেস্টেল লিখিত রোমের ক্লাবের দ্বিতীয় দলিলের নাম দেওয়া হয়েছে। "দিক পরিবর্তনের মুখে মানব সমাজ" (Mankind at the Turning Point) এই বইয়েতে যা মূল্যায়ন ও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেটা অনেকটা শান্ত বা কম উত্তেজিত। এতে লেখকদ্বয় বৃহত্তর জনসাধারণের সামনে তাঁদের পড়াশুনার ফলাফল পৌঁছে দিতে চান বেশ বোধগম্য করে। তাঁদের মতে, বেশ ভারসাম্য নিয়ে 'জৈবিক' (orgnic) আর্থনীতিক বৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্মিত পরিকল্পনা করতে পারলে মানুষকে "জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত নিশ্চিত ধ্বংস" (demographic doomsday) এবং যাকে আজকের মানব জাতির সংকট থেকে মুক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে তার, ক্ষতিকারক ফলাফল থেকে রক্ষা করা সম্ভব। মেসারোভিক এবং পেস্টেলও আশা করেন

যে, বিশ্ব অর্থনীতির, শক্তির প্রয়োজনের এবং তার ভোগের মান ঠিক করে যে, মডেল তাঁরা তৈরি করেছেন, সেটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে একটা উপাদান হিসেবে গণ্য হবে। তাঁদের ভূমিকাতে যেমন তাঁরা বলেছেন, অনেক এলাকাতে সারা ভূমণ্ডল জুড়ে পরিকল্পনা করার মতো সামগ্রিক হাতিয়ার নিয়ে তাঁরা রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক সিদ্ধান্ত নেবেন, যেটা দুয়ারে আঘাত করছে যে সংকটগুলো তাকে এড়াতে তাদের কাজে লাগবে।

ক্লাবের দ্বিতীয় রিপোর্টে কয়েকটি প্রস্তাব আছে যা থেকে বোঝা যায় এর লেখকরা আজকের দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে অনেক বেশি বিষয়গত (objective) মূল্যায়ন করছেন এবং সারা ভূমণ্ডলের সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক বেশি বাস্তব তথ্যনিষ্ঠ প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবার প্রস্তাব করেছেন। বিশেষভাবে সারা পৃথিবীটাকে বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং জীবনধারণের পদ্ধতি, তার আর্থনীতিক বিকাশের স্তর সামাজিক আর্থনীতিক কাঠামো এবং একই ধরনের সমস্যা যে সকল রাষ্ট্রগুলোতে পাওয়া যাবে, সেই ভাবে ভাগ করার প্রস্তাব তাঁরা করেছেন। এই ধরনের স্তরগুলো, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাকৃতিক (বা ভৌত), বাস্তব্য, আর্থনীতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া এবং যাদের মধ্যে মানুষকে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সত্তা হিসেবে ধরতে হবে, সেটা লেখকদের দ্বারা দৃশ্যপটকে যেন আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে এবং আজকের দুনিয়ার বিশিষ্ট দিকগুলোর সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করে।

লেখকদের মতে এই ধরনের পদ্ধতিসম্মত অভিগমন (বা পৌঁছ) ক্লাবের প্রথম রিপোর্টের অপেক্ষা একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে এবং তাদের যুক্তিতর্কে আমাদের কালের সামাজিক-আর্থনীতিক প্রক্রিয়াগুলোকে কিছু বিচার করে দেখতে সাহায্য করে। কিন্তু যে-অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে দ্বিতীয় রিপোর্টের লেখকরা কার্যত তাদের পূর্বসূরীদের অনেকগুলো মূল্যায়নেরই এটা ধরে নিয়ে পুনরাবৃত্তি করেন যে,

বিভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রদের সামনে একই ধরনের বিপদ দেখা দিয়েছে। তাঁরা দাবি করেন যে, সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা বিশ্লেষণার্থ জন্ম মৃত্যু রোগ প্রভৃতির পরিসংখ্যা যে (ডেমোগ্রাফিক) সংকট-জনক অবস্থা পরিমণ্ডলের অবক্ষয় এবং খাদ্য-সংকট-এ সবই যদি ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় (অর্থাৎ যদি এ সম্পর্কে কোনো কিছু ব্যবস্থাদি না নেওয়া হয়—অনুবাদক), তাহলে দুনিয়া জুড়ে ভীষণ বিপদ দেখা দেবে।

"জৈবিক বৃদ্ধি" (organic growth) এবং সভ্যতার আরও উন্নতির জন্য যে সম্পদকে পুনরায় লাভ করা যায় না (non-renewable resources) তার ঠিক ঠিক হিসেব রাখতে হবে—মেসারোভিকও ও পেস্টেলের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু যেটার সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্বচ্ছ থেকে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে, ব্যক্তিগত মালিকানার স্বার্থে চালিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো তাদের সামাজিক কাঠামোকে মৌলিকভাবে না ঢেলে সাজিয়ে এবং সমাজের সকল মানুষের প্রয়োজনকে মেটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজকর্মকে "নতুনভাবে চালনা" না করতে পারলে কি ভাবে ঐ ধরনের যুক্তিসম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করবে? সেই কারণেই তাদের অনেকগুলো "প্রকল্প" (hypotheses), যাতে শক্তির সমস্যার (কোথা থেকে শক্তি পাওয়া যাবে তার সমস্যা—অনুবাদক) অথবা জনসংখ্যার রোগমৃত্যুবৃদ্ধি জনিত পরিসংখ্যানের অথবা খাদ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে যে বইগুলোতে, সেগুলো কল্পস্বর্গীয় (ইউটোপিয়ান) বলে মনে হয়।

একই সময়ে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিষয়বাদী হবার ইচ্ছা থেকে লেখকরা সারা ভূগোলকের কয়েকটি সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েকটি যথার্থ পূর্বশর্তকে মেনে নিতে হয়। যেমন—শক্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখকরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হওয়া নয় পরন্তু "দুনিয়ার ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের" মধ্যে সহযোগিতাই এই অবস্থার মধ্যে পথ খুঁজে পাবার সম্ভাবনা বহন করে।

যোগাযোগভিত্তিক ও পেস্টেল দীর্ঘমেয়াদী কয়েকটি ব্যবস্থা নেবার কথা বলে, যাতে অনেকগুলো রাষ্ট্রকে নিয়ে সংকটকে বুঝতে হবে, সহযোগিতা চালু করতে হবে এবং জাতীয়ভাবে চিন্তা করা থেকে সমগ্র মানুষের সাধারণ ভাগ্যকে হিসেবের মধ্যে ধরে ভবিষ্যৎ পুরুষ যাতে টিকে থাকে তা দেখতে হবে। সারা দুনিয়া জুড়ে সংকটের মোকাবেলা করার জন্য ব্যবস্থাপনা নেবার প্রয়োজন স্বীকার করে "দুনিয়া জুড়ে একটি সংস্থা" (world body) গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, যার পরে জনসাধারণের ও গভর্নমেন্টগুলোর বিশ্বাস ন্যস্ত থাকবে। তা সত্ত্বেও ক্লাবের দ্বিতীয় রিপোর্টে একটা নির্দিষ্ট অগ্রগামী পদক্ষেপ দেখা যায়, যাতে দুনিয়াজোড়া সংকটের কারণ খুঁজে বার করে তার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে ; তবু তার মধ্যে ভালোরকমের পদ্ধতিগত ভুল আছে, সেটা হল সকল রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের সামাজিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের নেতিবাচক ফলাফলগুলোকে "সমানভাবে" ছড়িয়ে দেওয়া।

এর পরের কাজে রোমের ক্লাব তাদের "দৃষ্টিভঙ্গীকে" লক্ষণীয়ভাবে ব্যাপকতর করেছে এবং নিছক গাণিতিক বিশ্লেষণের পথ থেকে কিছুটা সরে গিয়ে আরও সামগ্রিক বহুদিক বিশিষ্ট মূল্যায়ন করার দিকে ঝুঁকেছে ; তারা বহু দেশের উচ্চতম রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা দেখতে পাওয়া যায় ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালের সালজবার্গের মিটিংয়ে, যাতে বহু প্রখ্যাত রাষ্ট্রনেতারা যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের কালের মৌলিক সমস্যাগুলোকে এর ঘোষণাপত্রে (বিজ্ঞপ্তিতে বা কমুউনিকে) তালিকাভুক্ত এবং তার চরিত্রায়ণ করা হয়েছিল। এই ধরনের কয়েকটি পয়েন্ট সেখানে করা হয়েছিল :

রাজনৈতিক নীতিজ্ঞান ও অগ্রাধিকার

ন্যায়ের ভিত্তিতে নতুনভাবে শান্তিপূর্ণ কাঠামো তৈরি করার জন্য পারস্পরিক কথাবার্তা (বা আলাপ-আলোচনা—dialogue) এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা করা দরকার যাতে দে'তাত ও নিরস্ত্রিকরণ হতে পারে। ব্যাখ্যা করার কাজ করতে হবে যার মধ্যে বোঝাতে হবে যে, স্থানীয় বা আঞ্চলিক সুবিধাগুলো ছেড়ে দিতে হবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাবার জন্য।

আর্থনীতিক বৃদ্ধির পলিসি

অতীতের মতোই বেশির ভাগ দেশগুলো আর্থনীতিক বৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে। এই বৃদ্ধি বেছে বেছে, এবং জনসাধারণের প্রধান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে।

জনসংখ্যার পলিসি

কয়েক দশক ধরেই বেকারী আছে এবং থাকবে—উন্নয়নশীল দেশগুলোর এটা অন্যতম একটা প্রধান সমস্যা। আগামী ত্রিশ বছরে দুনিয়ার জনসংখ্যা যে বেড়ে ডবল হয়ে যাবে, এই সমস্যা সম্পর্কে একেবারেই যথাযোগ্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। যে সকল দেশগুলোর জনসংখ্যা খুব সম্ভব প্রচণ্ড-ভাবে বৃদ্ধি পাবে, তাদের নতুন উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ও আর্থনীতিক বিকাশের জন্য বিশেষ তাগিদ যাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্পদসমুহ

একদিকে কাঁচা মালগুলোর মধ্যে যাতে সঠিক ও সুস্থিত দর বজায় থাকে, অন্যদিকে তাদের সংগে শিল্পজাত জিনিসগুলোরও যাতে দর ঠিক থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শক্তি সরবরাহের ও শিল্পজাত বস্তুগুলোর এবং

আন্তর্জাতিক বাজারে একদিকে বাড়তি খাদ্যদ্রব্য জমে যাচ্ছে অথচ তাদের ক্রমান্বয়ে ঘাটতি দেখাই যাচ্ছে—এতে উন্নয়নশীল দেশগুলো কি ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, তার মূল্যায়ন করা দরকার। শিল্পোন্নত দেশগুলোর শক্তি ও কাঁচা মাল পেতে মুদ্রাস্ফীতি হওয়াতে বাড়তি দাম দিতে হচ্ছে, আর এই খরচের ভার বহন করতে হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। যে সকল জিনিসপত্রের যোগান কম আছে তাদের ব্যবহার কমাবার জন্য নতুন ধরনের আর্থনীতিক বিকাশ করা দরকার এবং তার জন্য যতোদূর সম্ভব পরিমণ্ডলের পরে চাপ যাতে কম পড়ে সেটা করা দরকার। যে সকল সম্পদকে অস্ত্র নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের সামাজিক ও আর্থনীতিক বিকাশের কাজে নিয়োগ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান

সারা ভূগোলক জুড়ে রণনীতিকে কাজে লাগাবার জন্য প্রয়োজন যুক্তিসম্মত যন্ত্রপাতির। অনেকগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে তার অতীতের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার গুরু দায়। নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পরিবর্তে বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো জোরদার করা উচিত। ক্রমান্বয়ে সংকট থেকে এড়াবার জন্য বর্তমান পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটার কথা যথাযোগ্য চিন্তা করে নতুন সম্পর্কের কাঠামো উদ্ভব করা দরকার।

এই বিজ্ঞপ্তি (কমুউনিকে) এমন ভাষাতে লেখা হয়েছে, যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সারা ভূগোলকের সমস্যাবলী অনুধাবন করা ছাড়া রোমের ক্লাব বিশ্ব রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে একটি স্থান, যদি সেটা কেবলমাত্র আশু সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক সমস্যা হয় অন্তত তার রূপায়ণ করে নিতে চায়।

ক্লাবের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের নতুনভাবে পড়াশুনার জন্য কাজ ঠিক করা হয়েছে, আর. আই. ও. (RIO), অথবা আন্তর্জাতিক

অবস্থাকে পর্যালোচনা করা (Renewing the International Order), যেটা ইউনাইটেড নেশনসের সাধারণ সভার ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলোকে কাজে পরিণত করার জন্য প্রায়োগিক দিক থেকে যেন একটা কর্মসূচী (বা প্রোগ্রাম) এবং যাকে বলা হচ্ছে এক নতুন ধরনের আর্থনীতিক ব্যবস্থা।

এর একেবারে প্রথম পাতাগুলোতেই সমস্যাটিকে ব্যাপকতর আকারে উপস্থিত করা হয়েছে, যাতে এমন বিকাশের চেহারা দেওয়া হচ্ছে যেটার পরিচয় রয়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে এবং আমাদের গ্রহের প্রত্যেকের মঙ্গল সাধনে। এই অনুসন্ধানের (স্টাডির) লেখকরা দেখিয়েছেন যে, বিশ্ববিকাশের যে লক্ষ্যগুলোকে তাঁরা রূপায়িত করতে চান সেগুলো উৎপাদনের বাস্তব পরিবেশ এবং ভোগের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে না, পরন্তু তার মধ্যে আত্মিক মূল্যবোধ, মুক্তি ও সমানাধিকার এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

আর. আই. ও, অথবা আন্তর্জাতিক অবস্থাকে পর্যালোচনা করার অনুসন্ধানের প্রতিটি বিভাগের মধ্যে বিশ্ব বিকাশের আন্তর্জাতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার জন্য, গভর্নমেন্টের কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চরিত্র নির্ধারণের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত লক্ষ্যের জন্য অনেকগুলো ঘোষণা সূচক বিবৃতি রয়েছে। এই দলিলের সকল সমস্যাকে বিশদ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে, যার মধ্যে সামরিক প্রযুক্তি থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভাগগুলো রয়েছে।

এই অনুসন্ধানে মানুষের আজকের বিকাশের সমস্যার সমাধানের জন্য কোনো ঔষধের বা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা না করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে দেখিয়ে একটা ছাঁচ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সত্য বটে, কয়েকটি সমাধানের পন্থা পেশ করা হয়েছে কিন্তু ক্লাবের আগেকার কাজের মতোই, সেটাতে আসলে ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক কাঠামোর

যথার্থ প্রগতিশীল পথে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানোর পরিবর্তে ধনতন্ত্রের সংকট থেকে বেরোবার অনুকূল উপায়ই নিশ্চিত করার আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করার সামিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

"বিশ্ব বিকাশের সমষ্টিগত লক্ষ্য" কি, সে সম্পর্কে টীকা দিতে গিয়ে লেখকরা তালিকা তৈরি করেছেন যার মধ্যে রয়েছে ; ভূমিকম্প, প্লাবন, যুদ্ধ ও খুন খারাপি থেকে মানুষের জীবনকে রক্ষা করা ; "একটি জাতির আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃজাতির ক্ষেত্রে" সমানাধিকার স্থাপন করা ; সিদ্ধান্ত করার জন্য সমাজের মানুষজনের অংশগ্রহণ এবং জাতীয় গ্রুপগুলোর জৈবিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা, একই সংগে জীবমণ্ডলকে রক্ষাকরার জন্য সকল প্রচেষ্টাকে এক জায়গায় জড়ো করা। কিন্তু এই একটি উদাহরণেই দলিলের অন্তর্নিহিত পদ্ধতিগত দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির একটা বিশেষ স্তর থেকে উদ্ভূত প্রকৃতিগত ও সামাজিক প্রক্রিয়ার ও সমস্যার এবং যার সংগে যোগ রয়েছে সমাজের ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক, তার সংগে ঐ প্রগতির থেকে যে সামাজিক-আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ফলাফল পাওয়া যায় তাকে পাশাপাশি রাখা যায় না, যে ফলাফলগুলো আবার বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত। যেখানে রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রচেষ্টাকে একত্র করে তাদের দিয়ে সতর্ক[৫৫] করিয়ে দেওয়ার কাজ করিয়ে নেয়—যেটা করতে তাদের সারা গ্রহ জুড়ে পরিমণ্ডল সম্পর্কে-সর্বস্তরে নানা রকমের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়—এবং সর্বস্তরে জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিগত থেকে অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবধি নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থাপনাকে গড়ে তুলতে হয়। (এই সমস্যাটিকে অনুসন্ধানে রূপায়িত করা হয়েছে), সেখানে নিশ্চয়ই আমরা সকল রাষ্ট্রকে কোনো-না-

---

৫৫. monitoring—অর্থাৎ সকল তথ্যকে হিসাব নিকাশ ঝাড়াই-বাছাই করে শেষ অবধি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো বা ভবিষ্যতের বিপদ থেকে সাবধান হওয়া—অনুবাদক

কোনো সামরিক সংঘাত সম্পর্কে একই ধরনের মনোভাব নেবে বলে আশা করতে পারি না।

অনুসন্ধানে বলা হচ্ছে, "আন্তর্জাতিক অবস্থাকে পুনরায় নতুন করে তৈরি" "করার অন্যতম উপায় হচ্ছে, সার্বভৌম" "জাতীয়-রাষ্ট্রদের" নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলার কথা ছেড়ে দিয়ে একটা ধোঁয়াটে "ভূমণ্ডলব্যাপী মানব সমাজ" স্থাপন করতে হবে। কোনো সন্দেহ নাই যে, বহু দেশই এই ধরনের দুনিয়াতে বিকাশকে গঠনমূলক বলে মনে করতে পারে।

"ভূমণ্ডলব্যাপী বিকাশ"-এর কাছাকাছি ধারণার মধ্যেই রোমের ক্লাবের তাত্ত্বিক ভ্রান্তিগুলো নিহিত রয়েছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক গ্রুপ, যারা বিশ্ব জুড়ে নতুন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য মডেল তৈরি করার প্রকল্প (World Order Models Project—WOMP) করতে চায়, তারা সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রকাশনা করেছে।

এই প্রকল্পের লেখকরাও মনে করেন যে, আজকের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর সীমানাকে উত্তীর্ণ করা প্রয়োজন এমন কি পররাষ্ট্রনীতিকে নির্ধারণ করার যে প্রথাগত ধারণাগুলো আছে, যেমন রাজনৈতিক আর্থনীতিক বা মতাদর্শগত, যেগুলোকে মাত্রা (dimensions) বলা যেতে পারে, সেগুলো বর্জন করতে হবে।

উন্নয়নশীল সমাজের অনুসন্ধানের জন্য নিউ দিল্লীতে যে কেন্দ্র আছে (New Delhi centre for the Study of Developing Societes) তার ডিরেক্টর, রজনী কোঠারীর মতে আজকের দুনিয়াতে প্রধান ভাগ হচ্ছে শিল্পে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সংগে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর, অর্থাৎ, এটা সেই "উত্তর-দক্ষিণ" লাইনের বিভাজন, যার আসলে কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থ নেই। তিনি মনে করেন যে, একমাত্র জনসংখ্যার জন্মমৃত্যু রোগ প্রভৃতি নিয়ে পরিসংখ্যানের (ডেমোগ্রাফির) খাঁটি ঝোঁকটিই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেকার বর্তমান অসাম্য ও বিভেদকে বাড়িয়ে তোলে এবং

দুনিয়াতে আরও বেশি মেরুবিভাজনের (polarisation) সৃষ্টি করছে। যদিও কোঠারীর মতে, একটা "পছন্দমাফিক ভবিষতে" পেঁছিতে হলে বর্তমান একক রাষ্ট্রগুলোর স্বতন্ত্রতার পক্ষে ক্ষতিকারক অসাম্য ও আধিপত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোকে ভেঙে দিতে হবে, তথাপি সেই ধরনের রূপান্তরণের ফলে কি ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ঘটবে তা, তিনি পরিষ্কার করে বলেন নি।

ওসলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার জোহান্ গালটুর "দ্বন্দ্ব ও শান্তির জন্য রিসার্চ" সম্পর্কে বিশেষ অধ্যয়ন করে থাকেন, তিনি যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে সেটা বিচার করেছেন। কয়েকটি প্রকল্পিত দ্বন্দ্ব বা সংঘাত কি ধরনের হতে পারে তার বিশদ বিশ্লেষণ করে তাদের সমাধানের পথ প্রস্তাব করেছেন। "পছন্দমতো জগতে" রূপান্তরণ করতে হলে সর্ব রকমের হিংসাকে পরিহার করতে হবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদজনক যেটা, সেটা তিনি একবার উল্লেখ করারও প্রয়োজন বোধ করেন না। খেটে-খাওয়া মানুষের এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর অন্যান্য সামাজিক গ্রুপের বিরুদ্ধে একচেটিয়াদের হিংসার বৃদ্ধি, যে হিংসা মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারীর বিরুদ্ধে হিংসা বেড়েই যাচ্ছে। জাতীয় ও বহুজাতিক করপোরেশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর কাঠামোর উন্নতি হলেও ঐ ধরনের সামাজিক হিংসাকে কখনও লুপ্ত হবে না বা করা সম্ভবও হবে না।

ভূগোলকের সমস্যাবলী সম্পর্কে এই ধরনের দুর্বলতা অন্য অনেক বিশেষ পরিচিত বিশিষ্ট ও সাধারণ প্রকল্পের (প্রজেক্টের) এবং অনুসন্ধানের (স্টাডি) মধ্যে রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখ করতে হবে, জাপানী বিজ্ঞানীদের দ্বারা রূপায়িত "বিকাশের নতুন দিক" লিনেমান যিনি খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর নেতৃত্বে কয়েকজনের গ্রুপের একটা মডেল এবং "মানুষের লক্ষ্য" (Goals for Mankind) নামে বই। তাছাড়া রয়েছে আরভিং লাসলো

প্রভৃতির দ্বারা "ভূগোলকের মানবসমাজের নতুন দিগন্ত সম্পর্কে রোমের ক্লাবের প্রতি রিপোর্ট' (A Report to the Club of Rome on the New Horizons of Global Community)।

সোভিয়েতের ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরা দেখিয়েছেন যে, রোমের ক্লাব ও অন্যান্য প্রকল্পতে বিশ্ব বিকাশের যে গাণিতিক বর্ণনামূলক মডেলগুলো দেওয়া হয়েছে তাতে আমাদের কালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার ব্যাপরটা বস্তুত অবহেলা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে : দুই সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থাদের মধ্যে সংগ্রাম। কেবলমাত্র ধনতন্ত্রের পরিবর্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনাই যে নয়, দুই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের কথাটা আমাদের কালে যে ঘটনাবলীর বিকাশের পরে বিশেষ রকমের প্রভাব বিস্তার করে, সেটাও এই অনুসন্ধানের পশ্চাদপটে ফেলে রাখা হয়েছে। আমাদের মতে সারা ভূগোলক জুড়ে এতো কেতাদুরস্ত (ফ্যাসানেবল) মডেল তৈরি করার যে বৈজ্ঞানিক ঝোঁক এবং সভ্যতার বিকাশের সামগ্রিক অনুসন্ধানের সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে, তার পেছনে বেরিয়ে পড়ছে প্রতিক্রিয়াশীল ও কল্পস্বর্গীয় (ইউটোপিয়ান) চরিত্র।

৮ম পরিচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং জীবমণ্ডলের রক্ষা

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক অথবা প্রযুক্তিগত সমস্যাকে সামনে রেখে এবং সেই সমস্যাকে সমাধান করার গুরুত্ব এবং সমাজের প্রয়োজনীয়তা কি করে তাতে মেটানো যাবে সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মসূচীকে আমাদের সময়ে রূপায়ণ করা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। সেই ধরনের কর্মসূচী (অথবা প্রকল্প) তৈরি করার সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে একটি প্রণালী সম্মত যৌগিক বস্তু (সিস্টেম) গড়ে তোলা। এই সিস্টেমে থাকবে সমস্যার উপাদানগুলোর সামগ্রিক বিশ্লেষণ, তাদের চরিত্র নির্ধারণ ও তাদের প্রতিক্রিয়ার ও তাদের মূল্যায়ন কি করে হবে সেটা ঠিক করা। অন্যান্য সাম্প্রতিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করার মতোই পরিমণ্ডল রক্ষা করার কাজটাও কয়েকটি প্রধান প্রধান স্তরের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে। তার মধ্যে থাকবে প্রাথমিক তথ্যদের বিশ্লেষণ ইন্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং প্রকল্পকে কার্যে পরিণত ও নিয়ন্ত্রণ করতে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যার মধ্যে দূষিতকরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নতুন কৃৎকৌশলগুলোও থাকবে। এই ধরনের জটিল প্রোগ্রামকে কাজে পরিণত করতে একটা "লক্ষ্য ভেদের জন্য নিশানা" (tree of targets) ঠিক করার রেওয়াজ আছে যেটা উৎপাদনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তাটাই এবং যে সকল প্রক্রিয়াগুলো বিকাশিত হচ্ছে তাদেরই কেবলমাত্র হিসেবের মধ্যে ধরে না, কেবলমাত্র নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে বাইরের সাধারণ অবস্থাকেই বিচার করে না, পরন্তু

কয়েকটি রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক সামরিক, দার্শনিক ও অন্যান্য উপাদানগুলোকে বিচার করে, যাতে আজকের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের উপরে নির্ভরশীল একটা দেশের পুরো প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার যুক্তি-সম্মত ব্যবহার নির্ভর করছে।

পরিমণ্ডলের ব্যবস্থাপনা করার জন্য "লক্ষভেদের নিশানা" তৈরি করে দূষিতকরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নতুন প্রকৌশলকে প্রয়োগ করা ও বিকাশ-করার জন্য যে সর্বনিম্ন অবস্থার সৃষ্টি করার দরকার এবং সেটার জন্য পরিমণ্ডল থেকে সারা সমাজের প্রতি ক্ষতিকারক প্রভাবকেও কমাতে হবে। এর জন্য শিল্পসংক্রান্ত কাজকর্মের থেকে যে ক্ষতি হয় তাকে কমাতে হবে।

পরিমণ্ডলের নিরাপত্তার জন্য যা করা দরকার সে সকল নিয়মাকানুন মেনে নিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের বৈজ্ঞানিকসম্মতভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, যদি নতুন ব্যবস্থা নেওয়াতে মৌলিক বিজ্ঞানের যারা প্রতিনিধি, প্রাকৃতিক, সম্পদের বিকাশের জন্য যারা বিশেষজ্ঞ, যারা জলের সম্পদকে বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করতে পারে, শৌচের ব্যবস্থার ও নগরের যারা ইনজিনিয়ার, যারা জমিতে চাষ করার জন্য, বনসম্পদের ও জন্তুর পালনের জন্য অভিজ্ঞ, যারা পরিবহণের যন্ত্রপাতি এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা করার ইনজিনিয়ার, যারা মাছধরার ও বন্যজন্তুর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং যারা জাতীয় পার্কে খেলাধুলার (রিক্রিয়েশন) এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে জানে—এদের সকলকে টানতে হবে। সাম্প্রতিক দার্শনিকরা, অর্থনীতিবিদরা, আইনজ্ঞরা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বিশেষজ্ঞরা প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা সম্পর্কে ক্রমশই অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। তাদের যুক্ত কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে, আজকের যে সমাজে প্রযুক্তিগত সম্ভবনা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রকৃতিকে তার সমস্ত সম্পদ দিয়ে সাবধানে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা ও যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে, তার মডেল তৈরি করে তার মধ্যেকার সম্পর্ককে যাচাই করে দেখা।

প্রযুক্তি ও উৎপাদনের আরও বিকাশ এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলাফলকে সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই মডেলের উপযোগী করতে হবে, যে মডেলটাও নিশ্চয়ই অপরিবর্তনীয় থাকবে না ; সেই মডেলকে ক্রমশই উন্নত, পরিবর্তিত ও যেমন যেমন আমরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলীকে জানতে পারবো, তেমনি ভাবে তার আধুনিকীকরণ করা হবে। উৎপাদনের জটিলতাগুলোকে পরিকল্পনা করার এবং নতুন কাঁচামাল দিয়ে ডিজাইন করার ও অন্যান্য প্রকৌশলগত নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করার জন্য মানব সমাজ ও তার স্বাভাবিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সম্পর্কের যে ভারসাম্য থাকে তার সংগে মডেলকে ঠিকমতো লাগসই করা যায় কি, না, সেটা দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি উপাদানকে লক্ষ্য করতে হবে। প্রথম, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর শিল্পগত ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের পরিধির সংগে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে মেলাতে হবে এবং কয়েকটি পরিপন্থীসুলভ ঝোঁককে যদি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না আনতে পারা যায় তাহলে পরিমণ্ডলের এমন ক্ষতি হতে পারে, যেটাকে দূর করতে হলে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ও অনেক খরচপত্র করে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিগত কয়েকটি অংশ বা এলাকা এমন সূক্ষ্ম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পরিমণ্ডলের পরে মানুষের শিল্পগত কাজকর্মের প্রভাব কতোখানি পড়ছে তার হিসাব করা সম্ভব (আবহমণ্ডল, নদীগুলো, সমুদ্র, মহাসমুদ্র ও মহাদেশের উপরিভাগগুলো)। এই ব্যাপারে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলো এবং কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত মনুষ্যবাহী মহাকাশ-স্টেশনগুলো থেকে বিশেষ কাজ পাওয়া যেতে পারে, কারণ আবহমণ্ডলে পৃথিবীর মহাসমুদ্রে ও মহাদেশগুলোতে এমন বিরাট পরিধিতে প্রক্রিয়াগুলোকে নির্দেশ (মনিটর করার) দেওয়ার কাজ করতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করে, যে প্রক্রিয়াগুলো সমগ্র গ্রহকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। মহাকাশ থেকে অনেক রকমের পর্যবেক্ষণ করে এখন পৃথিবীর

সম্পদকে অনুসন্ধান করার কাজটা আরও ভালো ভাবে করা সম্ভব এবং তাদের আরও যুক্তিসম্মত ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাস্তব্যজ্ঞানীরা, ভূবিজ্ঞানীরা, সমুদ্রবিজ্ঞানীরা, আবহমণ্ডল সম্বন্ধে তাত্ত্বিকরা এবং আরও অন্যান্য অনেক বিশেষজ্ঞরা পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক ভাগগুলোকে এবং আমাদের গ্রহের অভ্যন্তরে যে ধন লুকায়িত আছে তাকে খুঁজে বার করার উপায় বাহির করেছে। তাহলেও এই সকল কায়দাকে পুরো ব্যবহার করার এবং পরিমণ্ডলের উপরে ক্ষতিকারক "চাপ" সীমিত করতে যতোটা না সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশি করে যে উদ্দেশ্যে সেগুলোর রাষ্ট্রের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

এখন এটা ভালো করেই জানা আছে যে, স্থানীয় স্বাভাবিক ঘটনাবলীকে বুঝিয়ে দিতে যে তথ্যগুলোকে জোগাড় করা ও সাজানো দরকার, তার জন্য মহাকাশের প্রযুক্তিবিদ্যা যেন একটা ব্যবহারযোগ্য হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে দেয়; এর দ্বারা মহাদেশের ও মহাসমুদ্রের বিভিন্ন অংশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকেও আমেরা তুলনা করতে পারি। ভূবৈজ্ঞানিক, জৈবিক, মহাসামুদ্রিক, আবহমণ্ডল-সংক্রান্ত ও ভূমিসংক্রান্ত যে সকল বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে তাদের মধ্যেকার মিল ও অমিলগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে মহাকাশে অনুসন্ধান (স্টাডি) আমাদের সাহায্য করে। এ থেকে আবহমণ্ডলে সমুদ্রের ও মহাসমুদ্রের গভীরে, মহাদেশের জমির উপর ও তলদেশে কি ধরনের প্রক্রিয়াগুলো বিকশিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পেঁছিতে আমাদের সাহায্য করে এবং যেটা না করতে পারলে পরিমণ্ডল সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলো সফল হতে পারে না।

সারা মানব সমাজ যে সকল সমস্যার সমাধানে ঔৎসুক, যে সকল রাষ্ট্রে বৃহৎ পরিধিতে মহাকাশের জন্য প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে, তারা সেগুলোর সমাধান করতে পারে। এই সমস্যাগুলো হল, পরিমণ্ডলের ব্যবস্থা করার জন্য

মহাকাশ থেকে তার ক্ষেত্র তৈয়ারী করা, মনুষ্যবিহীন (স্বয়ংচালিত) উপ-গ্রহগুলো এবং মানুষশুদ্ধ কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত মহাকাশ-স্টেশন থেকে আমাদের গ্রহের বিভিন্ন অঞ্চলে "বাস্তব্য অবস্থা" সম্পর্কে খবর পেঁছে দেওয়া।

বিশেষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরা যুক্ত কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ, যারা বহু উচ্চে অবস্থিত উড্ডীয়মান বেলুন, জমিতে স্টেশন এবং পর্যবেক্ষণের ঘাঁটিগুলোর সংগে একযোটে আবহমণ্ডলকে অনুসন্ধান (স্টাডি) করার কাজ চালাতে পারে সারা ভূগোলক জুড়ে—বহু দেশের বিজ্ঞানীরা তাদের সম্পর্কে এখন আলোচনা চালাচ্ছেন ; এবং তারা বহুবিধ অনুসন্ধানের কাজ চালাতে পারে। এই ধরনের প্রোগ্রামকে কাজে.পরিণত করতে পারলে বায়ুমণ্ডলের পূর্বাভাস বলার কাজটা বেশ নির্ভরযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে এবং পৃথিবীর আবহমণ্ডলে বিরাট আকারে যে প্রক্রিয়াগুলো চলছে সে সম্পর্কে অনেক বেশি সঠিক খবর পাওয়া যাবে, যেটা কেবলমাত্র আবহমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই শুধু নয় পরন্তু পরিমণ্ডলের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার পরিকল্পনাতেও কাজে লাগবে।

ভূগোলবিদ্যার বিজ্ঞানীরা নানা ভাবে জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য পূর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়ভাবে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করছে। আজকের ভূগোল-বিদ্যা কেবলমাত্র আরও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেই এবং কয়েকটি এলাকার, খুঁটিয়ে বা সমগ্র মহাদেশের বা আমাদের পুরো গ্রহের ম্যাপ এঁকেই ক্ষান্ত থাকে না। জুলাই ১৯৭৬ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ভূগোলের কংগ্রেসে দেখানো হয়েছিল যে, কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ঝোঁকের ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত টেনে ঐ ধরনের সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞানের কোনো শাখাকে আজকে প্রকৃতিকে খানিকটা বদলে দেবার প্রক্রিয়ার যে আসল মর্মবস্তুটুকু আছে, তাতে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে এবং দেখতে হচ্ছে, যাতে ঐ ধরনের বদল করার পদ্ধতির কোনো ভয়াবহ প্রভাব যেন পরিমণ্ডলে উদ্ভিদ বা জন্তু জগতে না পড়ে এবং যে সকল এলাকাতে অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটাকে যেন সযত্নে রক্ষা করা ও অনুসন্ধান চালানো যায়।

তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ভূগোলবিদরা মনুষ্যবিহীন স্বয়ং চালিত কৃত্রিম উপগ্রহদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত স্টেশনগুলোর কাছ থেকে যে সকল তথ্যাদি পাওয়া যাচ্ছে, তার ব্যাপক ব্যবহার করছে। জনবহুল এলাকাগুলোর আয়তন ও চেহারা নির্ধারণ করার কাজেই অথবা বহু অঞ্চলের এবং সারা দেশের ভূমির বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করার কাজেই একমাত্র কৃত্রিম উপগ্রহগুলো থেকে তোলা ফটোগুলো যে শুধু কাজে লাগে তা নয়। কৃত্রিম উপগ্রহদের সাহায্যে একটা পুরো দেশের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও সামগ্রিক ছবি আঁকা সম্ভব, যাতে থাকবে তার শহরগুলো, তার শিল্পগুলো, কৃষি, সড়কগুলোর পুরো ছক, জলসেচনের ব্যবস্থাদি এবং অন্যান্য, আরও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো। কৃত্রিম উপগ্রহগুলো থেকে আজকের একেবারে সর্বাধুনিক ভৌগোলিক ম্যাপ ছক কেটে কেটে করা সম্ভব।

মহাকাশ থেকে যে সকল সুবিধাদি পাওয়া যায় তাছাড়া আর অন্য কোনো রকমের প্রযুক্তিগত অতো সুবিধাদি পাওয়া যায় না; অন্য এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যেটা অতো তাড়াতাড়ি একটা নির্দিষ্ট ধরনের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারে; তাছাড়া এটা করা হয় এমন কাঠামোতে যাকে কম্পিউটারের প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলা সহজ; এই প্রক্রিয়াগুলো ও ঘটনাগুলো হল আবহমণ্ডলের, সমুদ্রের জলের ওপরে বা তলাকার, অথবা আমাদের গ্রহের অভ্যন্তরের ব্যাপার। আর এই ধরনের তথ্যকে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেই আগামী দশকগুলোতে পরিমণ্ডলের রক্ষা করার কাজ, যার মধ্যে থাকবে আবহমণ্ডলের দেশের মধ্যে জলভাগের এবং বিশ্বের মহাসমুদ্রের দূষিতকরণের সমস্যা—এসব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প শুরু করা হবে; একই সংগে তাদের গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়ার (মনিটরের) কাজও চলবে যেমন চলবে কয়েকটি এলাকাতে আবহাওয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে খানিকটা বদলে দেওয়া, প্রচণ্ড ঝড় (টাইফুনকে) সুনামী (এক ধরনের প্লাবন) এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫-শ কংগ্রেস যে আর্থনীতিক লক্ষ্য রূপায়িত হয়েছে তাতে ধরা হয়েছে : "আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধাদির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে অনুসন্ধান বা অধ্যয়ন (স্টাডি) করা এবং পরিমণ্ডলের ও দূষিতকরণের সূত্রগুলোকে নির্দেশ দেওয়া (মনিটর করা)।" পূর্ব-পরিকল্পিত (planned) আর্থনীতিক ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারে বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমগ্র অর্থনীতির প্রয়োজনার্থে এবং আলাদা আলাদা শিল্প-সংস্থা ও আর্থনীতিক এলাকার জন্য মহাকাশ-প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্বয়ংচালিত মনুষ্যবিহীন বিশেষভাবে যন্ত্র-সমন্বিত কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর এবং মনুষ্যবাহী মহাকাশ-স্টেশনও কক্ষে প্রদক্ষিণরত স্টেশনগুলোর দ্বারা অনেক কাজ করা হয়েছে। ব্যাপক পরিধি নিয়ে বৈজ্ঞানিক রিসার্চ চালানো ছাড়া সোভিয়েত মহাকাশচারীরা জাতীয় আর্থনীতির পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা (এক্সপেরিমেণ্ট) চালিয়েছেন। বিশেষ করে প্রায়োগিক ব্যবহার রয়েছে ৫৩ সমাক্ষরেখার দক্ষিণে সাদা-কালো ও রংগীন যে সকল ছবি তাঁরা সোভিয়েত ভূখণ্ডের তুলেছেন। এই ছবির বিশ্লেষণ করলে ভূতাত্ত্বিক কাঠামোগুলো এবং ভূত্বকের গঠন কিরকম হয়েছে তা খুঁজে বার করে দেখা যেতে পারে তাতে কতোখানি তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ রয়েছে। ককেশাস ও মধ্য এশিয়ার পর্বতমালাতে কতোখানি জলীয় বাষ্প জমে রয়েছে এবং সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে কি কি ভাংগাগড়ার কাজ চলছে,—এইগুলো নির্ধারণ করতেও এই ছবিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত মহাকাশ স্টেশন ও মনুষ্যবিহীন কৃত্রিম উপগ্রহরা সোভিয়েত ইউনিয়নের রিসার্চ এলাকা থেকে কৃষি, বনবিভাগ, সমুদ্রে মাছ ধরার ও অন্যান্য অনেক শিল্পের খবর নিয়মিত ও চটপট দিয়ে যাচ্ছে। বাইকাল-আমুর রেলপথের ধারে ধারে ভূমিকম্পের অঞ্চল কি হতে পারে সে সম্পর্কে কাজ করছে এবং জাতীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য পরীক্ষা

চালাচ্ছে। পরিমণ্ডলের ব্যাপারে মহাকাশের প্রযুক্তির যে কতো অবদান আছে তার অতিশয়োক্তি করা প্রায় অসম্ভব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে পরিমণ্ডলের সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ লক্ষণীয় ভাবে অবনতি হচ্ছে, সেখানে পরিমণ্ডলের উন্নতির জন্য ব্যবস্থাপনার নতুন প্রকৌশল এখন বেশ জোরের সংগে করা হচ্ছে। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে পরিমণ্ডলের পুরো অবস্থা বিচার করে নির্দেশ দেওয়ার (মনিটার সার্ভিস) জন্য একটি জাতীয় উপগ্রহ-সার্ভিস (উপগ্রহদের কাজ থেকে কি কাজ পাওয়া যায়) খুলে কাজ শুরু করা হয়। আবহমণ্ডলের অবস্থা বিচার করে তাকে মনিটার করা, জমির ও সমুদ্রের উপরিভাগ, সূর্যজাত ক্রিয়াকলাপ ও অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলো, যা পরিমণ্ডলের পদার্থিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণকে বিচার করতে পারে তার জন্য প্রোগ্রাম নেওয়া হয়। পরিমণ্ডলের রক্ষার এজেন্সি (Environment Protection Agency) পরিমণ্ডলের দূষণের চরিত্র কি এবং কতোদূর তা বিস্তৃত হবে দূষণকে যাতে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। পরিমণ্ডলের মনিটারিংয়ের কাজে এজেন্সি এরোপ্লেনের, হেলিকপটারের ও কৃত্রিম উপগ্রহদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে। অন্যান্য কাজের মধ্যে এজেন্সি আকাশ-মহাকাশের[৫৬] প্রান্তসীমার

---

৫৬. পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডল আছে তাকে আমরা আকাশ এবং এই বায়ুমণ্ডলের বাইরের অঞ্চলকে আমরা মহাকাশ বলে থাকি। ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রতল থেকে যতো উর্ধ্বে বা উচ্চে যাওয়া যাবে, বায়ুমণ্ডল ততোই পাতলা থেকে আরও পাতলা হয়ে আসবে এবং মোটামুটি ২০০ মাইলের মতন উর্ধ্বে গেলে বায়ুমণ্ডল শেষ হয়ে মহাকাশের প্রান্তভাগ শুরু হবে। অবশ্য এই ২০০ মাইলের পরেও বায়ুর ছিটেফোঁটা পাওয়া যাবে।

কিন্তু সমুদ্রতল থেকে মাত্র ৮।৯ মাইল উচ্চে গেলেই বায়ুমণ্ডল এতো পাতলা হয়ে যায় যে, সেখানে এরোপ্লেনের মতো পাখা দিয়ে হাওয়া কেটে এরোপ্লেন বা বায়ুতরীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে যাবার জন্য আমরা জেট প্লেন ব্যবহার করি যাকে আধা-এরোপ্লেন আধা-রকেট বলা যেতে পারে। আধা-আধা বলছি, কারণ ৯।১০ মাইলের উর্ধ্বের পাতলা বায়ুমণ্ডলে চলবার জন্য একে রকেটের মতো গ্যাস নির্গত করে তার প্রতিঘাতায় চলতে হয়।

যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, তাতে শক্তি-উৎপাদনকারী স্টেশনের কাছে। তাপমাত্রার এলাকাগুলো নির্ধারণ করার কাজ করে; দেখে কোথায় কোথায় ভূমির ব্যবহার হচ্ছে অযৌক্তিকভাবে, কোথায় তেল পিচকারীর মতো বেরিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কোথায় কোথায় বায়ুমণ্ডলের দূষণের চরিত্র ও স্তর নির্ধারণ করা দরকার, শিল্পের নির্গত দূষিত পদার্থ সমূহকে খুঁজে বার করে তার নির্দেশ দেওয়া, নদীর মোহানাতে জলেতে কতোটুকু নুন ও অন্যান্য ক্ষতিকারক ময়লা দেখা দিয়েছে, দূষণের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকেও মনিটর করা, এবং পরিমণ্ডলের বিশুদ্ধতার ওপরে দূষণের সাধারণ প্রভাব কি হবে তার মূল্যায়ন করে তার ফলাফলে কি পরিবর্তন হবে সেটা দেখা।

আজকের অবস্থাতে সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা হল—রাষ্ট্রদের অধীনে প্রকৌশলগত কি কি সুবিধা আছে তার পূর্ণ মূল্যায়ন করা এবং এই সকল সুবিধা হাসিল করার জন্য প্রধান যে কর্তব্যগুলো সামনে এসে হাজির হচ্ছে সেটা ছাড়া প্রায়োগিক দিক থেকে নতুন কাজগুলোর মোকাবেলা করা। ইদানীং বহুদিন ধরে আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে জানার জন্য দুনিয়া জুড়ে আবহবিদ্যার অফিস তৈরি করে তাদের মধ্যে খবর আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং তাদের বিস্তৃতিও করা হয়েছে। মহাদেশ-

---

কিন্তু চলবার জন্য এই গ্যাস পুরো মহাকাশে যাবার রকেটের মতো তার পেটের অভ্যন্তরে পয়দা করা হয় না, বাইরের বায়ুমণ্ডল থেকে হাওয়া বা বায়ু শুষে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে নির্গত করে দেয় এবং তার প্রতিধাক্কায় চলে।

তাছাড়া জেট প্লেনের উড়বার জন্য তখনও বাইরের বায়ুমণ্ডলের ওপর নির্ভর করতে হয় বলে তাতে ডানা পরামোও থাকে, অর্থাৎ aerodynamics বা বায়ুর গতিবিজ্ঞার নিয়মেই চলে। রকেট চলে কিন্তু পুরোপুরি বায়ুশূন্য মহাকাশে।

কাজেই এই পাতলা বায়ুমণ্ডলে যে জেট প্লেনগুলি চলে, তারা খানিকটা রকেটের চলার নিয়মে এবং খানিকটা এরোপ্লেনের বা বায়ুতরীর নিয়ম মেনে চলে।

আর এই ৯।১০ মাইল থেকে বায়ুশূন্য মহাকাশের প্রান্তভাগ অবধি সব অঞ্চলটাকেই aerospace যাকে অথবা আকাশ মহাকাশীয় অঞ্চল বলে অভিহিত করলাম—অনুবাদক।

গুলোতে ও বিশ্বের মহাসমুদ্রে সেগুলো বহুদূর অবধি বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং তাদের আছে অনেক রকমের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি; রয়েছে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চালিত আবহাওয়ার দপ্তর যেখানে অনেক রকমের পর্যবেক্ষণ করা হয়; রয়েছে আবহাওয়ার তথ্য বিশ্লেষণ করার ও পূর্বাভাস কি হবে, যার সংগে আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহকারক আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো, জাতীয় কেন্দ্রগুলো (মস্কো ও ওয়াশিংটন থেকে প্রধান প্রধান এই কেন্দ্রগুলো কাজ করছে)। মহাদেশগুলোর বহু অংশে আবহমণ্ডলের দূষণের স্তর কতোখানি হয়েছে এবং হতে পারে তার জন্য আবহাওয়াকে মনিটার করার জন্য প্রকৌশলগত সুবিধাদি কতোখানি রয়েছে এবং বিশ্ব সমুদ্রের সংলগ্ন ভূমির কাছে জলেতে ও এলাকাতে কতোখানি দূষণ হয়েছে সেটা দেখা, আর পরিমণ্ডলকে ক্ষতি করতে পারে এই রকমের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলোর তথ্য চালান করার কাজটা করা যেতে পারে আঞ্চলিক ও দুনিয়াজোড়া মহাকাশে প্রদক্ষিণরত যোগাযোগের ব্যবস্থা করার স্টেশনগুলো থেকে।

ইউনাইটেড নেশনস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর বিশেষজ্ঞদের মতে ভূগোলকের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাত বা মতদ্বৈধতা দেখা দিলে মহাকাশ থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেই একমাত্র কার্যকরী খবরাখবর পাওয়া যেতে পারে। ভূগোলকের কোনো অংশে যদি লক্ষ্যণীয়ভাবে পরিমণ্ডলের অবনতি হয় তাহলে কার্যকরীভাবে তার গুণাগুণ ফিরিয়ে আনতে যেমন রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে জোরালো কার্যক্রম দরকার তেমনি কয়েকটি বিশেষ রাষ্ট্রের মধ্যে অতীতের রাজনৈতিক ঝগড়াঝাঁটির জের মেটানোরও প্রয়োজন আছে।

সংগে সংগে এটাও যোগ করতে হবে যে, মহাকাশের প্রযুক্তির আর্থনীতিক কার্যকারিতার মূল্যায়ন করার জন্য এক প্রস্থ মানদণ্ড আমাদের জানা আছে, যেটা কৃত্রিম উপগ্রহদের ও কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত মহাকাশ স্টেশন থেকেও পাওয়া যাচ্ছে (যোগাযোগ ব্যবস্থা আবহাওয়ার অফিস, জাহাজ চলাচলের জন্য দিক নির্দেশ, পৃথিবীর সম্পদকে খুঁজে বার করা, পরিমণ্ডলের রক্ষা ইত্যাদি)।

এই ধরনের সূচকের পেছনে প্রধান নীতিগত যেটা বিচার করে আমাদের কাজ করতে হয় সেটা হল—প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মহাকাশের ব্যবস্থার বিকাশ, উৎপাদন এবং কাজ করার ব্যবস্থাপনার (অপারেশন) জন্য খরচের তুলনায় "মহাকাশ-সংক্রান্ত নয়" এই রকম ব্যবস্থাপনার খরচ কতো পড়ে। এই ধরনের তুলনামূলক খরচখরচার সর্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ হচ্ছে মহাসমুদ্রের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি কৃত্রিম উপগ্রহদের সাহায্যে যোগাযোগের ব্যবস্থার তুলনায় মহাসমুদ্রের তলদেশে টেলিগ্রাফের বিদ্যুৎবাহী তার রেখে যোগাযোগের ব্যবস্থার তুলনা করা।

উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক, ম্যাপ তৈরি করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের নীতিসম্মত ব্যবহারের সংগে পরিমণ্ডল রক্ষার জন্য কাজকর্মের যে প্রত্যক্ষ ফলাফল পাওয়া যায়। ১৯৬০ দশকের খরচপত্রের হিসাব ধরলে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি সহ এরোপ্লেনের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জমির জরীপ করে ম্যাপ তৈরি করার জন্য সময় লাগে তিন থেকে দশ বছর। এই সময়ের মধ্যে এককোটি ২০ লক্ষ ডলার খরচ করে ১৫ লক্ষ ছবি তোলার প্রয়োজন হয়। এই কাজটাই কৃত্রিম উপগ্রহরা ঠিক ১৭ দিনে শেষ করতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহদের মাত্র ৪০০ ছবি তুলতে হবে মহাকাশ থেকে আর তার জন্য মোট খরচ পড়বে সাড়ে সাত লক্ষ ডলার। এই ক্ষেত্রে মহাকাশে প্রযুক্তির ১৬-দফা সুবিধা আছে। বিশেষজ্ঞরা বারবার দেখিয়েছেন যে, মহাকাশ ব্যবস্থাতে প্রায়োগিক দিক থেকে জমি অথবা এরোপ্লেন থেকে কাজ করা অপেক্ষা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়। কারণ বেশ কয়েকটি প্রায়োগিক কাজ সারাবার জন্য তাদের একসংগে কয়েক গোছা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রকৌশলের ব্যবস্থা করা যায়।

পুরো অর্থনীতি থেকে সুবিধা আদায় করার জন্যও বিশেষ এলাকার অর্থনীতি ও জনসংখ্যা থেকেও এবং মহাকাশ ব্যবস্থার কাজ থেকেও (অপারেশন) বিশেষজ্ঞরা ঠিক একই মানদণ্ড প্রয়োগ করে থাকেন। টাকার

৩অংক ধরে এই সুবিধাগুলোর হিসেব করলে সাধারণত যেটা দেখার রেওয়াজ সেটা হল—কৃত্রিম উপগ্রহদের ও কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত স্টেশনগুলোর সাহায্যে জনসাধারণকে সময়মতো প্রাকৃতিক বিপদের আশংকার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেওয়া যায় এবং মহাকাশের প্রযুক্তির ব্যবহারে মন্ত্রীমণ্ডলীর ও গভর্নমেন্টের এজেন্সির কাজের কতোটা উন্নতি সাধন করতে পারা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহদের থেকে লব্ধ তথ্য (কয়েকটি এলাকাতে জমির উৎপাদিকা শক্তির ও অন্যান্য গুণাগুণের ঋতু অনুসারে কিরকমের পরিবর্তন হয়, প্রাকৃতিক অবস্থাতে হঠাৎ কি ধরনের পরিবর্তন আসে—খরা, প্লাবন ইত্যাদি) কৃষিক্ষেত্রে কতোখানি কাজে লাগে, বিরাট এলাকাতে শস্য উৎপাদনের জন্য নির্দেশক (মনিটর) ব্যবস্থা করা, সময়মতো রোগ-মহামারীকে ঠেকানো, তা থেকে কি সম্ভব্য ক্ষতি হতে পারে তার হিসেব করে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা এবং এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে পংগপালের মতো ধ্বংসকারী পেস্টদের কাছ থেকে রক্ষা করা—এ সবই বিশেষজ্ঞরা কৃত্রিম উপগ্রহদের কাছ থেকে পাবেন বলে মনে করেন। যেমন কয়েকটি এই ধরনের আগে থেকে হিসেবের কথা ধরলে বলা যায় যে, যদি বায়ুমণ্ডলের পূর্বাভাসের খবর তিন দিন আগে থেকে কৃত্রিম উপগ্রহদের সাহায্যে বলা যায় তাহলে সারা ভূগোলক জুড়ে ৬০০০ কোটি ডলার প্রতি বছর বাঁচানো সম্ভব। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকের কৃত্রিম উপগ্রহদের দ্বারা পৃথিবীর সম্পদের অনুসন্ধান চালাবার ব্যবস্থাটার প্রায়োগিক প্রয়োজনের দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহদের ব্যবহার থেকে প্রতি বছরে ৫৯২০ কোটি ডলারের মতো ব্যয়-সংকুলান সম্ভব। অনেক ধরনের প্রায়োগিক কাজ করার আর্থনীতিক ফলাফল এই হিসেবের মধ্যে যেমন : কৃষিক্ষেত্রে শস্যধ্বংসকারী পেস্টদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ২৭০০ কোটি ডলার, মাছ ধরার ব্যবস্থা আরও কর্মক্ষম করতে পারলে ১৫০ কোটি ডলার এবং জনস্বাস্থ্যের কয়েকটা দিক ও পরিমণ্ডলের রক্ষার ব্যবস্থাপর্না ধরা হয়েছে।

ন্যাশনাল এরোনটিকস্ এণ্ড স্পেস্ এডমিনিস্ট্রেশন (National Aeron-

autics and Space Administration—NASA বা নাসা)[৫৭]-এর হিসাব অনুসারে ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে মহাকাশের প্রোগ্রাম থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া পরিমণ্ডলের রক্ষার ব্যবস্থা, পরিবহণ ও পথ-চলাচলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টের কার্যক্রমকে আরও বেশি ফলপ্রসূ করা সম্ভব।

ইতিমধ্যেই কৃষিক্ষেত্রে পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য মহাকাশের প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্পিত (hypothetical) এবং অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত কাজ করা সম্ভব হয়েছে। স্পর্শকাতর যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর জমিকে মহাকাশ থেকে অনুসন্ধান (বা স্টাডি) করে ভূমিতে কতোখানি আর্দ্রতা ও নুন রয়েছে তার রাসায়নিক কাঠামো, সেখানে কোনো পীড়িত উদ্ভিতাদি গড়ে উঠছে কি, না, অথবা পোকামাকড়ের দ্বারা ভূমির চেহারায় কতোখানি ক্ষতি হচ্ছে—এ সবই নির্ধারণ করা সম্ভব। পৃথিবীর উপগ্রহদের দ্বারা জমির ওপরের আস্তরণটার পরিমাণগত ও গুণগত বিশ্লেষণ করা সম্ভব, এবং এইভাবে একটা নির্দিষ্ট এলাকাতে ভূমির রাসায়নিক গঠন, যেমন তাতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ কতো, কারবন দিয়ে গঠিত (জৈবিক বা organic) জটিল পদার্থ এবং নুন আছে কি, না—দেখা যেতে পারে। তাছাড়া, ভূমি কতোখানি আর্দ্রতা রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে অথবা পরিপার্শ্বিকের প্রভাবে কতোখানি কাঠামো বদলে যেতে পারে, যেটা আবার একটা নির্দিষ্ট কৃষিক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক তাপমাত্রাতে পেঁছতে সাহায্য করতে পারে—এ সকল তথ্যই পাওয়া সম্ভব।

নানারকমের শস্য সংক্রান্ত রোগ, শস্য-ধ্বংসকারী পেস্টদের ও অন্যান্য পেস্টদের থেকে দুনিয়াতে মোট কৃষি-উৎপাদনের প্রভূত ক্ষতি হয়। দক্ষিণ-

---

৫৭. আমেরিকাতে এই সংগঠন থেকে তাদের যাবতীয় মহাকাশের প্রোগ্রাম—চাঁদে যাওয়া, মহাকাশে মানুষের পর্যটন ও অন্যান্য কৃত্রিমউপগ্রহ—সবই অনুষ্ঠিত করা হয়—অনুবাদক।

পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই একমাত্র এই কারণগুলোর জন্য বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় কয়েক কোটি ডলার। কৃত্রিম উপগ্রহদের সঙ্গে যদি বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি জুড়ে দেওয়া যায়, যারা জমিতে জৈবিক কোনো পরিবর্তন ঘটলেই চট্‌করে ধরতে পারবে (biosensors) তাহলে শস্যের রোগ "নির্ধারণ করার" কাজটা সহজ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীর জমির বিরাট এলাকা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে সে সম্পর্কে সঠিক ও চটপট খবরাখবর পাঠিয়ে নির্দেশ দেবার জন্য মহাকাশের ব্যবস্থা বেশ কার্যকরী। শস্যের রোগ, আগাছার বৃদ্ধি, অথবা শস্য-ধ্বংসকারী কীটদের (পেস্টদের) উপস্থিতি ঠিক সময়মতো এবং তাড়াতাড়ি জানাবার জন্য এই ধরনের ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বনবিভাগের কাজকর্মকে উন্নত করার জন্য মহাকাশের ব্যবস্থাকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহরা বনের বিরাট অঞ্চলকে পর্যবেক্ষণ করে নির্দেশ পাঠাতে পারে, যে সকল অঞ্চলে গাছগাছড়াকে ধ্বংসকারী কীটরা (পেস্টরা) আক্রমণ করছে সেটাকে চিহ্নিত করতে পারে এবং দাবানল কোথায় জ্বলে উঠছে এবং কোন দিকে সেটা ছড়িয়ে পড়ছে সেটাও দেখিয়ে দিয়ে বিরাট পরিমাণের কাঠ, কাঁচা মাল হিসেবে যার দাম খুব বেশি, তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

কৃষির পক্ষে জল সম্পদের অনুসন্ধান করা (স্টাডি করা) শুধু কৃষির জন্য নয় প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থনীতির পক্ষেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা সারা গ্রহ জুড়ে প্রধান যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করেন সেগুলো হল: (১) সারা ভূগোলকের জলের চক্রকে অনুসন্ধান করা (স্টাডি) জলের সম্পদের ঘনত্ব ও তার গতিবিধি কি এবং তার গুণাগুণ কি ধরনের সেটা নিরূপণ করা; (২) জলের সম্পদের বিস্তৃতি কতোখানি সেটা ঠিক করা, দেশ-কাল জুড়ে তার স্বাভাবিক বিবর্তনকে এবং সেই বিকাশে (বা বিবর্তনে) মানুষের শিল্পগত ও অন্যান্য কাজকর্মের প্রভাব কি; এবং

(৩) স্থানীয় জলের সম্পদের পদার্থগত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান (স্টাডি) করে এবং বিভিন্ন ধরনের নদীর বহতার ইন্‌জিনিয়ারিং ও অন্যান্য শিল্পগত প্রকল্পকে কি পরিবর্তন করা যায়।

জলের সম্পদ সম্পর্কে অনেক রকমের খবরাখবর সংগ্রহ করার ব্যবস্থা, যেগুলো আগেকার দিনে এরোপ্লেন থেকে করা হতো, সেগুলোকে এখন বদলে নিয়ে পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম উপগ্রহদের মধ্যে সওয়ার করে দেবার জন্য নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি উদ্ভব করা হচ্ছে যেমন, জল কতোটা নিষ্কাশিত হয়ে যায় জমির আর্দ্রতা কতোখানি এবং জমির ত্বকের নীচে জলীয় স্তরের সীমানাটা ঠিক কোথা থেকে শুরু হচ্ছে—এর জন্য সাদা-কালো রংয়ের ছবি তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বহু বর্ণালী বিশিষ্ট ছবি তোলার ব্যবস্থা করে এবং রাডার যন্ত্র দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে জমির ত্বকের ঠিক নীচের স্তরেই কতো পরিমাণের জল আছে সেটা বার করা সম্ভব; তেমনি বহু-রঙা ছবি তুলে জল দিয়ে ঢাকা এলাকার চরিত্র ও রূপরেখা নিধারণ করার পদ্ধতি আছে এই ভাবেই জলের নীচে যে উদ্ভিদ জন্মায় তার চরিত্র এবং জলাধারের তলদেশের চেহারা নির্ধারণ করা সম্ভব; জমির উপর থেকে যে তাপ ও তেজ বিকীরণ হয় তা বিচার করে তুষার বা বরফের ঢাকনাটা কতো তার চরিত্র বোঝা যায় এবং লাল-উজানী আলোর ও বর্ণালী বিন্যাসের প্রকৌশলের ব্যবহার করে জলের উপরভাগের তাপমাত্রা মাপা সম্ভব। মহাকাশের প্রযুক্তি কেবলমাত্র জলের উপরভাগের বিন্যাস ও বিকাশ নির্ধারণ করতেই সাহায্য করে না, মাটির নীচে জলের প্রস্রবণের সূত্র, তার তাপমাত্রা, তাতে কি পরিমাণ নুন আছে, তার রাসায়নিক গঠনতন্ত্র ও অন্যান্য চরিত্র নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। মহাসমুদ্রের তাপমাত্রার হেরফের অনুসন্ধান (বা স্টাডি) করে মহাসমুদ্র-বিজ্ঞানীরা গরম ও ঠাণ্ডা জলের স্রোত সম্পর্কে নতুন খবর লাভ করতে পারেন।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ অবধি ইউনেস্কো-র দ্বারা চালু করা ব্যাপক পরিধি

নিয়ে রিসার্চ প্রোগ্রাম, যাকে বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক জলসংক্রান্ত যাবতীয় বিদ্যার দশক (International Hydrological Decade), যেটা শতাধিক দেশের অনুরূপ জাতীয় কমিটি নিয়ে গঠিত এবং যাতে আন্তর্জাতিকভাবে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও যুক্ত রয়েছে। এই আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম যা কর্মসূচীতে মহাকাশ থেকে উপরে বর্ণিত জলসম্পদ অনুসন্ধান (স্টাডি) করার জন্য প্রকৌশলকে প্রায়োগিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। অন্যান্য এলাকাতে জলসংক্রান্ত বিদ্যার বিজ্ঞানীরা (Hydrologists) ও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, আমাদের গ্রহের জলসম্পদ অনুসন্ধান করার জন্য মহাকাশ থেকে যে সকল প্রকৌশল ব্যবহার করা হয় সেটা নিশ্চয়ই এখনও শেষ হয় নি। পৃথিবীর জল-সম্পদের মোট পুরো হিসেবটা ধরে এবং নানারকমের দূষিতকরণের হাত থেকে তাদের রক্ষার বহুবিধ ব্যবস্থার কথা মনে রেখে বিশেষজ্ঞরা জলবিজ্ঞানী (Hydrologists) ও মহাকাশ-প্রকৌশলের নকসাকারীদের (space technology designers) আরও নিকটতর সহযোগিতা দাবি করছেন।

বায়ুমণ্ডলের পূর্বাভাস জানার জন্য পর্যবেক্ষণের (এক কথায় হাওয়া অফিস বা meteoroiogical observations—অনুবাদক) পাশাপাশি মহাকাশের প্রকৌশলের সাহায্যে জলসম্পদ খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য কাঁচা মাল খুঁজে বার করার এবং কৃষির জন্য ও অন্যান্য আর্থনীতিক প্রয়োজনে কৃত্রিম উপগ্রহদের ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই যে তথ্যগুলো এখানে দেওয়া হল তা থেকে দেখা যায় যে, পরিমণ্ডলের রক্ষার জন্য সমস্যার সকল সমাধানের জন্য প্রকৌশল ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কাজকর্মের জন্য ব্যবস্থা অনেক দেশের কাছেই আছে। একই সময়ে এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, যখন একটা বিশেষ প্রকৌশলগত অথবা আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে তখন প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্ররা যেন একই পথ ধরে চলছে এবং

যেন একই ধরনের কাঠামো যুক্ত সংগঠনগুলো গড়ে তুলছে এবং বায়ুমণ্ডলের ও আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে নির্দেশক (মনিটর) ব্যবস্থা নেবার জন্য জটিল কাজগুলো, মহাকাশের ও মহাসমুদ্রের পর্যটন, পরিমণ্ডলের রক্ষা এবং রোগ-মহামারীর বিরুদ্ধে একই ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু উপরি-উপরি এই মিলের (বা একই ধরনের কাজকর্মের) পেছনে এই ধরনের কাজকর্মে রয়েছে সরাসরি বিপরীত ধরনের সামাজিক আর্থনীতিক ঝোঁকগুলো। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে আর্থনীতিক ভিত্তির নতুন যে উপাদানগুলো গড়ে উঠছে তারা ভিন্ন ধরনের শ্রেণীস্বার্থের পক্ষে কাজ করে ; পররাষ্ট্রনীতিতে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও আর্থনীতিক অগ্রগতি বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে এবং মতাদর্শগত সংঘাতের অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা করার ও পরিমণ্ডলের প্রোগ্রামকে কার্যে পরিণত করার অভিজ্ঞতার দুটো ইতিবাচক দিক আছে। প্রথমত, খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই সমস্যাকে যেভাবে তারা সমাধান করার চেষ্টা করে তাতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সীমিত ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক কর্মসূচীতে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার সম্ভাবনা কতো ব্যাপক তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় ; তেমনি পরিমণ্ডলের রক্ষার বিভিন্ন দিকগুলোর যুক্ত কার্যক্রমগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিভিন্ন পরিধিতে বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

প্রাকৃতিক সমুদ্রের পুনরুৎপাদন ও তাঁর যুক্তিসম্মত ব্যবহার করার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাফল্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একটি বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ তার পরিমণ্ডল সম্পর্কে খুব বেশি রকমের অবহিত এবং তার রোজানা কাজকর্মের জন্য যা করা দরকার তা করে থাকে।

সারা দেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত হবার পরে ৭-ই অক্টোবর, ১৯৭৭-এ

গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানে আজকের ও ভবিষ্যৎ পুরুষের জন্য প্রকৃতিকে রক্ষা করার ও প্রাকৃতিক সম্পদকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কয়েকটি প্রবন্ধে বিকশিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তব্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে। ১৮ দফাতে বলা হচ্ছে : "আজকের ও ভবিষ্যৎ পুরুষের স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নে জমি এবং তার খনিজ পদার্থ ও জল সম্পদের জন্য, উদ্ভিদ ও জন্তুজগতের রক্ষার্থে বায়ু ও জল যাতে নির্ভেজাল থাকে, প্রাকৃতিক সম্পদের পুনরুৎপাদন নিশ্চিত করতে এবং মানুষের বাসযোগ্য পরিমণ্ডলকে উন্নত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে।" ৬৭ দফাতে বলা হচ্ছে : "প্রকৃতিকে রক্ষা করতে ও তার সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা বাধ্য। "এছাড়া সংবিধানে অন্যান্য দফাগুলোতে বলা হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের স্বার্থে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে একদিকে পরিমণ্ডলকে উন্নত করার ব্যবস্থা করা দরকার; অন্যদিকে পিপলস্ ডেপুটিদের স্থানীয় সোভিয়েতগুলোতে[৫৮] সর্বাঙ্গীণ আর্থনীতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য যা করা কর্তব্য, তা হল প্রতিষ্ঠানগুলোর, উদ্যোগী সংগঠনগুলোর ও অন্যান্য সংগঠনগুলোর জমির ব্যবহার ও প্রকৃতিকে রক্ষা করার কাজ করতে হবে।

আমাদের কালে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করা অন্যতম প্রধান সামাজিক বিষয়বস্তু (ইস্যু) হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার জন্য রাষ্ট্রগুলোর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাকে পুরো জড়ো করতে হবে এবং যার জন্য জাতীয় পরিধিতে যা করা হবে তাকে আঞ্চলিক ও দুনিয়া জোড়া ব্যবস্থাবলী নিয়ে সম্পূরক করতে হবে।

যুক্তভাবে আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কাজকর্মের জন্য

---

৫৮. অর্থাৎ খানিকটা আমাদের শহরের করপোরেশনের কাউন্সিলদের মতো,—অনুবাদক।

পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা বুঝতে পেরে অনেক দেশের গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণ তাদের কাছে যে প্রযুক্তিগুলো অন্য উদ্দেশ্যে নিয়োজিত, তার মূল্যায়ন করতে শুরু করেছে, যাতে পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য যুক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের ব্যবহার করা সম্ভব হয়, যাতে সম্পদের যুক্তিসম্মত ব্যবহার করা যায়, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অস্বাভাবিকত্বকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পরিমণ্ডলের কয়েকটি উপাদানকে পুনরায় চালু করা যায়। তাছাড়া, দূষিত-করণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ প্রযুক্তির বিকাশ সাধন করা হচ্ছে এবং পরিমণ্ডলে ক্ষতিকারক বর্জিত পদার্থ কম ছাড়া হচ্ছে। এই সকল কাজের ফলে স্বভাবতই আশাবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছে যে, এই ধরনের কাজকর্ম সফল হবে।

রাষ্ট্রগুলোর কাজকর্মের মধ্যে যেমন পরিমণ্ডলকে রক্ষা করার ব্যবস্থাগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করছে, এবং যেমন জীবমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিরাট সম্ভাবনা যেমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বাতাবরণে ক্রমশই বাস্তবে কাজের ক্ষেত্রে রূপায়িত হচ্ছে, তেমনি আমরা অতীতের কয়েকটি ভ্রান্তিকে শোধরাবার অবস্থা দেখতে পারবো এবং সমাজ, প্রযুক্তি ও প্রকৃতির সুসম বিকাশের জন্য নতুন অগ্রগতি ঘটবে। প্রযুক্তির নতুন বিকাশের ও তার প্রায়োগিক ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন দেশগুলোর ও বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর এবং ইতিমধ্যেই কার্যকর জাতীয়, আঞ্চলিক ও সারা ভূগোলকের ভিত্তিতে তথ্যসংগ্রহ এবং বহু রকমের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে নিয়ে বিভিন্ন রকমের পরম্পরাযুক্ত সংগঠন বানানো হয়েছে ; তাদের সবার্থসাধক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য বহুদেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে ; এই সব নির্ভরযোগ্য পথেই রাষ্ট্রগুলোকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গঠনমূলক কাজ করে যেতে হবে ; তাতেই সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সুসম পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত করা কঠিন কিন্তু মহান সমস্যাকে সমাধান করার পথে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করা সম্ভব হবে।

——